পর্ব-১

শিক্ষাব্যবস্থার অনুধাবন

[UNDERSTANDING EDUCATION]

পর্ব-১

শিক্ষার ধারণা

মুখবন্ধ

আবহমান কাল ধরে সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, প্রযুক্তিগত উন্নতিতে এবং সমাজ ঘনসন্নিবদ্ধ করার প্রয়াসে শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল সকলের জন্য সামাজিক ন্যায়, সমান সুযোগ এবং ব্যক্তিমনে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্যপ্রযুক্তির বৈপ্লবিক ক্রমবিকাশের ফলে আজ প্রতি তিন মাস অন্তর জনমানসে জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে। মানব ইতিহাস আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের কাছে ভবিষ্যতে যে কোন সমস্যা মোকাবিলা করার পথ উন্মোচিত করে দিচ্ছে। সে যেমন সমস্যাই হোক না কেন, হোক না সেটা সার্বিক, আঞ্চলিক, চিরাচরিত, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত এবং সর্বোপরি আধুনিক সামাজিক সমস্যা। আগামী প্রজন্ম এই সব টানাপোড়েন থেকে থাকবে মুক্ত। জ্ঞানের পরিধির ব্যপ্তি এবং তাকে আত্মস্থ করার ক্ষমতা আজকের যুগের মানুষের এতটা বেড়ে গিয়েছে যে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ আজ মানুষকে এক আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে, পৃথিবীতে খুব কম দেশই এমন গর্বের অধিকারী। ভারতবর্ষের আজ এক নিজস্ব সাহিত্যের আধার— বেদ, যা কিনা পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রামাণ্য সাহিত্য। ভারতবর্ষ উন্নতির পথে চলা শুরু করে বহু বছর আগে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন প্রাগৈতিহাসিকতার অন্ধকার কাটিয়ে ওঠেনি।

একক ১ ❑ শিক্ষার ধারণা (Understanding Education)

গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

১.৩ শিক্ষার প্রকৃতি এবং অর্থ

- ১.৩.১ শিক্ষার সংজ্ঞা
- ১.৩.২ শিক্ষার প্রকৃত অর্থ
- ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষার অর্থ

১.৪ শিক্ষার ভাবাদর্শ

- ১.৪.১ দর্শন এক পথপ্রদর্শক
- ১.৪.২ ভাবাদর্শ ও ভাববাদ
- ১.৪.৩ বাস্তববাদ
- ১.৪.৪ প্রকৃতিবাদ/স্বভাববাদ
- ১.৫.৫ বাস্তবধর্মিতা

১.৫ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তাবিদদের অবদান

- ১.৫.১ মহাত্মা গান্ধী
- ১.৫.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ১.৫.৩ শ্রী অরবিন্দ

১.৬ শিক্ষায় দর্শনের প্রভাব

- শিক্ষার লক্ষ্য
- পাঠক্রম
- শিক্ষার পদ্ধতি
- নিয়ম
- শিক্ষক

১.৭ শিক্ষার উদ্দেশ্য

- ১.৭.১ ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্য
- ১.৭.২ সামাজিক উদ্দেশ্য

১.৭.৩ শিক্ষার সমন্বয়

১.৮ লক্ষ্যের শ্রেণীবিভাগ

- জ্ঞানার্জন বা বিদ্যার্জন
- চরিত্র গঠন
- কর্মমুখী উদ্দেশ্য
- ঐক্য এবং সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্য
- অবসরের উদ্দেশ্য

১.৯ শিক্ষার সমকালীন উদ্দেশ্য

১.১০ সারাংশ: স্মরণীয় বিষয়সমূহ

১.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.১২ বাড়ীর কাজ

১.১৩ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১৩.১ আলোচনার সূত্রাবলী

১.১৩.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী

১.১ ভূমিকা (Introduction)

ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হিসাবে এমন এক জাতি গঠনে বদ্ধপরিকর যারা হবে যথেষ্ট মানবিক, দায়বদ্ধ, সমষ্টিগত, সৃষ্টিশীল নাগরিক। এই সব নাগরিক দেশ গঠন এবং সমৃদ্ধির পথে ভারতবর্ষকে এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজকের অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে শিক্ষা সামাজিক এবং সামগ্রিক ব্যক্তি উন্নতিকল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিবিধ সংস্কৃতি এবং নানা ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ যার অন্তরে সতত বহতা ঐক্যবোধের স্রোত। আমাদের জাতীয় সংবিধানে কয়েকটি লক্ষ্যের কথা উজ্জ্বল ভাবে প্রতীয়মান যেমন: ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমানাধিকার, স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায়, জাতীয় সংহতি এবং দেশপ্রেম। সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে তুলে ধরা এবং স্বাধিকারী করে তোলা বর্তমান শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবশ্য কর্তব্য।

একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে পর্যাপ্ত এবং উন্নত মানের শিক্ষা সমাজের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পারস্পরিক মেল বন্ধনের ক্ষেত্রে এক কার্যকরী হাতিয়ার। একই সঙ্গে এটি সুদৃঢ় মানব ঐক্য স্থাপনেও অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষাই বিশ্বকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, পারস্পরিক অবদমন এবং অকারণ যুদ্ধ থেকে মুক্ত করতে পারে। সুশিক্ষা একজনের ব্যবহারিক জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিতে পারে।

শিক্ষা তার স্বমহিমায় সমাজের উন্নতি ও বিকাশের ধারাটিকে প্রভাবিত করে। একথা অনস্বীকার্য যে সতত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা ও শিক্ষাধারাকে সামাজিক এবং সমকালীন চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন। তাই শিক্ষা ও সমাজ উভয়ে স্বাধীন হলেও একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জন ডিউই (John Dewey)'র মতে "শিক্ষা জীবন গড়ার এক প্রস্তুতি বা পদ্ধতিই নয় বরং বলা চলে শিক্ষাই জীবন" (Education is not a preparation for life but life itself)। সেই অর্থে শিক্ষা এবং জীবন পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। শিক্ষার শুরু বিস্ময় থেকে যার গভীরে লুকিয়ে থাকে অজানাকে জানার এক অপার উত্তেজনা। রহস্যের উন্মোচন, অজানাকে জানার জন্য চরম কৌতূহল মানব মনকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অনুধাবন করার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে।

- শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যা।
- শিক্ষার সংজ্ঞা এবং ধারণা
- দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা
- শিক্ষার উদ্দেশ্য
- ব্যক্তি শিক্ষা এবং সমাজ শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্যগত পার্থক্য।

১.৩ শিক্ষার প্রকৃতি এবং অর্থ (Nature and Meaning of Education)

১.৩.১ শিক্ষার সংজ্ঞা (Defining Education)

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিশ এবং প্লেটো'র থেকে আরম্ভ করে ডিউই হয়ে আমাদের মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত নানা যুগের মনীষী আলাদা আলাদা ভাবে শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। এক ধরনের সংজ্ঞায় মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে অপরিসীম সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা রয়েছে তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সংজ্ঞায় শিক্ষাকে একপ্রকার বিশেষ পদ্ধতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শিশুর মধ্যে জন্মগত বা সহজাত ক্ষমতার উন্মোচন ও বিকাশ ঘটে। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি এইরূপ নানাবিধ ধারণাকে সমর্থন করে:

- আমি বিশ্বাস করি শিক্ষা একটি শিশু বা পূর্ণবয়স্ক মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য সৎ চেতনাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে— মহাত্মা গান্ধী

  (By education, I mean an all round drawing out of the best in the child and man body, mind and spirit- - (Mahatma Gandhi)

- মানুষের সহজাত ক্ষমতার সমন্বয়পূর্ণ অগ্রগতি এবং উন্নতিই হল প্রকৃত শিক্ষা— (পেস্টালজি)

  (The natural, harmonious and progressive development of man's innate powers -- Pestalozzi)

- মানুষের মধ্যে অধীত যে পূর্ণাঙ্গ দিব্যভাব বর্তমান তাকে যথোপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করাই হল শিক্ষা— (স্বামী বিবেকানন্দ)।

  (Education is the manifestation of the perfection already in man— Swami

Vivekananda)

- শিক্ষা হ'ল একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি শিশুর মধ্যে যা অন্তর্লীন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ যেন অনেকটা অঙ্কুরিত বীজের পূর্ণবিকাশের মত— (ফ্রয়েবেল)

  (Education is unfolding of what is already unfolded in the germ. It is the process through which the child makes internal as external— Froebel)

- আত্মউন্নয়নের নামই শিক্ষা— (শ্রীঅরবিন্দ)

  (Education is helping the growing soul to draw what is in itself— Sri Aurobindo)

অন্যদের মতে শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে এই বলে যে শিক্ষা হচ্ছে এক জীবনব্যাপী পদ্ধতি যার ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুর প্রভাব পড়ে এবং এর সার্বিক প্রভাবটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি জীবনের ওপর কাজ করে।

এ প্রসঙ্গে জন ডিউই'র দেওয়া সংজ্ঞাটি মনে হয় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। এটি শিক্ষাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তা হল :

"ব্যক্তি বিশেষে নিহিত সেই সব ক্ষমতার উন্নতি সাধন যা তাকে পারিপার্শ্বিক এবং নানাবিধ সম্ভাবনার উপর নিয়ন্ত্রণ উপযুক্ত করে তুলবে"— জন ডিউই

(The development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities)

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির সাথে আরো কিছু সংজ্ঞা যোগ করা যায় যেগুলি শিক্ষার সপক্ষে পাঠকের মনে আরো কিছু আলোকপাত করতে পারে:

- শিক্ষা হ'ল একটি ইতিবাচক প্রয়াস যা শিশু মনকে সঠিকরূপে গঠন করে। এটি তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিবহাল করে তোলে— (রুশো)

  (Education is positive which is given to the child and which is intended to shape his mind. It is intended to teach him the duties of adults— Rousseau)

- আমাদের ঋকবেদে বলা হয়েছে যে শিক্ষা হল সেই বস্তু যা মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী এবং আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত করে তোলে— (ঋক্‌বেদ)

  (Education is something which makes a man self-reliant and selfless— Rig Veda)

- মানব জীবনের ঐক্যতান যেন শিক্ষার তন্ত্রী দিয়ে বাঁধা যার মধ্যে দিয়ে জীবনের মানে, অন্তরের আলো এবং পরম সত্যের ঐশ্বর্য্য মন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়— (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

  (Education is that which makes one's life in harmony with all existence and thus enables the mind to find the ultimate truth which gives us the wealth of inner light and significance to life— Tagore)

- ভারতবর্ষের সরকারী শিক্ষা কমিশন ১৯৬৪-৬৬ সালে শিক্ষা বিষয়ে যে মত পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে যে শিক্ষাকে জনমুখী হতে হবে, শিক্ষা যেন জীবনের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির এক শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়।

- বস্তুগত এবং ভাবগত সর্বাঙ্গীন উন্নতির মৌলিক সোপানই হল শিক্ষা। বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করার এটি এক অনুপম বিনিয়োগ।--- National Policy of Education (N.P.E.-1986) (এন.পি.ই.-১৯৮৬)
- মানব কল্যাণে গভীরভাবে উন্নতিবিধানে শিক্ষা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সমাজ থেকে দারিদ্র্য অজ্ঞতা ইত্যাদি দূর হয়— (ডিলর্স কমিশন-১৯৯৬)

১.৩.২ শিক্ষার প্রকৃত অর্থ (Meaning of Education)

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নির্ভর করে তার পরিপ্রেক্ষিতের উপর।

● ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষার অর্থ (Indian Concept of Education)

সংস্কৃতে বলা হয়েছে: সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়েং – অর্থাৎ শিক্ষা হল সেই বস্তু যাকে বেঁধে রাখা যায় না, তা কেবলই ছড়িয়ে পড়ে। যদি শিক্ষা মানব জীবনে বেঁচে থাকার ভঙ্গিটিকে কোন ভাবে উন্নত করতে না পারে তবে সেই শিক্ষা সর্বোতভাবে ব্যর্থ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির"।

মানসিক এবং আত্মনিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়েই প্রকৃত মুক্তিলাভ সম্ভব। এটি নির্ভর করে প্রধানত ছয়টি মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপর। যেমন কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্বনিয়ন্ত্রণের অভাব এবং ঈর্ষা। ভগবৎ গীতার উক্তি উল্লেখ করে বলা যায় যা মনকে শিক্ষিত এবং সংস্কৃত মনস্ক করে তোলে, ভগবৎ গীতায় যাকে "সমদর্শী" বলে অভিহিত করা হয়েছে অর্থাৎ যে সকলকে সমান রূপে দেখে তাই শিক্ষা।

১.৪ শিক্ষার ভাবাদর্শ (Philosophy of Education)

ইতিপূর্বে আলোচিত শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে যেমন শিক্ষা শিশুকে এমন এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পূর্ণ বয়স্কে রূপান্তরিত করে, সমাজ ও জীবনের সার্বিক উন্নয়নে যার বিরাট অবদান থেকে যায়। ডিউই যেমন বলেছেন— "শিক্ষা হল সেই পদ্ধতি যা একটি মানুষের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে এমন এক মাত্রায় নিয়ে যায় যখন সে তার পরিপার্শ্ব এবং তার নিজের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। (Education is the development of those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities.— Dewey)

শিক্ষা প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে একজন মানুষের স্বভাব ও রুচির উপর। তার শিক্ষাগত ভাবমূর্তি গড়ার পথে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষার পরমাদর্শ এক এক দেশে এক এক রকম। এমন কী বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিক্ষাদর্শনও ভিন্ন। এটি নির্ভর করে একটি বিশেষ রাষ্ট্র বা একটি বিশেষ জাতি শিক্ষার মাধ্যমে কোন লক্ষ্যে পৌঁছুতে চাইছে তার ওপর। শিক্ষার বিষয়গত মান ও উদ্দেশ্য উন্নতির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম, অর্থাৎ এক স্তর থেকে অন্য স্তরের উত্তরণ হতে হলে শিক্ষার মানকেও পরিবর্তিত হতে হবে।

এইখানেই শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তির প্রাসঙ্গিকতা। মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করে দর্শন। প্রকৃতির দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাসকে খোঁজাই হ'ল দর্শন। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক যে চিরন্তন সম্পর্ক তাকে দর্শন ব্যাখ্যা করে।

দর্শন হ'ল বুদ্ধিমত্তার বাস্তব সম্মত অনুশীলন। বাস্তবতা, জ্ঞান এবং মূল্যবোধের প্রকৃত পর্যবেক্ষণ হল দর্শন, যে কোন রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা সেই জাতির দর্শনের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে এটি আসলে চূড়ান্ত বাস্তবতাকে সর্বসমক্ষে প্রকটিত করে। এটি নিছক পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং বলা ভাল এটি হ'ল যুক্তিসঙ্গত চিন্তার ফসল। একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিটি প্রকৃতভাবে অনুধাবন করলে নানা ভাবে উপকৃত হন। যেমন—

(ক) শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ।

(খ) শিক্ষার (অনুশীলনের) পরিণতি।

(গ) শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত পদ্ধতি।

(ঘ) শিক্ষার বিষয়বস্তু ও নিয়ম নীতি নির্ধারণ।

তাই শিক্ষাকে দর্শনের গতিময় রূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দর্শনের মাধ্যমে যে ধারণা এবং তার উপযুক্ততা ধার্য হয় শিক্ষা তাকেই একটি কার্যকরী রূপ দেয়। যে কোন শিক্ষা বা অনুশীলনের পরিণতি শেষ পর্যন্ত দর্শনের মাধ্যমেই পূর্ণ মাধুর্য লাভ করে।

ভারতীয় এবং পশ্চিমী উভয় দার্শনিক শিক্ষাবিদেরা প্রত্যেকেই মানব চরিত্রকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তাঁরা একটি অত্যন্ত উন্নত মানের পরিশীলনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে তাঁদের এই নিরলস প্রয়াস অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

দর্শনের মাধ্যমে জীবন সম্বন্ধে কিছু গূঢ় প্রশ্ন সমাজের উপর প্রতিফলিত হয়— যেমন আমি বা আমরা কে? আমরা কি করছি? কেনই বা করছি? এই কাজের যথার্থতাই বা কী?

দর্শন একজন শিক্ষাবিদকে তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে বিশদ এবং গভীরভাবে অবগত হতে সাহায্য করে।

১.৪.১ দর্শন এক পথ প্রদর্শক (Philosophy as a guide)

দর্শন তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে, যেমন কোন একটি পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচী তৈরীর ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শিক্ষা পদ্ধতি ও তার লক্ষ্যমাত্রা হল দার্শনিক মতবাদের একটি মূল উপাদান। অন্যভাবে বলা যায় দর্শন যেমন শিক্ষা বিষয়ক নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশকের মত কাজ করে।

১.৪.২ ভাববাদ (Idealism)

আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আত্মোপলব্ধির উপর ভাববাদ বিশেষভাবে জোর দেয়। এটি মূল্যবোধ এবং ধ্যানধারণার সুচারু বিন্যাস ঘটিয়ে চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। মানুষ চূড়ান্ত পর্যায়ে যা খোঁজে বা মানুষের ঐকান্তিক ভাবে যা খোঁজা উচিত তা হল সত্যকে উপলব্ধি করা, পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানার্জন এবং ঐশ্বরীয় সৌন্দর্য্য। ভাববাদ যা বলে তা হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি সাধন করা। ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আত্মিক ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আপন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাকে সমৃদ্ধ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

১.৪.৩ বাস্তববাদ (Realism)

প্রাথমিকভাবে আমরা জগৎকে যে রূপে চাক্ষুষ করি তাকে ঘিরেই বাস্তববাদ আবর্তিত হয়। একজন বাস্তববাদীর কাছে বাস্তব অনুভূতি বা অনুভবই হল শিক্ষার সোপান। বাস্তববাদে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেই জোর

দেওয়া হয়। বাস্তববাদে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এখানে বলা হয় যে কোন জ্ঞানই হচ্ছে অভিজ্ঞতার ফসল। কারণ মানুষ কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে, নবজাতকের কোন বিষয়েই পূর্বলব্ধ ধ্যানধারণা থাকে না বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

বাস্তববাদের প্রবক্তা লকের (Locke) উপলব্ধি প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাই হল শিক্ষা। তিনি নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষা পদ্ধতির ওপর জোর দেন। তাঁর মতানুযায়ী প্রধানত শিক্ষার তিনটি দৃষ্টিকোণ হল দৈহিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিমত্তা। অতএব শিক্ষার যথাযথ উদ্দেশ্যই হল দৈহিক সক্ষমতা, গুণগত বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞানের বৃদ্ধি।

১.৪.৪ প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

প্রকৃতিবাদ, শিশু ও শিশুশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি পরীক্ষালব্ধ প্রয়োগবাদী জ্ঞানের ওপর বেশী করে জোর দেয়। এই ব্যবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন হয় তার ওপর বেশী করে নজর দেওয়া হয়। এখানে প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করেন যে যা কিছু প্রকৃতিলব্ধ তাই খাঁটি এবং অমলিন আজকের সুসভ্য সমাজ তাকে মলিন করে দেয়। তাঁদের মতানুযায়ী প্রাথমিক কাজই হ'ল শিশু চরিত্রকে ভালভাবে অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী তাকে উন্নতির সুযোগ সুবিধে দেওয়া। প্রকৃতিবাদীদের মধ্যে যাঁরা একটু কল্পনাবিলাসী তাঁরা বিশ্বাস করেন একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি সংযোগই একটি শিশুর সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃত পথ। এঁদের মধ্যে আবার যারা বিবর্তনে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন প্রকৃত শিক্ষা একটি শিশুকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেখায়। আবার যাঁরা নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিশ্বাসী সেই সব প্রকৃতিবাদীরা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ওপরই জোর দেন।

১.৪.৫ প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

প্রয়োগবাদ উপযোগিতা-নির্ভর জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেয়। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর অন্তর্লীন সম্ভাবনাগুলিকে এমনভাবে উন্মিলিত করা উচিত যাতে সে একজন দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হয়। একজন প্রয়োগবাদীর মতে সত্য হল যেটি কাজ করে কিন্তু তার মানে সেটি নিরঙ্কুশ নয়।

শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ তৈরী হয় তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের থেকে। বিদ্যালয়ের মূল প্রয়োজনীয়তা হ'ল একটি শিশুকে (ছাত্রকে) সমষ্টিবদ্ধ হয়ে বাঁচতে শেখানো।

ডিউই-র মতো প্রয়োগবাদের শিক্ষা আমাদের যা সাহায্য করে তা হল

(ক) অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি

এবং

(খ) ব্যক্তিগত পারদর্শিতা এবং তার ক্রমোন্নতির মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধের অগ্রগতি।

প্রতিটি শিক্ষায়তনের উচিত তার ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া যাতে সে তার অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিতে পারে। সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্র নানারকম কর্মপদ্ধতি মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে।

প্রয়োগবাদের দান হল প্রকল্প পদ্ধতি। তাই স্বভাব প্রয়োগবাদ অনেকটাই প্রকৃতিবাদকে অনুসরণ করে, এটি বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং বাস্তবধর্মী এবং সমাজ ও মানব কল্যাণই এর উদ্দেশ্য।

১.৫ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তাবিদদের অবদান (Contribution of Indian Thinkers to Education)

১.৫.১ মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষাক্ষেত্রে গান্ধীজির অবদান "নয়া-তালিম" প্রকল্পরূপে সর্বজনবিদিত। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে শিশুকে দিয়ে নয়, শিক্ষাদান শুরু হওয়া উচিত শিশুর পিতা মাতা এবং গোষ্ঠীকে দিয়ে। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ— এই ধারণার প্রবর্তন করেন তিনি। সামাজিক লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি শোষণমুক্ত এবং অহিংস হতে বলেন। তিনি বলেন শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মনোবিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। তাঁর মতে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রধানত তিনটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা উচিত— এই তিনটি বিষয় হ'ল কারুশিল্প, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ।

১.৫.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যক্তির উন্নতি বিধানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণা ও রুশো'র ধারণা প্রায় সমতুল। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের থেকে আলাদা এবং প্রত্যেকেই মৌলিক। তিনি বিশ্বাস করতেন মনের মুক্তিই হ'ল শিক্ষা। তিনি যে শিক্ষা মনকে মুক্ত করে সেই পদ্ধতিকেই সমর্থন করেন। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করেন। তিনি বলতেন আবিষ্কারের আনন্দই হচ্ছে শিশুশিক্ষার মূল উৎস।

১.৫.৩ শ্রী অরবিন্দ

শ্রী অরবিন্দ বলতেন প্রকৃত শিক্ষা কখনই কাউকে ধরে বেঁধে দেওয়া যায় না। একজন শিক্ষক কখনই প্রভু বা নির্দেশক হতে পারেন না। তাঁকে হতে হবে বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক। শিক্ষক তাঁর উপদেশ বা মতামত দেবেন কিন্তু কখনও তা শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। একটি শিশুকে আত্মজ্ঞান অর্জনে উপযুক্ত করে তোলাই হল শিক্ষকের কাজ। প্রত্যেকের মধ্যে স্বকীয়তা, পরিপূর্ণতা এবং দিব্যজ্ঞান আছে। শিক্ষার কাজই হল এইগুলিকে খুঁজে বার করা, এর উন্নতিবিধান এবং এগুলিকে কাজে লাগান। গান্ধীজির মত শ্রী অরবিন্দও বিশ্বাস করতেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নিখুঁত রূপে আত্মোন্নয়ন এবং মহৎ উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ।

শ্রী অরবিন্দের মতে উন্নতির প্রধান শর্তই হচ্ছে মুক্তি এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি।

১.৬ শিক্ষায় দর্শনের প্রভাব (Influences of Philosophy on Education)

● **শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)**

শিক্ষার লক্ষ্যের উপর দর্শনের একটি কার্যকরী প্রভাব আছে। এটি শিক্ষাসংক্রান্ত কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে দেয়। যেমন—

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বুদ্ধিমত্তার না নৈতিকতার সার্বিক উন্নতি?

(খ) শিক্ষা কী শুধুই বৃত্তিমূলক হবে না সর্বজনীন হবে?

(গ) শিক্ষা কী ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির জন্য না কি এটি গোটা সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয়।

● **পাঠক্রম (Curriculum)**

শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য ঠিক করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রমের প্রয়োজন। সাধারণত জীবনের লক্ষ্য ঠিক করাই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষার উপর জীবন দর্শনের একটি বড় ভূমিকা থেকে যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট সময় কালে জাতীয় জীবনদর্শন অনুযায়ী ক্রমবিকাশমান সমাজের চাহিদার কথা ভেবেই শিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারিত হয়। একেই বলে সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম।

● **শিক্ষা পদ্ধতি (Method of teaching)**

একটি জাতির নিজস্ব জীবনদর্শন অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতি স্থির করা হয়। কোন একটি বিষয়ে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগ এবং ভাবের আদান প্রদান হ'ল শিক্ষার একটি পদ্ধতি। প্রয়োগবাদ বা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষাকেই সমর্থন করে সেটি আরো বলে যে বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল, আগ্রহ, তার নিরসন এবং এর ফলে নানাবিধ আবিষ্কার শিক্ষা পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বাস্তববাদ একটি পরীক্ষালব্ধ পদ্ধতি। তাই বিভিন্ন দার্শনিক শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

● **নিয়ম/শৃঙ্খলা (Discipline)**

শৃঙ্খলা বা নিয়মের নীতি দর্শনের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। প্রকৃতিবাদ শিশু স্বাধীনতাকেই সমর্থন করে। ভাববাদীরা শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর বেশী নির্ভরশীল। কারণ তাঁরা বলেন যে শিক্ষকই নিয়মনীতি নির্ধারণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। বাস্তববাদীরা আবার বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন নিয়মনীতিতে বিশ্বাস করেন না। ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় যে একটি শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে। যেটি বাস্তববাদীরা পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তাঁরা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

● **শিক্ষক (Teacher)**

একজন শিক্ষকের মৌলিক ধ্যানধারণা এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা বিষয়ক নানা সমস্যার ওপর রেখাপাত করে। একই সঙ্গে এটি শিক্ষানবীশ, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং তার উপলব্ধির ওপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। কী ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলা পালিত হবে সেটিকেও প্রভাবিত করে। শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর একটি বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা এবং তার দৈনন্দিন প্রয়োগ পদ্ধতি ভীষণভাবে নির্ভরশীল।

এই পর্যন্ত আলোচনার পর আমরা হয়ত বুঝতে পারছি যে শিক্ষাকে দর্শনের একপ্রকার ফলিত রূপ হিসেবে বলা যেতে পারে। শিক্ষা ও দর্শনকে যদি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ ধরা হয় তাহলে দর্শন মুদ্রার মননশীল দিকটিকে দেখাবে আর শিক্ষা দেখাবে তার কার্যকরী বা ব্যবহারিক দিকটিকে।

১.৭ শিক্ষার উদ্দেশ্য (Aim of Education)

শিক্ষা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া। এটির কটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। বৃহত্তর অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) ব্যক্তিস্বার্থে

(খ) সামাজিক স্বার্থে

১.৭.১ ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ

ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্যে উন্নতি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার উন্নতি, তার ন্যায় অন্যায় বিচার বিবেচনার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি নানাবিধ গুণের সমন্বয়ের মাধ্যমে তার পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। কান্টের (Kant) মতে কোন এক ব্যক্তির মধ্যে যে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তোলার ক্ষমতা বর্তমান তার উন্নতি সাধনই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। (Educatiuon is the development in the individual of all the perfection of which he is capable"-- Kant)

১.৭.২ সামাজিক উদ্দেশ্য (Social Aim)

ব্যক্তিকে কখনই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় না। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল একটি ব্যক্তিকে সৃষ্টিশীল এবং কার্যকরী নাগরিকে পরিণত করা। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছিলেন— সামাজিক নিয়মনিষ্ঠার কাছে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন এবং সমাজকল্যাণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ে মহিমান্বিত হয় যেখানে ব্যক্তি হ'ল গোটা সমাজের একজন সদস্য মাত্র। বৃত্তিমূলক পারদর্শিতা সুনাগরিক হওয়ার জন্য অনুশীলন, অবকাশ যাপনের অনুশীলন এবং একটি জীবনকে পূর্ণাঙ্গ মানব হয়ে ওঠার প্রস্তুতি এ সবই হল এক সামাজিক অভ্যাস বা অনুশীলন। সামাজিক চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তি নিজেকে গড়ে তুলবে।

১.৭.৩ শিক্ষার সমন্বয় (Asynthesis)

এক অর্থে বলা যায় যে ব্যক্তি-স্বার্থ এবং সামাজিক উদ্দেশ্য একে অন্যের পরিপূরক। দেশ ও সমাজের উন্নতি বিধান তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে হয়ত এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে এটি সর্বোচ্চ স্তরে ব্যক্তিকল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি করে যেখানে ব্যক্তি এবং সমাজ একটি সর্বজনীন উদ্দেশ্যে কাজ করবে।

১.৮ লক্ষ্যের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Aims)

শিক্ষার লক্ষ্যকে হয়ত নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়:

- **জ্ঞানার্জন বা বিদ্যার্জন (Acquiring Knowledge)**

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। এটি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা এবং বুদ্ধিমত্তার উন্নতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার মোকাবিলায় ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন এবং তার যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিদ্যার্জন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পর্যাপ্ত জ্ঞান মানুষকে বিভিন্ন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে এবং তাকে আয়ত্বে আনতে সাহায্য করে। এটি এক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। প্রকৃত জ্ঞান মানব কল্যাণের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

● চরিত্র গঠন (Character formation)

শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হল শিশুসুলভ ব্যবহারের পরিমার্জন ঘটিয়ে একটি শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে তার মানবিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করা। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়— সব শিক্ষা, সমস্ত অনুশীলনের শেষ হওয়া উচিত প্রকৃত মানুষের গঠনে। ("... the end of all education, all training should be man making"— Swami Vivekananda.)

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে ভীষণ রকম প্রভাব বিস্তার করে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীর কাছে উদাহরণ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ হওয়া উচিত অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর যা মানসিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

● বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য (Vocational Aim)

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল একটি মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন— খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এইগুলির বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। আজকের পৃথিবীতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলাই হ'ল শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। বৃত্তিমূলক, কারিগরী এবং পেশাগত শিক্ষার উপর বর্তমানকালে বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। এর পিছনে যে মৌলিক ধারণা কাজ করছে তা হ'ল এই যে অর্জিত জ্ঞানকে যেন সমাজ ও ব্যক্তির সঙ্কট মোচনে যথাযথ এবং কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায়।

যাই হোক, মুক্ত ধারার শিক্ষা জনমুখী হয়ে চারিত্রিক, মানসিক এবং সার্বিকভাবে সামাজিক উন্নতির কথা বলে। অন্যদিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিল্পের অগ্রগতি এবং আর্থিক উন্নতির পথ দেখায় এবং এই দু'ধরনের শিক্ষাই একে অন্যের পরিপূরক।

● ঐক্য এবং সার্বিক উন্নতির লক্ষ্য (Harmony and overall Development Aim)

এতক্ষণ যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হ'ল এর মধ্যে যে কোন একটির উপর বিশেষভাবে জোর দিলে কিন্তু তা ব্যক্তিকে ভারসাম্যহীন উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত এক ঐকান্তিক উন্নতির পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি শিশুর চরিত্রের বহুমাত্রিক দিক যেমন ব্যক্তিত্ব, সামাজিক আবেগ, আধ্যাত্মিক, দৈহিক এবং নান্দনিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকগুলি ফুটে ওঠে। পেস্টালোজির (Pestalozzi) মতে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই হ'ল মৌলিক মানসিক শক্তি, কর্মশক্তির উন্নতি ও বিন্যাস।

● অবকাশের উদ্দেশ্য (Leisure Aim)

আধুনিককালে শ্রম সাশ্রয়কারী প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে একজন শ্রমিকের শ্রমদান করার পরেও অনেকটা সময় বাঁচে। আজ এটা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে এই অবকাশকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টিশীল কিছু করা যায়। আদর্শ শিক্ষা একটি শিশুকে শেখায় কিভাবে সে তার মধ্যে নিহিত সুপ্ত প্রতিভাকে সাধারণের ভাল'র জন্য কাজে লাগাতে পারে।

১.৯ শিক্ষার সমসাময়িক/সময়কালীন উদ্দেশ্য (Contemporary Aims of Education)

আমাদের শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) সালে জাতীয় উন্নতির পদ্ধতিরূপে শিক্ষার সংযুক্তিকরণের বিষয়ে কয়েকটি

ধারণার সুপারিশ করে।

(ক) ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা

(খ) সামাজিক ও জাতীয় ঐক্যের সমন্বয়

(গ) আধুনিকীকরণ

(ঘ) সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উন্নতিসাধন

১৯৮৬ সালে শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতিতে বলা হয় সমকালীন সমাজের বাস্তব চাহিদাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সমগ্র দেশের জন্য ১০ + ২ + ৩ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো।
- সমগ্র দেশের জন্য একটি সাধারণ পাঠক্রম যেটিকে প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক প্রয়োজনে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা সম্ভব।
- যে দশটি বিষয় প্রতিটি শিশুকে জানতে হবে তা হল
  - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস
  - সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা
  - ছোটখাট পারিবারিক নিয়ম
  - বিজ্ঞান মনস্কতা
  - নারী পুরুষের সমানাধিকার
  - পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার প্রতিরক্ষা
  - জাতীয় পরিচয়কে লালন করা
  - রাজনীতিক সমতাবাদ গণতন্ত্র ও সমাজবাদ
  - সামাজিক প্রতিবন্ধকতার দূরকীরণ।
- বিশ্বজনীন শান্তি ও সহমর্মিতাকে তুলে ধরা
- শিক্ষার সুযোগ সুবিধার সমানাধিকার
- আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের উন্নতি
- আজীবন শিক্ষার সুযোগ

১৯৮৬ সালে এন.পি.ই. (N.P.E.) শিক্ষাকে এক আদর্শ বিনিয়োগ বলে বর্ণনা করে সমাজে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এটি অনুভূতি এবং ধারণাকে আরও সুন্দরতর করে যে অনুভূতির জাতীয় সংহতি, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মন ও আত্মার স্বাধীনতার বিরাট অবদান থাকে। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র যেগুলি আমাদের সংবিধানে উজ্জ্বল ভাবে বলা আছে তাকে ধরে রাখার শিক্ষা একান্ত কাম্য।

১.১০ এককের সারসংক্ষেপ: মনে রাখার বিষয় (Unit Summary: Things to Remember)

শিক্ষা এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যাকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়:

- জ্ঞানার্জন
- দক্ষতা ও মানসিকতার উন্নতি
- সংস্কৃতির আদান প্রদান
- অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন
- সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব
- স্বাধীনচেতা বা মুক্তিকামী।

- শিক্ষার মধ্যেই সংস্কৃতি লুকিয়ে থাকে এবং শিক্ষিত ও মার্জিত জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতি আরও উন্নত হয়।

অতএব শিক্ষার দুটি প্রাথমিক ভূমিকা আছে

(i) এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে শিক্ষাকে প্রবাহিত করা।

(ii) মানুষকে বিশ্লেষণ, চিহ্নিতকরণ এবং প্রশ্ন করার ক্ষমতায় স্বাবলম্বী করে তোলা।

ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে "বিদ্যা" কে ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় এটি এসেছে আদি সংস্কৃত শব্দ "বিদ" থেকে যার আভিধানিক অর্থ হ'ল জ্ঞান, বাস্তবতা, পার্থক্য, সিদ্ধিলাভ নিমজ্জিত, আবেগে মানব জীবনে এবং তার উন্নতি বিধানে এই প্রত্যেকটি শব্দের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করে।

- শিক্ষার সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা যায়:

  (১) শিক্ষা এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।

  (২) শিক্ষা একজন মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে যথার্থরূপে ব্যক্ত করে।

  (৩) ব্যক্তির উন্নতি বিধান ঘটিয়ে শিক্ষা আসলে সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নতি ঘটায়।

  (৪) সামাজিক, মানবিক, আত্মিক এবং দৈহিক উন্নতির উপর শিক্ষা বিশেষভাবে জোর দেয়।

- সদর্থে শিক্ষাই হ'ল জীবনযাপনের একমাত্র প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে শিক্ষার ভুবন বহু বিস্তৃত। শিক্ষার মধ্যে প্রতিটি অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত এমনকি প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি হয় আদর্শ শিক্ষার মধ্যে।
- শিক্ষা একটি প্রবহমান প্রক্রিয়া। ভারতীয় দর্শন বিশ্বাস করে যে শিক্ষার অন্য রূপ বা নাম হল 'সংস্কার' বা একটি ধারণা যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে চলে।
- শিক্ষা হতে পারে আনুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত।
- দর্শনের প্রভাব শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান। এটি শিক্ষার মান, পদ্ধতি, পাঠক্রম এবং লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করে।

এটি পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার্থী এবং পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়নও স্থির করে।

- অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ উভয় ক্ষেত্র থেকেই শিক্ষা তার লক্ষ্যের উৎসকে খুঁজে পায়। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির সার্বিক উন্নতি সাধন।
- শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যই হ'ল
  - ❑ জ্ঞানার্জন
  - ❑ বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য
  - ❑ চরিত্র গঠন
  - ❑ ঐকান্তিক ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি
  - ❑ পরিপূর্ণ জীবনযাপন
  - ❑ সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং তার আদানপ্রদান।

১.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১. শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞার মাধ্যমে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

২. কিভাবে দর্শন শিক্ষাকে প্রভাবিত করে?

৩. শিক্ষার ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য কী?

৪. বৃহত্তর এবং সাধারণ অর্থে শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

১.১২ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১. শিক্ষার সংজ্ঞাগুলি লিখুন

(ক) পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সংজ্ঞা

(খ) ভারতীয় চিন্তাবিদদের সংজ্ঞা

২. আজকের দিনে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলি তালিকাবদ্ধ করুন।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদ ও তার প্রয়োগ সংজ্ঞাসহ আলোচনা করুন।

১.১৩ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Classification)

সমগ্র এককটি পাঠ করার পর কিছু বিষয়ে পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে।

১.১৩.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

১.১৩.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

১.১৪ উৎস (References)

- Dhiman, O.P. (1987), *Foundation of Eudcation*, Atma Ram & Sons, Delhi.
- Agarwal, J.C. (1999), *Theory and Principles of Education*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.
- Tripathi, Shaligram (1993), *Sikha Siddhanta*, Venkatesh Prakashan, Delhi.
- Rao, N.P. (1996), *Education and Human Resources Management*, APH Publishing Corporation, New Delhi.
- Chalam, K.S. (1993), *Education Policy for Human Resources Development*, Rawat Publication, Jaipur.
- NCERT (1986), *School Education in India— Present Status and Future Needs*, New Delhi.
- MHRD (1986), *Learning the Treasure withing, Report on UNESCO of the International Commission of Education for 21st. Century*, CBSE, New Delhi.
- Sri Aurbindo Society (1996), *A New Approach to Education*, Sri Aurobindo Institute of Research in Social Sciences, Sri Aurobindo Society, Pondicherry.

একক ২ ❑ শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ: A NEW APPROACH OT EDUCATION

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা

২.৪ শিক্ষা বিষয়ে পরিবর্তিত ধারণা

২.৪.১ সংশ্লিষ্ট, কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন

২.৫ একুশ শতকীয় শিক্ষার বহুমাত্রিকতা

২.৬ শিক্ষা শৈলী এক আভ্যন্তরীণ সম্পদ: জীবনধারণের বিজ্ঞান ও শিল্প

২.৬.১ শিক্ষা শৈলী জীবনধারণের বিজ্ঞান ও শিল্প

২.৭ শিক্ষকের ভূমিকা

২.৭.১ শিক্ষকের ক্রমবিকাশমান ভূমিকা

২.৮ সারাংশ: স্মরণীয় বিষয়সমূহ

২.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.১০ বাড়ীর কাজ

২.১১ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১১.১ আলোচনার সূত্রাবলী

২.১১.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী

২.১২ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

তথ্যপ্রযুক্তির বৈপ্লবিক ক্রমবিকাশের ফলে আজ প্রতি তিন মাস অন্তর জনমানসে জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে। মানব ইতিহাসের আজ এমন এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের কাছে ভবিষ্যতের যে-কোন সমস্যা মোকাবিলা করার পথ উন্মোচন করে দিচ্ছে। সে যেমন সমস্যাই হোক না কেন, হোক না সেটা সার্বিক, আঞ্চলিক, চিরাচরিত, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত এবং সর্বোপরি আধুনিক সামাজিক সমস্যা। আগামী প্রজন্ম এই সব টানাপোড়েন থেকে থাকবে মুক্ত। জ্ঞানের পরিধির ব্যাপ্তি এবং তাকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা আজকের যুগের মানুষের এতটা বেড়ে গিয়েছে যে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ আজ মানুষকে এক আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

- শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন আজ নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।
- পরিবর্তিত পটভূমিকায় শিক্ষার লক্ষ্য কিভাবে বদলে যায়।
- শিক্ষার বিভিন্ন অংশ বিশেষের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন অনুধাবন।
- একুশ শতকে শিক্ষার বিভিন্ন মাত্রাকে চিহ্নিত করা।
- কলা ও বিজ্ঞানে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করা।
- শিক্ষাকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহ সর্বাঙ্গীন বাঁচার পথ হিসেবে অবলম্বন করা।
- নূতন পৃথিবীতে শিক্ষকের ভূমিকাকে যথাযোগ্য মর্যাদার পথ হিসেবে অবলম্বন করা।
- একুশ শতকের নীতি অনুযায়ী অর্জিত দক্ষতা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও এমন মানসিকতা তৈরী করা।

২.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা (The need for the new approach of Education)

শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় নীতি বলছে যে অতীত ইতিহাসে এমন মুহূর্ত এসেছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শতাব্দী প্রাচীন পদ্ধতিকে পাল্টে ফেলে এক নতুন দিকের সন্ধান পাওয়া গেছে আজ আবার এমনই এক মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এটি আরো বলছে যে উচ্চতর শিক্ষা আজ মানুষকে সামাজিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক যে কোন সঙ্কটের মোকাবিলা করার সুযোগ এনে দিয়েছে। জাতীয় উন্নতিতে এটির অবদান অনস্বীকার্য। একই সঙ্গে এটি আরো বলছে যে উচ্চতর শিক্ষাকে পূর্বের তুলনায় আরো গতিময় হতে হবে। "জ্ঞানের স্ফুরন" এবং "কারিগরী ক্ষেত্রে বিপ্লব" আধুনিক বিশ্বের আপামর মানুষের ওপর এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর নাটকীয় রেখাপাত করেছে। এগুলি হতে পারে আমাদের সাজসজ্জার ধরনধারণ, গৃহস্থলীর সরঞ্জাম, গৃহনির্মাণ, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে। জীবন-যাত্রার ধরন, খাদ্যাভ্যাস, নতুন নতুন রন্ধন প্রণালী এবং স্বাস্থ্য সচেতনতায় এর যথেষ্ট প্রভাব আছে. জীবিকার ক্ষেত্রে বাছবিচারের সুযোগ দিয়েছে এমন কী চিন্তার পদ্ধতিও অনেক পাল্টে গেছে. এই পরিবর্তন সর্বত্র হচ্ছে এবং অতি দ্রুত গতিতে হচ্ছে। মানুষের জীবনের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ বহুগুণ বেশী বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এইসব পরিবর্তনকে তুলনায় অনেক ধীরে গ্রহণ করেছে। আমাদের চেতনায় আজও সেই গুরু শিষ্য সম্পর্কিত নিয়মানুবর্তী ব্যবস্থাকে বর্তমান হয়ত বা এর চেয়ে সামান্য একটু এদিক ওদিক। আজ যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল মানসিক কাঠামোর পরিবর্তন হওয়া : মানবিকতাকে রূপ দিতে শিক্ষাই হ'ল সবচেয়ে ক্ষমতা সম্পন্ন উপায়। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত শিক্ষাকে পরিবর্তনশীল সময়ের উপযোগী করে আরো শক্তিশালী করে তোলা।

উন্নয়নশীল সমাজে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করার আগে বহুবছর ধরে শিক্ষার সম্বন্ধে যে পরিবর্তিত ধারণাগুলি বিভিন্ন সময়ে আমাদের মনে তৈরী হয়েছে সেগুলি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এই ধারণাগুলিকে নিচের সারণীতে দেওয়া হ'ল:

সারণী-১

ক্রমিক সংখ্যা	সমাজের প্রকারভেদ	জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য	চাহিদা	পঠন এবং শিক্ষার প্রকৃতি	পঠন এবং শিক্ষার গতি
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রাগৈতিহাসিক, শিকার সংগ্রহ নির্ভর	অস্থিরপ্রকৃতি, যাযাবর, সহজাত, ভীরু, সদা সচেষ্ট	প্রাথমিক, দৈহিক- খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, সুনিশ্চিত নিরাপত্তা	স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক, অনিয়মিত, বিশৃঙ্খল, ব্যক্তিগত	অতি ধীর, দীর্ঘ-কালীন প্রক্রিয়া
২	কৃষিভিত্তিক	সুস্থির জিজ্ঞাসাপ্রবণ/ কৌতুহলী, নির্দিষ্টরূপী, স্বাভাবিক স্বনির্ভর, সহজতর রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা	দৈহিক, সামাজিক সামান্য প্রযুক্তিগত হিসেবী সীমিত	পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক, পরীক্ষানির্ভর, সামাজিক অভিজ্ঞতালব্ধ, সুশৃঙ্খল সহযোগিতামূলক	ধীর
৩	শিল্পভিত্তিক	যান্ত্রিক প্রতিযোগিতামূলক, শহর কেন্দ্রিক, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ নির্ভর, কর্ম-তৎপর, জনগণ নির্ভর সাম্রাজ্যবাদী	প্রযুক্তি নির্ভর, সংস্থান নির্ভর, ব্যক্তিগত মনোসামাজিক সতত বিস্তারমুখী আন্তর্জাতিক সবিশেষ	পরীক্ষা নির্ভর, অনুকরণপ্রিয়, তথ্যভিত্তিক, প্রতিযোগিতামূলক, বৃত্তি নির্ভর, কর্মমুখী আত্ত-ব্যক্তি কেন্দ্রিক, গোষ্ঠী নির্ভর	দ্রুত
৪	শিল্প-পরবর্তী বিকাশশীল সমাজ	জ্ঞানভিত্তিক, ব্যক্তিতান্ত্রিক, আন্তঃগোষ্ঠী	বিশ্বজনীন/ আঞ্চলিক, ব্যক্তিগত	ভীষণরকম তথ্যনির্ভর, অনুমান ভিত্তিক, চিন্তামূলক নমনীয়	অতি দ্রুত

এক নম্বর সারণী থেকে এটি পরিষ্কার যে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির ওপর শিক্ষা ও পঠন পাঠন কতটা নির্ভরশীল। এই পরিবর্তন অনেকটাই সমাজের চাহিদাগুলির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। পুরো শিক্ষা বিষয়টি এত জটিল যে একটি মাত্র সংজ্ঞার দ্বারা একে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টায় এবং একই সঙ্গে শিক্ষার মানেও বদলে যায়। এই কারণেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদেরা সময়ে সময়ে শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

শিক্ষার পরিবর্তিত ধারণাগুলি সম্বন্ধে আলোচনার আগে, শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

২.৪ শিক্ষার বিষয়ে পরিবর্তিত ধারণা (Changing Concepts of Education)

শিক্ষার প্রয়োজনীয় কিছু উপাদান

(i) শিক্ষক	(ii) ছাত্র	(iii) পাঠ্যপুস্তক
(iv) বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়	(v) শ্রেণীকক্ষ	(vi) পঠন পদ্ধতি
(vii) পড়াশুনা	(viii) লেখালেখি	(ix) মনোযোগ সহকারে শোনা
(x) মনে রাখা	(xi) অনুধাবন	(xii) পরীক্ষা
(xiii) কৃতিত্ব	(xiv) সাফল্য	(xv) ব্যর্থতা
(xvi) নিয়মশৃঙ্খলা	(xvii) অনুশীলন	(xviii) বিস্মরণ

আরো একটু মনোনিবেশ সহকারে যদি শিক্ষার বিভিন্ন উপাদনগুলিকে গভীরভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয় তা হলে হয়ত দেখা যাবে যে উপরিউল্লিখিত উপাদানগুলির সঙ্গে আরো অনেক নতুন উপাদান যোগ করা হয়।

পাঠকরা আরো পাঁচটি উপাদান যোগ করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি শিক্ষা সম্বন্ধীয় নয় তা চিহ্নিত করুন:

(i) ভ্রমণ

(ii) ধ্যান

(iii) টেলিভিশন দেখা

(iv) কমপিউটারে খেলা

পাঠকের উচিত এর মধ্যে থেকে শিক্ষার সঠিক উপাদান এবং ধারণাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সঠিক দিকে চালিত করা। এই সবগুলিকে নিয়েই শিক্ষা। এছাড়াও শিক্ষার বিষয়বস্তু আরও অনেক কিছু হতে পারে এই মুহূর্তে যা হয়ত আমাদের চিন্তার বাইরে। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবার এবং শিক্ষা বিষয়ক নতুন চিন্তার অবকাশ এখনও রয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়াটিকে আরো উপযোগী করার জন্য শিক্ষা বিষয়ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ করা হ'ল:

- কতিপয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য
- শিক্ষক
- ছাত্র
- বিদ্যালয়
- পাঠক্রম

- শিক্ষাদান ও পাঠক্রম আদানপ্রদানে
- পরীক্ষা/মূল্যায়ন

এই প্রত্যেকটি উপাদানকে আলাদা ভাবে যদি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নিরিখে তুলনা করা যায় তাহলে হয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। দেখা যাক এই বিষয়ে ২য় (দ্বিতীয়) সারণী আমাদের কীভাবে সাহায্য করে।

সারণী-২

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষার উপাদান সমূহ	অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যৎ
১	২	৩	৪	৫
১	লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	ঈশ্বর-অনুভূতি, আত্ম-অনুভূতি, মুক্তি, স্থির-নির্দিষ্ট	কর্মনিযুক্তি	আত্মোন্নতি, চাহিদা-পরিপূরণ
২	শিক্ষকবৃন্দ	ঈশ্বরের ঠিক পরেই, কর্তৃত্বপূর্ণ পরিজ্ঞানী, সচ্চরিত্র, গোঁড়া	সাধারণের একজন, উদারচেতা, মুক্তমনা, বয়ঃজ্যেষ্ঠ	অল্প বয়সীরাও শিক্ষক হতে পারবে। এমনকি যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যার যথাযথ জ্ঞান আছে সে-ই শিক্ষক হতে পারবে
৩	ছাত্রবৃন্দ	নিয়মনিষ্ঠ, বাধ্য, বয়স-ভিত্তিক, অনুগত	মুক্তমনা, অপেক্ষাকৃত কম নিয়মনিষ্ঠ	সামান্য নিয়মনিষ্ঠ, যে কেউ ছাত্র হতে পারবে
৪	বিদ্যায়তন	গুরুকুল, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আলাদাভাবে অবস্থিত	বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়	স্ব-গৃহ, সাইবার কাফে, যে-কোন জায়গা
৫	শিক্ষণ-পঠন পাঠন সামগ্রী	প্রাথমিক অবস্থায় কিছু ছিল না, পরবর্তীকালে হস্তলিপি বা নানাবিধ মুদ্রিত পাঠ সামগ্রী	ডেস্ক-টপ মুদ্রণ	ই-পুস্তক, অসদ পুস্তক
৬	শিক্ষণ/পঠন	শিক্ষককেন্দ্রিক, জীবন সম্বন্ধীয়, আবাসিক, বিধিবন্ধনহীন	ছাত্র-কেন্দ্রিক, বিধি-বন্ধনহীন	পাঠক/শিক্ষার্থী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
৭	মূল্যায়ন/পরীক্ষা	বিধিসম্মত/বিধিমুক্ত পার্বিক	ক্রমাগত মূল্যায়ন গোষ্ঠী-বদ্ধ পুস্তক সম্বলিত	স্ব-মূল্যায়ন, শিক্ষার্থী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে এক বিশাল পরিবর্তন চোখে পড়ে। অতীত থেকে বর্তমানে শিক্ষার একটি আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য ঈশ্বর অনুভূতির স্তর থেকে সরে এসে আজ কর্মমুখী হয়েছে। শিক্ষকদের আজ আর অবতার বা ঈশ্বরের সমান ভাবা হয় না এমন কী সচ্চরিত্র এবং অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতিরও ভাবা হয় না।

ছাত্ররাও আজ আর ততটা শিক্ষকের প্রতি অনুগতম এবং নম্র ধরনের নয়। আজকের ছাত্ররা শিক্ষকের তুলনায় নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী চলতে চায়। ছাত্ররা আজ শেখার চেয়েও উপার্জনে বেশী উৎসাহী। বিদ্যায়তনগুলি আজ আর আগের মত বিদ্যামন্দির রূপে বিবেচিত হয় না। যদিও বছরের পর বছর ধরে পাঠক্রম প্রায় একই আছে। যদিও নতুন নতুন অনেক বিষয় যুক্ত হয়েছে এবং মনে করা হচ্ছে যে হয়ত আগামীদিনে পাঠক্রম বিবিধমুখী এবং আজকের তুলনায় সম্পূর্ণভাবে আলাদা ভাবে তৈরী হবে। এটি হবে পুরোপুরি প্রয়োজনভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক এবং নমনীয়। এই প্রসঙ্গে এন.সি.ই.আর.টি. (NCERT) এবং এন.সি.টি.ই. (NCTE) তৈরী পাঠক্রম ও তার সূচী অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসাসূচক পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষণ প্রণালী অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। বিজ্ঞান ও কারিগরীর সহায়তায় যেমন টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক মুদ্রণ যন্ত্র, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, দূরশিক্ষা, On-line শিক্ষা ইত্যাদি। শিক্ষা আজ তাই এক বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

শিক্ষা কখনই এককালীন প্রক্রিয়া নয়। এটি সমগ্র জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসাবে আজ সর্বগৃহীত। শিক্ষার কোন সীমারেখা নেই। "সর্বশিক্ষা অভিযান" (Education for all) যা বয়স্ক শিক্ষা এবং অপ্রচলিত ধারার শিক্ষার অঙ্গ এগুলি কয়েকটি সূচক। পরীক্ষা ব্যবস্থা/শিক্ষাব্যবস্থা আজ বাষ্পাষিক বা বাৎসরিক থেকে সারা শিক্ষাবর্ষব্যাপী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে আজ একজন ছাত্র কোন বহিরাগত ব্যক্তি বা শিক্ষক এমনকী শিক্ষা পর্ষদের ওপর নির্ভর না করে নিজের মূল্যায়ন করতে পারে। স্বঅনুশীলনের মত এটিও সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

২.৪.১ সংশ্লিষ্ট কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা (Changes Associated and Likely)

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আদর্শ শিক্ষা তার মূল উপাদানগুলির সমষ্টির চেয়ে অনেক বেশী। এটি কিছুটা স্বতন্ত্র। যদিও সামগ্রিক শিক্ষা সব সময়েই তার একটি অংশ বিশেষের চেয়ে বড়। যদিও এতে করে আমাদের পক্ষে শিক্ষাকে অনুধাবন করতে কোন অসুবিধা হয় না। শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা ব্যাপারটির মধ্যেই এক ধরনের পরিবর্তন এসে যায়। শিক্ষা সামাজিক নিয়মের অন্তর্গত বিষয় হওয়ার ফলে এর উপর সামাজিক বা ব্যক্তি পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ে। পরিবর্তন যেহেতু একটি সতত পদ্ধতি তাই প্রত্যেককেই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই পরিবর্তন কখনও খুব ধীরে যেভাবে পর্বত গাত্রে গিরিবর্তের সৃষ্টি হয় যা আমাদের দৈহিক পরিবর্তনের ন্যায়। আর কিছু কিছু পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যার সাথে একমাত্র অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত অট্টালিকার তুলনা চলে। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক এইটিই হয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে অভাবনীয় গতিতে পরিবর্তন হয়েছে, যেমন যোগাযোগ মাধ্যম, আবার কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ধীরগতির, যেমন আমাদের আচার ব্যবহার, মানসিকতা ইত্যাদি আর কিছু ক্ষেত্রে একেবারে শ্লথগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়: যেমন শিক্ষক ও প্রশাসকের বেলায় যাঁরা অত্যন্ত বাঁধাধরা এবং গোঁড়া নিয়মতান্ত্রিক ধারণায় আবদ্ধ। এই পর্যন্ত পড়ে আমাদের কী এই ধারণা হওয়া উচিত নয় যে পরিবর্তন যেন এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার তখন একে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়? আন্তরিক ভাবে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করলে শিক্ষাক্ষেত্রে এটি একটি নতুন দিক নির্দেশ করে সমাজকে এক নতুন পথের দিশা দিতে পারে।

পরিবর্তন একটি দ্বিমুখী অস্ত্রের মত যার দুটি দিক দিয়েই কাটা যায়। এমন কোন কথা নেই যে পরিবর্তন সব সময় অর্থপূর্ণ এবং ভালর জন্যই হবে: এটি অনর্থক ক্ষতিকারক এমনকি ধ্বংসাত্মকও হতে পারে। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির থেকে এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে:

- একজন পাল্টাবে/বদলাবে/পরিবর্তিত হবে কেন?
- পরিবর্তন কী একান্ত প্রয়োজনীয়? সব পরিবর্তনের ফল কী ভাল?
- পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোন একজন কী নিজেকে অপরিবর্তিত রাখতে পারে?
- কম্পিউটারের মাধ্যমে কী শিক্ষার নীতিবোধ সঞ্চার করা সম্ভব?
- শিক্ষাক্ষেত্রে কোন জায়গাগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন?
- শিক্ষাক্ষেত্রে কোন স্তরগুলি ধীরে পরিবর্তন করা যেতে পারে? এবং তা কত ধীরে?
- বয়স্ক শিক্ষকেরা কী আদৌ তরুণ শিক্ষকদের মত পরিবর্তিত হন?
- পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাকে উপমা রূপে ধরা হবে। তরুণ প্রজন্ম নাকি বয়স্ক প্রজন্ম?
- একজন শিক্ষকের আচরণ এবং শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তনের চেয়ে কেন একটি শ্রেণীর পঠন পাঠনের কারিগরিগত প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ?
- পরিবর্তনের ভাল ও মন্দ দিকগুলি কিভাবে নির্ধারিত হবে?
- শিক্ষক ও ছাত্রের পরিবর্তনের গতির মাত্রা কী ও কতখানি হওয়া উচিত?
- প্রশাসকেরা কেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করেন না?
- পরিবর্তনকে কীভাবে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম রূপে গ্রহণ করা যায়?
- রাজনীতিকরা কেন শিক্ষকদের চেয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল?

শিক্ষার নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত পরিবর্তন আপনি কিছু প্রশ্নের ক্রম তৈরি করতে পারেন।

প্র : ১

প্র : ২

প্র : ৩

প্র : ৪

প্র : ৫

শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারণা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনি ইচ্ছা করলে কিছু টীকা লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

— কম্পিউটর সহায়তার মাধ্যমে নির্দেশ।

— দূর সঞ্চারী শিক্ষা

— সর্বদা-বিদ্যমান শিক্ষা

— ব্যক্তি নির্ভর নির্দেশ:

— বিদ্যায়তন হীন সমাজ:

— মানবাধিকারের শিক্ষা:

— নীতি শিক্ষা

— তথ্য প্রযুক্তি

— সারাদেশ ব্যাপী শ্রেণীকক্ষ

— অসদ্ (virtual) শ্রেণীকক্ষ

— জ্ঞান দর্শন

— পরিবেশ সম্বন্ধীয় শিক্ষা

— বয়স্ক শিক্ষা

— জন শিক্ষা

— বিশেষ শিক্ষা

— বয়ঃসন্ধির শিক্ষা

— এইডস্ সম্বন্ধে শিক্ষা

— পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা

— জীবন ব্যাপী শিক্ষা

— মুক্ত শিক্ষা

উপরিউল্লিখিত ক্রমবিকাশমান ধারণাগুলি যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করে প্রবর্তন করা হয় তখন দেখা যায় যে সময়ের দাবী মেনে শিক্ষাও এই দাবীপূরণে সক্ষম হয়ে ওঠে। শিক্ষা জীবনের মূল রস হওয়ার ফলে এটি সদাই গতিময় একটি ধারা যা বর্তমানকে উন্নত করে ভবিষ্যতে আরও উন্নততর হওয়ার দিকে এগোয় কিন্তু কখনই অতীত গরিমার কথা ভোলে না। এর জন্য অসংখ্য মানুষের মনের অনুশীলনের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বিষয়ের উপর সমাজের বহুপ্রাচীন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এসব দূর করতে হবে। এই বিষয়ে এমন এক মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন যাতে করে মন যে কোন রকম পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে পারে।

২.৫ একুশ শতকীয় শিক্ষার বহুমাত্রিকতা (Dimensions of Education in the Twenty-first Century)

আমরা যত একুশ শতকে প্রবেশ করছি এবং এগিয়ে চলেছি ততই আমরা নানা রকমের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি যা আমরা কখনও হয়ত কল্পনাও করিনি। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের পর আজ একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমরা একটি অত্যন্ত সংকোচনশীল পৃথিবীতে বাস করছি অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির এই উল্লেখযোগ্য উন্নতির ফলে পৃথিবীর দুটি সুদূরবর্তী দেশের মধ্যে যোগাযোগ আজ অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে গেছে। আজ মনে হয় সেইদিন হয়ত আগত প্রায় যেদিন সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবারভুক্ত হয়ে যাবে সংস্কৃত ভাষায় বহু আগে যাকে বলা হয়েছে বসুধৈব কুটুম্বকম।

নূতন শতাব্দী বিভিন্ন দিকে যেমন স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাণিজ্য, সংযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাস্তুশাস্ত্র,

আইন, কৃষি, সামরিক ক্ষেত্র ইত্যাদি নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে তেমনি একইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতারও সৃষ্টি করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিভিন্ন রোগকে নিয়ন্ত্রণে এনে যে অভূতপূর্ব সাফল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে বিজ্ঞানী মহল নিরসল ভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছে মনুষ্য প্রতিলিপি বা Human cloning-এর কাজে এমনকী মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা বা মৃত্যুকে অস্বীকার করার সাহসও আজ আমরা দেখাতে পারছি। এক্ষেত্রে নৈতিকতার মাত্রা কতখানি সে বিষয়ে প্রশ্ন এসে যায়। এই সাফল্যের কতটুকু প্রয়োজন আর কতটুকুই বা অনাকাঙ্খিত সে কথা ঠিক করবে কে? এবং কেমনভাবে?

তাই আমাদের সুবিধার্থে একুশ শতকের কিছু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন :

i) বিশ্বায়ন

ii) ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা

iii) পারস্পরিক নির্ভরতা

iv) দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা

v) সাংস্কৃতিক সংঘাত

vi) পরিবেশ/প্রকৃতিগত উদ্বেগ

vii) পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকার

viii) ই-কমার্স (e-commerce) বা বৈদ্যুতিক বাণিজ্য, ই-গর্ভন্যান্স (e-governance) বা বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ

ix) বিস্তৃতভাবে অধিগত করার ক্ষমতা/নূতন জ্ঞান

x) যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লব

সম্ভাবনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা

৩নং সারণীর থেকে আমরা নূতন শতাব্দীর সম্ভাবনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ মূলক দৃষ্টি নিতে দেখতে পারি।

সারণী-৩

সম্ভাবনা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
i) ভৌগোলিক সীমারেখার সংকোচন	i) ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপ/দ্বন্দ্ব
ii) ব্যাপক ব্যক্তি স্বাধীনতা	ii) ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভরতা
iii) দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা	iii) বোঝাপড়ার অভাব
iv) সাংস্কৃতিক মিলন	iv) আত্ম পরিচয়ের ঘাটতি
v) নতুন ওষুধপত্রের আবির্ভাব এবং সভ্যতা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি	v) বহু পুরাতন পদ্ধতিগুলির অবহেলা/স্বাস্থ্য বিধির অবমাননা
vi) মূল্যবোধের পরিবর্তন	vi) সংরক্ষণশীল মূল্যবোধ
vii) মানবাধিকার সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা	vii) মানুষকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতার অপপ্রয়োগ
viii) ক্রমবর্ধমান বস্তুবাদ	viii) আধ্যাত্মিকতার হ্রাসপ্রাপ্তি
ix) বিশ্বজনীন হয়ে ওঠা	ix) ব্যক্তি বা অঞ্চল থেকে দৃষ্টি হারিয়ে যাওয়া
ix) সীমাহীন নমনীয়তা	x) বিষয় বস্তুর অভাব

উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও একজন একনিষ্ঠ পাঠক সম্ভাবনার নিরিখে আরও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক অবস্থার কথা চিহ্নিত করতে পারে। এভাবে আরও পাঁচটি নতুন ঘটনা, তার সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করুন।

নূতন সম্ভাবনা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
১	
২	
৩	
৪	
৫	

যেহেতু নূতন শতাব্দী কোন আকাশকুসুম প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়নি বরং সে আজ অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন এবং তার সমাধান খোঁজায় ব্যস্ত। এক্ষেত্রে শিক্ষাই সেই সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার প্রধান চালিকা শক্তি।

তাই শিক্ষকদের কাছে সমাজের এক বিরাট প্রত্যাশা থাকে। দুরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ শিক্ষার কাছে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সব রকম আশা আকাঙ্ক্ষাকে সপে দেয় এই প্রত্যয় নিয়ে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষার মাধ্যমে অনেক বেশি মানসিক পরিপূর্ণতা নিয়ে অনেক সহজে এবং যোগ্যতার সঙ্গে নতুন শতাব্দীর চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে।

নিম্নলিখিত সারণী থেকে সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে সমস্ত বিকাশশীল ক্ষেত্রে জোগানের প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সারণী-৪

মাত্রা	প্রয়োজনীয় জোগান
১. আন্তর্জাতিক উদ্বেগ	সকলের জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, সমানাধিকার, আন্তর্জাতিক প্রবেশাধিকার, শিক্ষার বিশ্বায়ন, কার্যকরী, শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষা, জীবন-ব্যাপী শিক্ষা, Virtual শিক্ষায়তন।
২. ব্যক্তিগত	বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, আপন গতিতে নিজের মত করে শিক্ষা, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্দেশ, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষা।
৩. সমাজ-সংস্কৃতি	মুক্তভাব, নমনীয়তা, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়, সাংস্কৃতিক পরিচয়, বর্ণনা, সহমত, ধর্মীয় ঐক্য।
৪. আর্থিক	উৎপাদনশীলতা, উন্নতি, লাভজনক কর্মসংস্থান, মুক্ত বাজার, বৈদ্যুতিন বাণিজ্য, প্রতিযোগিতা সমবায়, স্বশাসন, সংকোচন, ক্ষুধার নিবৃত্তি, জরা, মৃত্যু, দারিদ্র্য এবং অপুষ্টি, বেসরকারীকরণ, বহুজাতিক সংস্থা, ভোগবাদ।
৫. রাজনৈতিক	বিশ্বনাগরিক, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, আন্তর্জাতিক আইন, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত।
৬. প্রযুক্তি পেশাদার	তথ্য ও প্রযুক্তি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, স্বচ্ছতা, কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা, গণমাধ্যম, মাল্টিমিডিয়া, অতি উন্নত বিশেষজ্ঞতা, সংযুক্তি, নিয়মিতভাবে জ্ঞানবৃদ্ধি।
৭. পরিবেশগত	স্থিতিশীল উন্নতি, দুষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বন উচ্ছেদ, জীবন যাপনের বিভিন্ন ধারার প্রতি শ্রদ্ধা, দায়বদ্ধতা।

শিক্ষা যদি অনুপ্রেরণামূলক না হয় শুধুমাত্র গতানুগতিক কাজ হয় তবে আমাদের উচিত একে গতিশীল সমাজের গতিময়তার মধ্যে প্রোথিত করা। শিক্ষার মাধ্যমে নতুন শিক্ষক উঠে আসবেন, যাঁর মধ্যে থাকবে নূতন মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতা এবং কুশলতা। শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতিকে নতুনভাবে রচনা এবং প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সমাজের সামগ্রিক কিছু কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শিক্ষা বিষয়টিকেও খানিকটা নমনীয় হতে হবে এবং পঠন-পাঠন পদ্ধতি এবং নূতন নূতন পাঠক্রমকে যত দ্রুত সম্ভব আপন করে নিতে হবে যার মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি একটি অন্যতম বিষয়, এর মধ্যে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, গণমাধ্যম, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদিকে আরও বিশদ ও দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। প্রযুক্তির সাহায্যপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক সবসময়ই যিনি প্রযুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাঁর তুলনায় স্বক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্ষম।

UNESCO'র জে ডলর (J. Dolors) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অনুশীলনের আভ্যন্তরীন ঐশ্বর্য বা সম্পদ মূলত চারটি বিষয় চারটি স্তম্ভ বলে বিবেচিত হয়।

১. সম্পাদন করার শিক্ষা

২. অস্তিত্বমান বা পরিণত হয়ে ওঠার শিক্ষা

৩. শিক্ষা গ্রহণের শিক্ষণীয় পদ্ধতি

৪. অপরের সঙ্গে একসাথে বাঁচার শিক্ষা

শিক্ষা বিষয়ে উপরি উল্লিখিত চতুর্থ স্তম্ভটি অর্থাৎ অপরের সঙ্গে একসাথে বাঁচার শিক্ষা-এর মূল উদ্দেশ্যই হল নাগরিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলা যা অপরকে সম্মান করতে শেখায়। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই সে যেন কখনই একা একা বাঁধার কথা না ভাবে। বরং সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য অপরের অস্তিত্বকে তাকে স্বীকার করতে শেখায় কারণ অন্য মানুষটিও সমাজেরই একজন সদস্য। এটিই হল পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বেঁচে থাকার সামাজিক উদ্দেশ্য। নূতন সহস্রাব্দের দাবীই হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থপূর্ণ ভাবের আদানপ্রদান, সহযোগিতা এবং উন্নতি।

২.৬ শিক্ষাশৈলী এক আভ্যন্তরীণ সম্পদ : জীবন ধারণের বিজ্ঞান ও শিল্প (Hearing—The Treasure within: Science and Arts of Living)

আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন অত্যন্ত সঠিকভাবে তাদের প্রতিবেদনে বলেছিল যে শিক্ষা এক অভ্যন্তরীণ সম্পদ। শিক্ষা বাস্তবিকই এক সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে এটি মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শিক্ষার চেয়ে বড় আর কোন সম্পদ হতে পারে না। ফ্রান্সিস বেকন যেমন বলেছেন জ্ঞান যদি ক্ষমতা হয় তবে জ্ঞানার্জনের অনুশীলন হল ক্ষমতাশালী হওয়ার এক বিরল অভিজ্ঞতা। ধারণা যদি বিশ্বকে শাসন করে তবে জ্ঞানের অনুশীলনই হল সেই স্বর্ণালী পথ যা মানুষকে ধারণার সাম্রাজ্যে নিয়ে যায়। অনুশীলন এক উত্তেজনাময় অভিজ্ঞতা যে উত্তেজনা অনেক বেশি অন্তরে অনুভূত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও গান্ধীজির কথায় যেন একই সুর শোনা যায় যে মানুষের মধ্যে যে আজন্ম দিব্যভাব আছে শিক্ষা তাকেই বিস্তৃতি দেয়। একটি শিশুর শরীর মন এবং আত্মায় যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ লুকিয়ে থাকে শিক্ষা তাকে টেনে বার করে আনে।

২.৬.১ জীবনধারণের বিজ্ঞান ও শিল্পরূপে শিক্ষা (Learning as Science and Art of Living)

অনুশীলন বিজ্ঞান ও শিল্পের সমন্বয়, জীবন ধারণের পক্ষে উভয়েই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নলিখিত সারণীটি অনুধাবন করে এর যৌক্তিকতা বোঝার চেষ্টা করুন:

সারণী-৫

নূতন সম্ভাবনা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
নিয়মনিষ্ঠ	ব্যক্তিকেন্দ্রিক
বিবেচনা নির্ভর	শৈল্পিক/চিরাচরিত
গবেষণামূলক	সৃষ্টিশীল
পরীক্ষামূলক	কৃতিত্ব নির্ভর
বিষয়মুখী/লক্ষ্যভেদী	

উপরিউল্লিখিত সারণী থেকে এটি প্রতিভাত হয় যে অনুশীলন একটি নিয়মনিষ্ঠ পর্যায় ভিত্তিক প্রচেষ্টা : এটি একটি নির্দিষ্ট নীতি ও রূপরেখা মেনে চলে। পরিবেশের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এটি একটি পথ বিশেষ। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা থেকেই এর উৎপত্তি এবং আত্ম-তুষ্টিতেই এর সঞ্চয়ে এটি একটি পথ বিশেষ। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা থেকেই এর উৎপত্তি এবং আত্ম-তুষ্টিতেই এর পরিসমাপ্তি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে এবং এই অনুশীলন পদ্ধতি আজ আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছেছে। এটি একান্তই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হওয়ার ফলে পুরো পদ্ধতিটির মধ্যে কখনও কখনও শৈল্পিক ছোঁয়াও থেকে যায়।

পঠন-পাঠন একই সঙ্গে লক্ষ্যপূরণের উপায় হতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হই এবং অনেক কিছু শিখি। পঠন-পাঠন একসময় জীবনে পরিসমাপ্তি এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে পর্যবসিত হয়। পঠন-পাঠন ক্রমবর্ধমান ভাবে আমাদের জীবনকে সম্পদশালী করে। আমরা যতই শিখি ততই জীবনের সংকটপূর্ণ অবস্থান সাথে মানিয়ে নেওয়া আয়ত্ত করি। শিক্ষা আমাদের জীবন ও জীবন যাত্রার মানকে প্রতিনিয়ত উন্নত করতে সাহায্য করে। শিক্ষা আমাদের জীবনের নির্যাসের সন্ধান দেয়। শিক্ষা এবং পঠন পাঠনের মাধ্যমে আমরা দুরগম্যের কাছে পৌঁছুতে পারি। এই কারণেই শিক্ষা একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও শিল্পের যুগ্মরূপ।

২.৭ শিক্ষকের ভূমিকা (Role of a Teacher)

পারিপার্শ্বিক সবকিছুর মত শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, ছাত্র, বিদ্যায়তন, প্রযুক্তি, মূল্যবোধ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্ম বিষয়েও ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই বা কী করে স্থিতিশীল থাকে? বিশ্বের ক্রমবিকাশমান সামাজিক পটভূমিকায় শিক্ষকের নির্দিষ্ট ভূমিকা ধরে রাখা খুব সহজ সাধ্য কাজ নয়। সমকালীন সমাজের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারিত হয়: ব্যক্তি-স্বাধীনতাহীন কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্থান, কাল এবং জনগণের নিরিখে শিক্ষকের কাছ থেকে চাহিদাও পাল্টে যায়। ৬নং সারণী থেকে আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি ধারণা পেতে পারি:

সারণী-৬

সময়	শিক্ষকের ভূমিকা
১. প্রাচীনকাল	পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পিতৃসুলভ, ব্যক্তিনির্ভর, ব্যক্তিনির্ভর, চিন্তামূলক, পথপ্রদর্শক, ঋষানুপাতিক।
২. মধ্যযুগ	ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, আচারগত, নিয়মানুবর্তী অধিবিদ্যা, অধীক্ষক।
৩. আধুনিক যুগ	বিশ্লেষণধর্মী, ব্যক্তিনির্ভরহীন, উপদেশমূলক, বন্ধুত্বপূর্ণ, সাহায্যকারী, পারদর্শী, বিশেষজ্ঞ।
৪. আধুনিক পরবর্তী যুগ	অনুমানক্ষম, অংশগ্রহণমূলক, সহযোগিতাপূর্ণ, আদানপ্রদানমূলক, পরমোৎকর্ষ বিশিষ্ট, ব্যক্তি প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল।

২.৭.১ শিক্ষকের ক্রমবিকাশমান ভূমিকা (Emerging Role of Teacher)

একুশ শতকের ক্রমবর্ধমান গতিময় পরিবর্তনের কথা মনে রাখলে শিক্ষক এবং শিক্ষাব্যবস্থা উভয়কেই শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নতুন পথের দিশা দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষকই হলেন নূতন পথের দিশারী। বর্তমান যুগ শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু অবশ্য পালনীয় কর্তব্য আশা করে।

(i) তৎপর ভূমিকা (Pro-active Role) :

পরিবর্তনের হাওয়া যখন আসে, একজন শিক্ষক তখন কখনই নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। এভাবে পরিবর্তনকে কোনভাবেই ঠেকিয়ে রাখা বা অন্য পথে চালিত করা যায় না। তাই এই পরিবর্তন সমাজের কোথায় এবং কেন হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তাকে বোঝার চেষ্টা করা একজন শিক্ষকের পক্ষে শ্রেয়। সামাজিক পরিবর্তনে একজন শিক্ষকের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ অনেক বেশী কাম্য। এইভাবে একজন শিক্ষক যে শুধুমাত্র সক্ষম ও কার্যক্ষম হন তাই নয় তাঁর অভিজ্ঞতাও বাড়ে এবং সামগ্রীক উন্নতিতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন।

(ii) ব্যবস্থাপকের ভূমিকা (Managerial Role) :

চিরাচরিত ভাবে একজন শিক্ষকের ভাবমূর্তি ও ভূমিকা হল একজন গুরুর। এই ভাবমূর্তি অনুযায়ীর শিক্ষককে হতে হবে একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী। তিনি হবেন এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত/ জ্ঞানী ব্যক্তি। চিরাচরিত ধারণা ছিল যারা প্রকৃত শিক্ষক তাঁরা জন্মসূত্রেই এই প্রতিভার অধিকারী অর্থাৎ তাঁরা জন্ম-শিক্ষক কিন্তু আজ এই বিশ্বাস পাল্টে গেছে। আজ বলা হয় যে গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত শিক্ষকে পরিণত হন। ভবিষ্যতে সামাজিক প্রকৃতি আজকের তুলনায় অনেক পাল্টে যাবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় সেক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাও পাল্টাতে বাধ্য। শিক্ষককে শিক্ষা এবং অনুশীলনের সম্পদ ও উপাদানগুলির যোগ্য ব্যবস্থাপক হতে হবে। আজ একজন শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা শিক্ষাদানের যোগ্যতার চেয়েও বেশী করে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে যা তা হল ছাত্রদের চাহিদা অনুযায়ী অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপন তাদের সঠিক তথ্য সরবরাহ করা, এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা প্রদর্শন। বিবিধ সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজ নানা প্রকৃতির ছাত্র সমন্বিত হয় যাদের মধ্যে বুদ্ধি ও মেধার মানও ভিন্ন। শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই ধরনের বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব ও মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের এক যোগে শিক্ষাদান করে সকলকে সন্তুষ্ট করা।

পঠন পাঠন প্রক্রিয়াটি এখন অনেকাংশে ব্যক্তি কেন্দ্রিক/ব্যক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষককে তাই সমগ্র ছাত্র সমষ্টির একটি প্রাথমিক পরিমাপ করে নিয়ে তারপর ছাত্র অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য একজন শিক্ষক

আধুনিক প্রযুক্তি যেমন কম্পিউটর, ই-মেল, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট প্রভৃতির সাহায্য নিতে পারেন।

কোন গোষ্ঠী বিশেষের শিশুদের চাহিদা সামাল দেবার জন্য একজন শিক্ষকের আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া প্রয়োজন। এটিকে শিক্ষকের স্বনিয়ন্ত্রণ বলা যেতে পারে। নিজের কাজের সবচেয়ে বেশী ফল পেতে গেলে একজন শিক্ষকের অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে নিজের সময়, ব্যক্তি এবং লভ্য উপাদানগুলিকে কত অর্থপূর্ণ এবং সুষ্ঠভাবে ব্যয় করা যায় সেটি আগে ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন এ ব্যাপারে শিক্ষককে একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

(iii) সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকা (Socio-Cultural Role) :

একটি বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির একজন প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে একজন শিক্ষকের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। একজন শিক্ষক সবসময়ই একজন সমাজ সংস্কারক। মহান শিক্ষাবিদেরা চিরকালই বড় সমাজ সংস্কারক ছিলেন। যে কোন সংস্কারের জন্যই সমাজ সব সময় অন্য কারো তুলনায় শিক্ষকদের দিকেই চেয়ে থাকে। শিক্ষকের কাছে সমাজের এই আকাঙ্ক্ষা যে একজন শিক্ষক সমাজকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মুক্ত করে অনেক বেশী বিজ্ঞানমুখী করে তোলার বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকবেন।

একজন বিকাশশীল শিক্ষকের ছাত্রের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠা প্রয়োজন, শুধু ছাত্রের কাছেই নয়, তার পরিবারের সদস্য, শিশু এবং অন্যদের কাছেও তাঁকে আদর্শ চরিত্র হতে হবে। এর জন্য একজন শিক্ষককে জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ, পণপ্রথা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, লিঙ্গভেদ, গোঁড়ামী, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা এসবের প্রতিবাদ করতে হবে। সমাজের এই কু-প্রবৃত্তি এবং কু-প্রথাগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে।

২.৮ সারাংশ : স্মরণীয় বিষয়সমূহ (Unit Summary : Things to Remember)

- আজ সময় হয়েছে, শিক্ষার এক নূতন পদক্ষেপ গ্রহণের কারণ একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মোকাবিলা করতে শেখায়।
- পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শিক্ষা এবং পঠন পাঠনের পদ্ধতিও পাল্টে যায়। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন হয় এবং একই কারণে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।
- স্থান, কাল এবং পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শিক্ষারও পরিবর্তন হয়।
- শিক্ষার মূল উপাদানগুলি হল শিক্ষক, ছাত্র, পাঠক্রম, বিদ্যায়তন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষার মান নিরুপণ ইত্যাদি।
- শিক্ষার মূল উপাদানগুলির প্রতিনিয়ত তাদের কাঠামোগত, প্রয়োগ পদ্ধতিগত এবং বিষয়গত পরিবর্তন হয়ে চলেছে।
- অন-লাইন পঠন, কম্পিউটরের সহায়তায় নির্দেশ, দূরসঞ্চারী শিক্ষা, মানবাধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি, জীবন ব্যাপী শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, পরিবার সম্বন্ধীয় শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, বিদ্যায়তন বহির্ভূত সমাজ, ব্যক্তি ভিত্তিক শিক্ষা, পরীক্ষামূলক পঠন, প্রভৃতি হল পরিবর্তনশীল শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি দিক।
- একুশ শতকের ক্রমবিকাশমান বহুমাত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় যা প্রয়োজন তা হল শিক্ষাকে হতে হবে

সার্বজনীন/আন্তর্জাতিক, ব্যক্তিনির্ভর/ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমাজ-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পেশাগত।

- শিক্ষার প্রধান চারটি স্তম্ভ (ক) সম্পাদন করার শিক্ষা, (খ) পরিণত হয়ে ওঠার শিক্ষা (গ) শিক্ষা গ্রহণের শিক্ষণীয় পদ্ধতি (ঘ) অপরের সঙ্গে একসাথে বাঁচার শিক্ষা।
- শিক্ষা একটি সম্পদ। শিক্ষা একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও শিল্পের/কলার সমন্বয়।
- শিক্ষকের ভূমিকার এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে— এক সময় যেমন শিক্ষককে ঈশ্বরের সমান জ্ঞান করা হত। শিক্ষককে আজ শিক্ষার্থীর একজন সহযোগী বলা যায়।

২.৯. অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১. শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন পদক্ষেপের প্রয়োজন কারণ—

(ক) মানুষ তাই চায়

(খ) সরকারের সম্মতি আছে

(গ) একটি প্রয়োজন এই কারণে যে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সংকটপূর্ণ অবস্থার মোকাবিলা যাতে করা যায়।

(ঘ) পুরনো ব্যবস্থা আজ আর কাজ করে না

২. শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন,— কে প্রথম আনবে?

(ক) পিতা-মাতা

(খ) শিক্ষক

(গ) ছাত্র

(ঘ) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

৩. সকলের জন্য শিক্ষা— একটি শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্তরের অন্তর্গত

(ক) রাজনৈতিক

(খ) ব্যক্তিনির্ভর

(গ) অর্থনৈতিক

(গ) সার্বজনীন

৪. আপনার মতে শিক্ষাকে কেমন করে বিজ্ঞান বলা যাবে?

৫. শিক্ষাদানের সময় যদি কোন শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডে কোন চিত্র আঁকেন তবে সেটি শিল্প না বিজ্ঞান? নাকি উভয়ই বলা যাবে?

৬. আধুনিক এবং গতানুগতিক (পূর্বতন) ছাত্রের মধ্যে মিল এবং অমিলগুলির তুলনা করুন।

৭. আপনাকে যদি দূরবর্তী কোন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয় তবে প্রথমেই কী কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনি করবেন তা লিপিবদ্ধ করুন।

৮. একুশ শতকে আমরা যত অগ্রসর হচ্ছি শিক্ষকের কাছ থেকে চাহিদাও তত পাল্টে যাচ্ছে। এই বিষয়ে শিক্ষকের পাঁচ ধরনের বিভিন্ন ভূমিকার কথা উল্লেখ করুন।

২.১০ বাড়ীর কাজ (Assignment)

.....

.....

.....

.....

২.১১ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

১.১১.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

২.১১.২. ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

২.১২ উৎস (Reference)

- Future, E. Et al; Learning to Be : The world of Education Today & Tomer 1972.

- Government of India : National Poling on Education, MHRD, Govt. of India, New Delhi 1986.
- Government of India : NPE Review Committee Report Towards and Enliglised and Humane Society, PHRD Govt. of India, New Deldhi 1992.
- Rassfli, S., and Vaideana G : The Content of Education. Strerling Publishing, New Delhi 1987.
- Shane, H.G.; Curriculum Change Towards the Twenty First Centurys, National Education Association, Washington D.C. 1917.
- Singh, K. : Education for a Global Society, "The Academic Journal of the Doon School : Vol. I, issue 5, Spring 2000, Dehradun 2000.
- Sorokin, P. A. : Reconstruction of Humanity Krans Reproduction (Fanimile), 1948.
- Toffler, A. : Future Shock, the Bodly Head, London, 1970.
- Toffler, A. (ed) ; Learning for Tommorrow, the Role of the Future in Educatin, Random House, New Yourk 1978.
- Toffler, A. : The Third Wave, Bantam Books, Torento, 1981.
- UNESCO, : World Problem in the Classroom, UNESCO, Baris k1982.

একক ৩ ❑ ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্রমপরম্পরা (Education Through The Ages In India)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

- ৩.৩.১ বৈদিক যুগ
- ৩.৩.২ বৌদ্ধ যুগ
- ৩.৩.৩ প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র
  - ৩.৩.৩.১ তক্ষশিলা
  - ৩.৩.৩.২ নালন্দা
  - ৩.৩.৩.৩ বল্লভি
  - ৩.৩.৩.৪ বিক্রমশিলা

৩.৪ ভারতে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

- ৩.৪.১ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য
- ৩.৪.২ ভারতবর্ষে ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- ৩.৪.৩ রাষ্ট্রের ভূমিকা

৩.৫ প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

- ৩.৫.১ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের দাবী সনদ্
- ৩.৫.২ ১৮৫৪ সালে উডের সনদ (Despatch)
- ৩.৫.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮২
- ৩.৫.৪ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯০৪
- ৩.৫.৫ দ্বৈত শাসনের আওতায় শিক্ষা
- ৩.৫.৬ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন/স্বনিয়ন্ত্রণ ১৯৩৫
- ৩.৫.৭ শিক্ষায় উন্নতি
- ৩.৫.৮ বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারদশকে শিক্ষার অগ্রগতি

৩.৬ স্বাধীনতা পরবর্তী বিকাশশীল ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা

- ৩.৬.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৭-৪৮)

৩.৬.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)

৩.৬.৩ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

৩.৬.৪ শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি (১৯৯২)

৩.৬.৫ শিক্ষার সামগ্রিক প্রভাব

৩.৬.৬ বিকাশশীল ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

৩.৭ এককের সারাংশ

৩.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৩.৯ বাড়ীর কাজ

৩.১০ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.১১ অন্যান্য বিষয়

৩.১২ উৎস

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

একটি রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসকে বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সময়ে অনুকূল-প্রতিকূল স্রোতের ধারা এবং তার প্রভাব সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে সেই রাষ্ট্রের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা থাকে। এরা উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত বরং বলা চলে পরস্পর সংযুক্ত। একটি রাষ্ট্রের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উত্থান ও পতনের কারণগুলি সেই রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন রাষ্ট্র রূপে পরিচিত। ভারতীয় ঐতিহ্য একথা দারুনভাবে প্রমাণ করে। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন রাষ্ট্র যার সংস্কৃতি এবং জ্ঞান অন্বেষা এত সমৃদ্ধ যা বহু রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী গর্ব করার মত। ভারতবর্ষের অত্যন্ত উচ্চস্তরের নিজস্ব সাহিত্য ভাণ্ডার আছে যা আবার প্রমাণ করে যে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি যখন প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাস করছিল ভারতবর্ষ তখনই উন্নতির সোপানে পা রেখেছিল।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস শুরু হয়েছিল ''ঋকবেদ'' রচনার সময় থেকে। ঋকবেদ যা জীবন ও দর্শন ও জীবনচর্যার কথা বলে। তাই আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় ৫০০০ বছরের পুরনো।

বিস্তৃত এবং নিয়মনিষ্ঠভাবে শিক্ষাকে অনুধাবন করলে এটিকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়:

১. বৈদিক যুগ : ৩০০ খৃষ্ট পূর্ব থেকে ৫০০ খৃঃ পূঃ

২. বৌদ্ধ যুগ : ৫০০ খৃঃ পূঃ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দে

৩. মুঘল যুগ : ১২০০ খৃঃ থেকে ১৭০০ খৃঃ

৪. বৃটিশ যুগ (স্বাধীনতা পূর্ব যুগ) : ১৮০০ খৃঃ থেকে ১৯৪৭ সাল

৫. স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ : ১৯৪৭ পরবর্তী সময়

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

আলোচিত এককটি অনুধাবন করলে শিক্ষার একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হবে। এটি পাঠককে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করবে।

- ক্রমানুসারে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির ধারা অনুধাবন।
- বিভিন্ন সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে বিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার সমৃদ্ধি।
- প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ কালের ওপর তার প্রয়োগ এবং প্রভাবকে অনুধাবন এবং উপলব্ধি করা।
- জীবন দর্শন সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণার জন্য প্রাচীন বৈদিক এবং বৌদ্ধ লিপির পাঠোদ্ধারে উৎসাহিত করা।
- প্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠগুলির পঠন পাঠন ব্যবস্থার বিশদ এবং গভীর অন্বেষণ এবং তার উপলব্ধি।
- স্থান এবং সময়ের নিরিখে শিক্ষকের ভূমিকাকে উপলব্ধি করা এবং আধুনিক কালের সাথে তার তুলনা।
- মুঘল আমলের ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করা যা এটিকে গ্রহণযোগ্য হতে সাহায্য করেছিল।
- ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকে অনুধাবন করা।
- ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিতে যে সব উপাদানের প্রভাব আছে সেগুলিকে সঠিকভাবে জানা।
- ভারতবর্ষের শিক্ষার সমস্যাগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা এবং তার প্রতিকারের উপায় বার করা।
- ভারতীয় জনগণের বহুভাষা, বহুজাতিগত যে সংমিশ্রণ আছে তাকে অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার চাহিদা পরিপূরণ করা।
- বিশ্বের প্রেক্ষিতে শিক্ষার অবদান সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা।
- বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি শিক্ষা কমিশনের শিক্ষা বিষয়ক নানা রিপোর্ট যার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতি হয়েছে তাকে সার্বজনীন করে তোলা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে যে ধরনের প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাকে উপলব্ধি করা।
- ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস অনুসন্ধানে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা।

৩.৩ প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা (Education in Ancient India)

ভারত একটি প্রাচীন দেশ। ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভারতের এই সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের সাহিত্য অতলস্পর্শী সমুদ্রের মত। "বেদ" পৃথিবীর

প্রাচীনতম সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত। তবে বেদই যে ভারতীয় উপমহাদেশের জীবনদর্শনের একমাত্র উৎস সে কথা বলা যায় না কিন্তু এটি প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান স্তম্ভ একথা অনস্বীকার্য।

বেদ শব্দটির মূল সূত্র চারটি শব্দের সমষ্টি যেমন, "বিদ সত্তাম", "বিদিরে লভ্য", "বিদ বিচারে" এবং "বিদ জ্ঞানে" সাধারণভাবে "বেদ" কথাটির অর্থ হল "কোন কিছুকে জানা"। যদিও এই অর্থটির অনেক গভীর ব্যাপ্তি আছে। জ্ঞানের অর্থ এই নয় যে কিছু সাহিত্য পড়া বা ঐ জাতীয় কিছু, জ্ঞানের আধার নয়, সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি, বিশ্বলোকের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও আধার।

বেদ চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা করেছে যথা : "ঋগ্বেদ", "যজুর্বেদ", "অথর্ববেদ", এবং "সামবেদ"। এই চারটি বিভাগ ধর্ম, বস্তুবাদ যৌথ এবং আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিগুলিকেও ব্যাখ্যা করে। উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলিতে পৌঁছনর এক একটি পথ হল — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম। অতএব বেদ শুধুমাত্র একটি দর্শনের গ্রন্থ নয় এটি একটি জীবনচর্যার গ্রন্থও বটে। বেদ যেন শিক্ষার একটি রেখচিত্র। একজন ব্যক্তি কী জানেবে আর কী জানবে না জীবন শিক্ষার সেইটিই হল আসল নির্যাস। এটি তাই জীবন চর্যার চতুরাশ্রমের কথা বলে। বেদ'এ যেন অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের পরিকল্পনা করা আছে যথা: কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, এবং জ্ঞান যোগ একজন জ্ঞানপিপাসুর কাছে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একজন শিক্ষানবীশের শিক্ষার শুরু হওয়া উচিত উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠানের দ্বারা যার মাধ্যমে সে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে এক ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের হেতু ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে তার দ্বিতীয় জীবনে প্রবেশ করল। এই অনুষ্ঠানে গুরু বা আচার্য যার উপনয়ন হল তাকে বলেন "আজ হতে তুমি ব্রহ্মচারী হলে এবং তাকে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য যে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রয়োজন— অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম কী এবং তিনিই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং চূড়ান্ত উৎস সে কথা ব্যাখ্যা করেন। আচার্য তাকে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই বিষয়গুলিকেও অনুধাবন করতে শেখান। এই ব্যবস্থায় একজন ব্রহ্মচারী নিজ গৃহত্যাগ করে গুরু গৃহে বসবাস করতে আরম্ভ করত। গুরু গৃহকে সাধারণত আশ্রম বা কুটীর বলা হত। জীবনে পার্থিব এবং বস্তুনির্ভর আনন্দ এবং সুখ ছেড়ে সে ধীরে ধীরে ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য এই অনুভবের বশবর্তী হতে থাকে। সে অনুভব যে এ পৃথিবীতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর বাকি সব মায়া।

বেদ ভীষণভাবে কর্মের ওপর জোর দেয়, কর্ম— যা নিয়তিকে নির্ধারণ করে। ভারতীয় জীবনচর্যায় কর্ম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করে। বৈদিক দর্শন অনুযায়ী কর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল মোক্ষ লাভের পথে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। এটি আরো বলে যে কর্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তি বা বস্তু সুখ নয় বরং এর প্রধান লক্ষ্য হল পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি। এই দর্শন অনুসারে শিক্ষা একজনকে নীতিনিষ্ঠ, চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক, এবং লোভহীন এক অত্যন্ত উচ্চ মার্গের মানুষের রূপান্তরিত করে। আচার্য তাঁর শিষ্যকে ধ্যানী তাপসে পরিণত করেন।

তাই এই দর্শনটি আধ্যাত্মিকতার মতবাদের উপর তৈরী যেটি আদি শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর। আদি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হ'ল সাধারণ জীবনযাপন এবং উচ্চমার্গের চিন্তা এই ধারণাটিকে আত্মার ভিতর প্রোথিত করা যথা সৌভ্রাতৃত্ববোধ, (বসুধৈব কুটুম্বকম) এবং সদা সর্বদা সর্বত্র, সৎভাবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করা।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলির উপর ভীষণভাবে জোর দেয় ও তাকে মেনে চলে যা আসলে অতি উচ্চমার্গের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্য বোধ। আদর্শ জীবনযাপনের উপায় একজন শিক্ষার্থী তার আচার্যের পাদপীঠে থেকে জেনে নেয়। সাধারণত আচার্য যে কুটিরে বাস করতেন সেগুলি নদীতীরবর্তী বা পাহাড়ের সানুদেশে কোন নির্জন জায়গায় হত জনাকীর্ণ কোলাহল মুখর পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। এই ধরনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পঠন

পাঠন, ধ্যান ও তপস্যার জন্য একেবারে আদর্শ। প্রকৃতির প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে একজন শিক্ষার্থী অমূলক চিন্তা এবং কাজকে বর্জন করতে শেখে। এমনই এক পরিবেশ একজন শিক্ষার্থীকে তার কর্তব্য, আত্মোৎসর্গ, আত্মনিয়োজন, এবং নিয়ম নিষ্ঠার প্রথম পাঠ দেয়। একজন গুরুর জীবন যাপনের ধরন তাঁর শিষ্যের কাছে আদর্শ এবং তিনি প্রকৃত অর্থেই গুরু।

৩.৩.১ বৈদিক যুগ (Vedic Era)

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ-এ একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বেদই হ'ল ভারতীয় দর্শন যা শিক্ষার আসল উৎস। একথা সর্বাংশে সত্য, তাই ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে একটি সময়কে বলা হয় "বৈদিক যুগ"। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্যগুলিকে বেদ কী সুন্দরভাবে চিহ্নিত করে— জন্ম থেকে মৃত্যু এবং সর্বোৎকৃষ্ট ঐহিক শক্তির সাথে পুনর্মিলন। অতএব বৈদিক যুগে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই লক্ষ্যে পৌঁছান। শিক্ষার অন্য উদ্দেশ্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হ'ল :

শিক্ষার উদ্দেশ্য (Aims of Education)

(i) 'বেদ' এর সুসমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ বস্তুগুলির সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করা, যেমন বৈদিক সাহিত্য, বৈদিক আচার ইত্যাদি এবং একই সঙ্গে এগুলিকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বয়ে নিয়ে যাওয়া।

(ii) বৈদিক আচার আচরণের নিয়মনিষ্ঠ পালন এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপনের মাধ্যমে বৈদিক ঐতিহ্যের ধারকে আরো সমৃদ্ধ করা।

(iii) বৈদিক জীবন দর্শন যা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার কথা বলে তাকেই জীবনের শেষ আশ্রয় করে বেঁচে থাকা।

(iv) দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আত্মিক— অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সার্বিক উন্নতিকে সুনিশ্চিত করা।

গুরুকুল : এই সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থার ছিল গুরুকুল কেন্দ্রিক। গুরুকুলগুলি ছিল শিক্ষা-কেন্দ্র। সন্ন্যাসীর কুটীর গুলিকেই বলা হত গুরুকুল. আপন গৃহ ছেড়ে শিক্ষার্থীরা আচার্যের সঙ্গে এইখানেই এক আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করত।

যে সব গুরুগৃহ বা গুরুকুল লোকালয় থেকে বহুদূরে কোন নদীতীরবর্তী অঞ্চল বা প্রত্যন্ত অরণ্যের গভীরে স্থাপন করা হত সেগুলিকে বলা হত ঋষিকুল। এখানকার প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক পরিবেশ শিক্ষার আদর্শন স্থান বলে গণ্য হ'ত। এখানে ধনী-দরিদ্রে কোন প্রভেদ থাকত না, প্রভেদ থাকত না রাজা এবং নিঃস্বর মধ্যেও। গুরুকুলগুলি রাজ্যের সাহায্য স্বরূপ আর্শীর্বাদের উপর নির্ভর করত না। তারা তাদের নিজস্ব মূলধনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

গুরুকুল যে শুধু পঠন পাঠনের এক সম্মানজনক পীঠ ছিল তাই নয় এগুলি আসলে ছিল প্রকৃত জ্ঞানের পীঠস্থান। গুরু বা আচার্যর সমাজে একটি মৌলিক স্থান ছিল। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। আচার্যগণকে যে শুধুমাত্র শিষ্যরাই শ্রদ্ধা করত তা নয়। তাঁরা ছিলেন সমগ্র সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র, এমনকী রাজন্যবর্গও তাঁদের কাছে নত মস্তকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত প্রার্থনা করতেন।

উপনয়ন অনুষ্ঠান : উপনয়ন নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরই শিক্ষার্থীর গুরুকুলে প্রবেশ ঘটত। শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষকেরও আত্মশুদ্ধি হত যাতে তিনি নতুন শিক্ষার্থীর জীবনকে আলোকিত করতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের পরই একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হত।

"উপনয়ন" শব্দটির অর্থ "কাছাকাছি আসা বা নিকটবর্তী হওয়া" শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটি বিশেষভাবে অর্থবহ কারণ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষকের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পায়। পরবর্তীকালে এই অনুষ্ঠানটি ব্রাহ্মণ সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। এই অনুষ্ঠানে গুরু তাকে মন্ত্র দিতেন। অথর্ববেদে বিভিন্ন সংস্কার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। এই অনুষ্ঠানে আচার্য তিন দিন ধরে শিক্ষার্থীকে দ্বার রুদ্ধ করে বিশেষ নজরে রাখতেন এবং পরবর্তীকালে শিক্ষার্থী কী ধরনের শিক্ষণ প্রাপ্ত হবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বৈদিক পরম্পরা এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী একজন মানুষের জীবন চারটি পর্যায়ে বিভক্ত থাকত যথা---- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

অন্তেবাসী : গুরুকুলে থাকাকালীন শিক্ষার্থীর পরিচয় "অন্তেবাসী" বা "আচার্যকুলবাসী"। গুরুকুলে প্রবেশের সময়ই একজন শিক্ষার্থী কী করবে এবং কী করবে না সেকথা আচার্য বুঝিয়ে দিতেন। এগুলি বিস্তৃতভাবে "গভীর গুঢ়/সূত্র"তে লেখা আছে। একজন শিক্ষার্থীর জীবন গুরুকুলের নিয়মশৃঙ্খলা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত।

পাঠক্রম : বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে পাঠক্রমের এক একটি অংশ প্রস্তুত হত যেমন ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তর্ক, নিরুক্তি এবং কল্প। বেদ অধ্যয়ন ছিল আবশ্যিক। উপনিষদ, সূত্র এবং সংহিতা নিয়ে পাঠক্রমের বাকি অংশটুকু প্রস্তুত করা হত। এইভাবে বেদী নির্মাণের নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর অঙ্কশাস্ত্রের জ্যামিতি এবং বীজগণিতের ধারণা হয়ে যেত।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি : প্রাচীনকালে প্রধানত দু ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রথমটি "মৌখিক" পদ্ধতি এবং অন্যটিকে বলা হত "চিন্তন" পদ্ধতি। মৌখিক পদ্ধতিতে বারে বার আবৃত্তির মাধ্যমে বৈদিক মন্ত্র, শ্লোক, কাব্যাংশ স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে প্রোথিত করে দেওয়া হত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল যে মূল মন্ত্র তার ভাব এবং উচ্চারণ গত বৈশিষ্ট্য যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অবিকৃত থেকে যেত। "চিন্তন" হ'ল আর একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি বৃদ্ধি পেত। "চিন্তন" থেকে "মনন" এর উৎপত্তি যা "চিন্তার" একটি অতি উচ্চস্তর।

এর মাধ্যমে মন্ত্রের অর্থ এবং প্রয়োগ আরো উন্নতি লাভ করত। শুধু তাই নয়, এইভাবে মন্ত্রগুলি একজনের মনে আরো বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব লাভ করত। শিক্ষার এই পদ্ধতিটি সাধারণত মেধাবী ছাত্রদের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হত।

স্ত্রী জাতির স্থান : বৈদিক যুগে শিক্ষা সামাজিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে স্ত্রী জাতির পুরুষদের সঙ্গে সমানাধিকার ছিল। এই যুগে স্ত্রী শিক্ষা তার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছিল। সে যুগে বেশ কয়েকজন যশস্বী নারী সমাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতেন। এঁরা হলেন গার্গী, লোপমুদ্রা, অপালা, ঘোষা, সীতা, বিশ্ববরা ইত্যাদি।

শিক্ষকের স্থান : বৈদিক এবং তৎপরবর্তী যুগেও শিক্ষক বা আচার্য শুধু যে তাঁর গুরুকুলে সম্মানিত ছিলেন তাই নয় বরং সমগ্র সমাজে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রত্যেকেই তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ এবং পথপ্রদর্শন আশা করত। আচার্য ছিলেন একজনের কাছে সত্যিকারের বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি আদর্শ হার্দিক সম্পর্ক বরাজ করত।

গুরু বা আচার্য ছিলেন তাঁর ছাত্রের রক্ষক এবং এর প্রতিদান স্বরূপ ছাত্র বা শিষ্যরা আচার্যকে তাদের নিজ পিতার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করত। গুরুকুলে শিক্ষা চলাকালীন শিক্ষার্থীর পূর্ণ দায়িত্ব আচার্যের উপরেই থাকত

ছাত্রদের প্রতিদিনকার নিয়ম : প্রতিটি ছাত্রকে গুরুকুলের নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং সময়ানুবর্তিতা মেনে চলতে হত। ছাত্রদের মধ্যে এইসব বিষয়ে কোন প্রভেদ টানা হত না, সকলকেই একই নিয়ম মেনে চলতে হত। কৌমার্য ব্রত পালন, দৈনিক কিছু পবিত্র নিয়মের পালন যেমন যোগ সাধনা, ধ্যান, যজ্ঞ, উপাসনা ইত্যাদি ছিল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এছাড়াও কিছু কর্মমুখী শিক্ষাও বিদ্যার্থীদের গ্রহণ করতে হত যেমন যজ্ঞ কুণ্ডের জন্য কাঠ সংগ্রহ, ভিক্ষা গ্রহণ এবং গবাদি পশুর পালন। আচার্য ও আচার্য পত্নীর দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনেও শিষ্যদেরকে সাহায্য করতে হ'ত।

শিক্ষার সময়সীমা : শিক্ষার কোন বাঁধাধরা সময়সীমা ছিল না। এটি পুরোপুরি নির্ভর করত একজন শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, শেখার আগ্রহ এবং আচার্যের উপর। আচার্য— যিনি একজন শিক্ষার্থীর উন্নতি এবং বিকাশের পরিমাপ করে তার অধ্যয়নের সময়সীমা নির্ধারণ করতেন। এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে একজন শিক্ষার্থী অনন্তকালব্যাপী আশ্রমে কাটিয়ে গেছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে শিক্ষার সময়সীমা ছিল বার বছর। শিক্ষা গ্রহণ কালে ছুটির অবকাশও ছিল একে বলা হত "অনধ্যয়"। গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে এবং কিছু বিশেষ তিথি যেমন অষ্টমী, চতুর্দশী ইত্যাদি এবং কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন তুমুল বর্ষা বা বন্যায় এই ধরনের ছুটি দেওয়ার নিয়ম ছিল।

৩.৩.২ বৌদ্ধ যুগ (Buddhist Era)

বৈদিক পরবর্তী যুগে যদিও শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব বজায় রেখেই চলছিল তবু যেন তার কিছু কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যের মান নিম্নগামী হতে শুরু করে। বৈদিক যুগে মানুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অগ্রাধিকার দিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে জাতিভেদ বা বর্ণ বৈষম্য প্রথা এমন কদর্য রূপ ধারণ করে যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এক বিভেদকামী প্রভাব পড়ে। শিক্ষাকে ছাপিয়ে যাগ যজ্ঞই গুরুকুল বা আশ্রমের প্রধান কার্যকলাপে পর্যবসিত হয়। এই সময়ে মানুষের মধ্যে হিংসার প্রবৃত্তি দারুণ ভাবে বেড়ে যায়। "কর্মকাণ্ড" এবং যজ্ঞের নামে এমন অনেক কিছু হতে দেখা যায় যা বাহুল্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই অবস্থায় সমাজের আবার নতুন করে সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঠিক এমনই এক সন্ধিক্ষণে সমাজ সংস্কারক রূপে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয় যিনি সাধারণ মানুষকে আবার নতুন করে জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য এবং জীবন বোধ সম্বন্ধে অবহিত করেন। তাঁর বাণী অতি দ্রুত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাই হল জীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বৌদ্ধ দর্শন। 'সিদ্ধার্থ' যে নামে তিনি প্রাথমিকভাবে পরিচিত ছিলেন সেই তিনি বাল্যকাল থেকেই বার্দ্ধক্য গ্রস্থ মানুষের প্রতি কাতর ছিলেন, মৃত্যু ও জরা ব্যাধিও তাঁকে সমানভাবে কাতর করে তুলত। তিনি তাঁর সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে জাগতিক দুঃখ কষ্টের থেকে মুক্তির পথের সন্ধান করেন। অবশেষে তিনি বোধি লাভ করেন।

বৌদ্ধ বিহার : বৌদ্ধিক কার্যকলাপ এক ধরনের আশ্রমের স্থাপনা করে যাকে বলা হয় "বিহার" এবং "মঠ" তাঁর শিষ্যগণ এই স্থানগুলিতে বসবাস করতেন। জাতিভেদ-লিঙ্গভেদ বিবর্জিত হয়ে এক গণতান্ত্রিক পথে এই প্রতিষ্ঠানগুলি চলত, সেখানে সবার জন্য ছিল অবারিত দ্বার। এই বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যারা বসবাস করত তাদের মধ্যে পুরুষদের বলা হত ভিক্ষু এবং নারীদের বলা হত ভিক্ষুণী। গুরুর অধীনে তাঁরা একটি সরল এবং আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করত।

এই সময় বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল এক একটি শিক্ষা কেন্দ্র। এখানে শুধুমাত্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত। বৈদিক যুগে জোর 'যাগযজ্ঞ' এবং নানা আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল বৌদ্ধ যুগে তেমন কিছু ছিল না।

প্রবজ্যা অনুষ্ঠান : এই বিহারগুলিতে সম্ভাবনাময় ছাত্র বা শিষ্যরাই প্রবেশ করতে পারত এর জন্য তাদের কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হ'ত। এই বিহারগুলিতে ভর্তি হতে গেলে একজন ছাত্রকে শিক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে শিক্ষাদানের জন্য ঐ শিক্ষকের কাছে অনুরোধ করতে হত। শিক্ষক সম্মত হলে ছাত্রকে প্রবজ্যা নামে একটি প্রাথমিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হত। বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশের জন্য প্রবজ্যা একটি স্বীকৃত অনুষ্ঠান ছিল।

"প্রবজ্যা" শব্দটির অর্থ হ'ল "বেরিয়ে পড়া"। তাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন ছাত্রকে তার পার্থিব এবং পারিবারিক সমস্ত সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে হত। বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশের ন্যূনতম বয়স ছিল আট বৎসর। প্রবজ্যা অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হলে ছাত্রটিকে তার পুরানো পোশাক এবং পুরানো জীবনযাত্রা সবকিছু পাল্টে ফেলতে হ'ত। এই

অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রটিকে মুণ্ডিত মস্তক এবং পীত বস্ত্র ধারণ করতে হত। তারপর সে আচার্যের সামনে নতজানু হয়ে বিহারে প্রবেশের অনুমতি ভিক্ষা করত। ছাত্রটিকে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতে হত :

"আমি বুদ্ধের আশ্রয় নিলাম" (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি)

"আমি ধর্মের আশ্রয় নিলাম" (ধর্মং শরণং গচ্ছামি)

"আমি নিয়মের আশ্রয় নিলাম" (সংঘং শরণং গচ্ছামি)

আশ্রমে প্রবেশের পর তার নাম হত শ্রমন। তাকে পালনের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দেওয়া হত যেমন, সত্য বচন, অহিংসার প্রচার ও সহিষ্ণুতা, আর্থিক ঐশ্বর্য ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন। যে সমস্ত বালক যক্ষা, কুষ্ঠ এবং ছোঁয়াচে রোগে ভুগছে তাদের বিহারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হত না। বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশের জন্য ছাত্রদের পিতামাতার অনুমতিরও প্রয়োজন হত।

উপসম্পদ অনুষ্ঠান : বৈদিক এবং তৎপরবর্তী যুগে শিক্ষান্তে ছাত্ররা আবার তাদের পরিবারে ফিরে গিয়ে গার্হস্থ্য জীবন শুরু করতে পারত কিন্তু বৌদ্ধ যুগের নিয়মানুযায়ী একজন শ্রমণ ১২ বছর শিক্ষা গ্রহণের পর বা তার ব্যক্তিগত ২০ বৎসর বয়স পরিপূর্ণ হলে তাকে আর একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হত এটির নাম "উপসম্পদ অনুষ্ঠান"।

এটি প্রবজ্য অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ১২ বৎসর শিক্ষান্তে একজন শ্রমন অন্য সকল সন্ন্যাসীদের সামনে নিজেকে উপস্থিত করত। এই অনুষ্ঠানে উক্ত শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসী রূপে অভিষিক্ত করা হত। এই অনুষ্ঠানটি ছিল উক্ত শিক্ষার্থীর সংসার এবং আত্মীয় পরিজন থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রতীক স্বরূপ। এখন থেকে সে বৌদ্ধ বিহারের/মঠের একজন সন্ন্যাসী যে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধধর্মে নিবেদিত প্রাণ।

পাঠক্রম : এই যুগে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মোক্ষলাভ। পাঠক্রমটি তাই প্রধানত আধ্যাত্মিকতা নির্ভর ছিল। বৌদ্ধ ধর্মবয়ে গ্রন্থ পাঠ এবং বুদ্ধের দর্শন ছিল এই পাঠক্রমের প্রধান বিষয়। ঐ সময় দুধরনের পাঠক্রম ছিল একটি সন্ন্যাসীদের জন্য অন্যটি সাধারণ মানুষের জন্য। প্রথমটির বিষয় ছিল বিনয়, ধর্ম এবং সুতন্ত। দ্বিতীয়টির বিষয়ে ছিল তন্ত্র বয়ন, মুদ্রণ, সাধারণ চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, এবং হিসাবশাস্ত্র।

শিক্ষণের পদ্ধতি : বৈদিক যুগের তুলনায় বৌদ্ধ যুগের শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিরাট কোন তফাৎ ছিল না। যদিও আত্মিক এবং ব্যক্তির বিশুদ্ধতা ও ব্যবহারের ওপর বেশী জোর দেওয়া হত। শিক্ষকের পাঠ সংক্রান্ত ভাষণ একজন শিক্ষার্থীকে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনতে হত।

এইসময় নারীশিক্ষা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বুদ্ধের জীবৎকালে তিনি নারীজাতির বৌদ্ধ মঠে প্রবেশাধিকার বিষয়ে নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর বেশ কিছু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে স্ত্রী জাতির বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ শুরু হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুণীদের উপর কঠিন নিয়ম আরোপিত হয়। ভিক্ষুণীরা কখনও একাকী কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে পারত না। সন্ন্যাসী এবং ভিক্ষুণীরা আলাদা ভাবে বসবাস করত। এই সময় বিভিন্ন বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম এই সময় পৃথিবীর নানা দেশে যেমন শ্রীলঙ্কা, চীন, আফগানিস্তান, থাইল্যান্ড, কমবোডিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার দেশবাসী দ্বারা গৃহীত হয় এবং প্রসারলাভ করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক রাজবংশ বুদ্ধের অনুসারী বা বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষিত হয়।

৩.৩.৩. প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র (Famous Centres of Learning in Ancient India)

৩.৩.৩.১ তক্ষশিলা : প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী একটি শহরের নাম ছিল তক্ষশিলা, বর্তমানে এটি পাকিস্তানের অন্তর্গত। আজও এটি তক্ষশিলা নামেই বিখ্যাত। বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরত তাঁর পুত্র "তক্ষ" এই শহরটি পত্তন করেন। একসময় গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল এই তক্ষশিলা শহর। যদিও সেই সময় তেমন কোন সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ছিল না তবু আচার্যগণ বৈদিক ধারা অনুযায়ী শিক্ষা দান করতেন। এই শিক্ষাক্রম নিকট, দূর সব জায়গায় ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। তক্ষশিলা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৬ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হলে শিক্ষার্থীরা এখানে পরবর্তী শিক্ষার জন্য আসত। প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায় যে এই সময় দুধরনের পাঠক্রম চালু ছিল একটি সাহিত্য নির্ভর এবং অন্যটি বিজ্ঞানভিত্তিক। প্রথমটির অন্তর্গত ছিল বৌদ্ধ ধর্ম নির্ভর ধর্মীয় পঠন পাঠন আর দ্বিতীয়টিতে আয়ুর্বেদ, অষ্টদশ শিল্প, সমর বিজ্ঞান, কৃষি, হিসাব শাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি। হাতে কলমে শিক্ষার ওপর বেশী জোর দেওয়া হত। ৫ম শতক থেকে এই শিক্ষণ কেন্দ্রটির অবনতি শুরু হয়। বহু বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ যেমন পানিনি, জীবক, কৌটিল্য এবং আরো অনেকে তক্ষশিলা থেকেই বিদ্যালাভ করেন।

৩.৩.৩.২ নালন্দা : বৌদ্ধ যুগে নালন্দাও একটি অত্যন্ত বিখ্যাত শিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনা থেকে ৬০ কিমি. এবং রাজগীর থেকে ১০ কিমি. দূরে অবস্থিত। নালন্দা হল ভগবান বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সোমপুত্তের জন্মস্থান। সম্রাট "অশোক" এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন।

প্রথম শতকেই নালন্দা অত্যন্ত বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচিত লাভ করে। আচার্য নাগার্জুন দেব এখানকার শিক্ষক ছিলেন। সে যুগের অনেক রাজা মহারাজা তাঁদের শিক্ষা পেয়েছিলেন এই নালন্দা থেকে। গুপ্ত বংশের রাজারা নালন্দাকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সার্বিক প্রয়াস চালান এবং সফল হন। বিদেশীরা এখানে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকাটি বিশাল আকৃতির, একটি বিশালাকৃতির ছাত্রাবাস যেখানে রন্ধনশালা থেকে দৈনন্দিন জীবনের সবরকম সুযোগ সুবিধা মজুত থাকত।

প্রায় দশ হাজার ছাত্র বিনা ব্যয়ে এখানে শিক্ষার সুযোগ পেত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হিসাবে দুশোটি গ্রামকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল এখান থেকেই বিশ্ববিদ্যলয়ের খরচ খরচা উঠত। এখানে পনেরশ জন শিক্ষক ছিলেন।

৩.৩.৩.৩ বল্লভি : বল্লভি ছিল কাথিয়াবাড় (গুজরাট) এর অন্তর্গত— এটিও একটি বিখ্যাত বৌদ্ধিক শিক্ষাকেন্দ্র। হিউ এন সাং এখানকার একশটি মঠের কথা উল্লেখ করেছেন। নালন্দার সঙ্গে বল্লভিকে তুলনা করা চলে। এখানে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানও পড়ান হ'ত।

৩.৩.৩.৪ বিক্রমশীলা : অষ্টম শতাব্দীতে এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। রাজা শরণপত্ত একটি সুবৃহৎ বিহার এখানে স্থাপন করেন। বিক্রমশীলার বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন দীপশঙ্কর। বৌদ্ধ ধর্ম, ব্যাকরণ, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে সাজানো ছিল এখানকার পাঠক্রম।

পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ এখানে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বক্তিয়ার খিলজি এই বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করেন।

অন্যান্য শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি হ'ল কাশী, উজ্জয়িনী, অমরাবতী, মিথিলা, উদান্তপুরী এবং কাঞ্চি। উল্লিখিত বিবরণ থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষার শিকড় কত গভীরে প্রোথিত ছিল। এই কারণেই এটি শত শত বৎসর যাবৎ টিকে ছিল। বহু বিদেশী পর্যটক যাঁরা ভারতে এসে এই সমস্ত স্থান দর্শন করেছেন তাঁরাও একই মত পোষণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মেগাস্থিনিস, স্ট্রাবো, হিউ এন সাঙ, মার্কোপোলো এবং ইবন বতুতা। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যে মত ও দর্শন মেনে চলত আজও তা সমান কার্যকরী।

৩.৪ ভারতে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা (Education in Medieval India)

মহম্মদ নামে এক ধর্মগুরু একটি ধর্ম প্রচার করেন আরবী ভাষায় যাকে ইসলাম বলা হয়। এই ধর্মাবলম্বীরা সারা পৃথিবীতে মুসলিম নামে বিস্তৃত ও পরিচিত। ভারতে মধ্যযুগে মুসলিমদের সফল অনুপ্রবেশের পর ভারতবর্ষও এই ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং মানিয়ে নেয়। ৭১২ খৃ. ভারতে প্রথম অনুপ্রবেশকারী/আক্রমণকারী মুসলিম হলেন মহম্মদ বিন কাশিম নামে একজন আরবীয় যদিও তিনি সিন্ধু প্রদেশের বেশী এগোতে পারেননি। এরপর প্রায় দুশ পচাত্তর বৎসর যাবৎ বাইরে থেকে কোন আক্রমণ বা অনুপ্রবেশ ভারতে হয়নি। এরপর ভারতবর্ষে মুঘলদের প্রবেশ ঘটে এবং তারা ভারতবর্ষ শাসন করতে থাকে।

মুসলিমরা, ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি ভারতের ঐশ্বর্য দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। এগার শতক এবং তার পরবর্তী সময়ে ভারতে অনবরত মুসলিম উপজাতি এবং রাজন্যবর্গের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় সমাজের এত গভীরে প্রবেশ করে যে এখানেই বসতি স্থাপন এবং বংশবিস্তার করতে থাকে যারা পরবর্তী বহু বছর ভারতকে শাসনাধীন রাখে। এদের মধ্যে দাস বংশ ১২০৬ খৃ. থেকে ১২৮৬ খৃ. পর্যন্ত, খিলজি বংশ ১২৯০ খৃ. থেকে ১৩১৬ খৃ., এরপর তুঘলক বংশ ১৩২২ খৃ. থেকে ১৩৮৯ খৃ. অবধি, পরে সৈয়দ বংশ ১৪১৪ খৃ. থেকে ১৪৫১ খৃ., তারপর লোধি বংশ ১৪৫১ খৃ. থেকে ১৫২৬ খৃ. এবং সব শেষে মুঘলরা ১৫১৬ খৃ. থেকে ১৭০৭ খৃ. অবধি রাজত্ব করে।

মুসলিমরা এদেশে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক, মকবারা ও মাদ্রাসা স্থাপন করে। স্বল্প কথায় বহিরাগত মুসলিমরা তাদের মুসলিম শিক্ষার বীজ বপন করে এবং কালক্রমে একাধিক শাসকের শাসনকালে তাদের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং মর্জির ওপর এই শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সঠিক রূপ পায়।

৩.৪.১ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient Features of Muslim Education)

১. **ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অপসারণ** : ভারতবর্ষের মুসলিমদের অনুপ্রবেশ এবং শাসন যখন শুরু হয় তখন প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা তার শীর্ষ মাত্রায় অবস্থান করছিল এবং এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণে একাধিক বিদেশীর ভারতবর্ষে আগমন ঘটেছিল। বক্তিয়ার, মহম্মদ গাজনী এবং ঔরঙ্গজীবের মত শাসকেরা এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত ক্ষতিসাধন করেন। পুরনো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সেই জায়গায় মকতাব, মাদ্রাসা ইত্যাদি গড়ে তোলেন। এইসব স্থানে পূর্বে অবস্থিত গুরুকুল, আশ্রম এবং মঠগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

২. **পারসীক কর্তৃত্ব** : রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও পালি ভারতের এই দুই প্রাচ্য ভাষাকে অপসৃত করে সেই জায়গায় বিদেশী পারসীক ভাষা স্থান করে নেয়। ক্রমে পারসীক বা ফার্সী ভাষা ভারতবর্ষের শিক্ষা এবং শাসন ব্যবস্থার ভাষা হয়ে ওঠে। ফার্সী এবং আরবী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে।

৩. **শাসকদের দয়া নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা** : ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ভাবনার অবলুপ্তি ঘটে এবং পুরোপুরি শাসকদের মর্জি নির্ভর হয়ে পড়ে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শাসকদের ইচ্ছাই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থা একজন শাসক থেকে অন্য শাসকের মতিগতির ওপর ভিত্তি করে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই দারুনভাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৪. **মসজিদে শিক্ষাদান** : ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার সাথে সাথে ধর্মীয় প্রার্থনার উদ্দেশ্যে প্রচুর সংখ্যক মসজিদ স্থাপিত হয়। কালক্রমে এই মসজিদগুলি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণের স্থানে পরিণত হয়।

৫. **শিক্ষার ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব** : ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিমূল। পবিত্র কোরাণে জীবন যাপনের যে কঠিন নিয়মাবলী বিধৃত আছে একনিষ্ঠভাবে সেই সব নিয়ম পালন হয়ে ওঠে মুসলিম শিক্ষার একটি অঙ্গ। ইসলামিক নিয়মনীতি অনুযায়ী একজনের জীবনকে বেঁধে ফেলাই ছিল এই ধরনের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩.৪.২ ভারতবর্ষের ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Organisation of Inslamic Education)

ভারতবর্ষে তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার পর মুসলিম শাসকদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রয়োজনে বল প্রয়োগের মাধ্যমে হলেও ইসলাম ধর্মের আওতায় নিয়ে আসা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপটিই ছিল ধর্ম ভিত্তিক। প্রথমযুগে মসজিদগুলিই ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ক্রমান্বয়ে মকতাবের পত্তন হয়, এগুলি মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মকতাব : এই মকতাবগুলি ছিল শিশু ও সাধারণ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র। ধনী ঘরের শিশুরা অবশ্য মকতাবে যেত না তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহাভ্যন্তরেই করা হ'ত। পবিত্র কোরানের বিভিন্ন পংক্তিগুলি এখানে পড়া হত। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তাদেরকে লিখতে, পড়তে এবং অঙ্ক কষতেও শেখান হত।

বিসমিল্লা অনুষ্ঠান : বৈদিক এবং বৌদ্ধ যুগের মত মুঘল আমলেও মকতাবে প্রবেশের জন্য একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হত। এই অনুষ্ঠানে শিশুটিকে নূতন বস্ত্র পরিয়ে মকতাবে নিয়ে আসা হত। পবিত্র কোরাণের কয়েকটি পংক্তি তাকে উচ্চারণ করতে বলা হত। যদি শিশুটি এটি না করতে পারত তার তাকে বিসমিল্লা শব্দটি উচ্চারণ করতে বলা হত এবং এই সঙ্গে শুরু হত তার শিক্ষা জীবন।

একটি শিশুর ক্ষেত্রে তার চার বৎসর, চার মাস, চারদিন বয়সকালে এই বিসমিল্লা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হত। এই অনুষ্ঠানটির কিছুদিন পর শিশুটিকে লিখতে শেখান হত। এই সময় তাঁর আত্মীয় বর্গকেও নিমন্ত্রণ করে আনা হত।

লেখা, পড়া এবং অঙ্ক কষার পাশাপাশি শিশুদেরকে ফার্সী সাহিত্য, ব্যাকরণ, পত্র লিখন এবং হিসাব শাস্ত্রও শেখান হত। রাজ পরিবারে শিশু এবং রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত হতেন। রাজ পরিবারে সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ও সাধারণের থেকে আলাদা হত যেমন, আরবী, ফার্সী সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, ব্যবহার শাস্ত্র, সমর বিজ্ঞান ইত্যাদি। একই সঙ্গে এই সব রাজ পরিবারের সন্তানদের অস্ত্রশিক্ষা দানেরও প্রচলন ছিল।

মাদ্রাসা : মকতাবগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষাটুকু দেওয়া হ'ত। তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাগুলির প্রতিষ্ঠা হয়। এগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই রাজ অনুদানে চলত, রাজপরিবার থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য জমি, জায়গা এবং অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করা হত। মাদ্রাসাগুলি সাধারণত সুপরিচালিত হত। রাজন্য বর্গের এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল কিন্তু তাঁরা কখনই এদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না।

নানান চাহিদার কথা ভেবে মাদ্রাসার পাঠক্রম সুবিস্তৃত ছিল। এগুলি ধর্মীয় বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে গঠিত হত। ধর্মীয় পাঠক্রমের আওতায় গভীরভাবে পবিত্র কোরাণ, কোরাণের দর্শন, ইসলামের ইতিহাস এবং ইসলামিক আইন ছিল অবশ্য পাঠ্য। পাঠক্রমে অন্য পর্বে ছিল আরবী ও ফার্সী সাহিত্য ও তার ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, ইউনানী চিকিৎসা। এছাড়া, কৃষি, দর্শন, আইন, জ্যোতিষশাস্ত্র, অর্থনীতি এবং হিসাবশাস্ত্র ইত্যাদি। শিক্ষার সময়কাল ছিল ১০ থেকে ১২ বৎসর। সাধারণত আরবী ভাষাই ছিল শিক্ষাদানের মাধ্যম। বড় বড় মাদ্রাসার সঙ্গে সাধারণ পাঠাগারও থাকত।

এই ধরনের শিক্ষায় স্মৃতি ধারণের ওপর বেশী জোর দেওয়া হত। ছাত্রদের পবিত্র কোরাণের পংক্তিগুলি মুখস্থ করতে হত। সাধারণত মুখে মুখেই পড়া শেখানোর ব্যবস্থা ছিল এছাড়া লেখার ব্যবহারও ছিল, কিন্তু শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তেমন ছিল না। মাদ্রাসাগুলিতে পাঠভাষণ দেওয়া হত। কিছু ক্ষেত্রে হাতে কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও

ছিল। প্রথাগত কোন পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণত মৌলবী বা মোল্লাগণ শিক্ষক নিযুক্ত হতেন এবং কোন একটি ছাত্রের শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হল না তাকে আরও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এসব তাঁরাই ঠিক করতেন। একজন ছাত্রের ক্ষমতার পরিমাপ তাঁরা নিজ পদ্ধতিতে করে নিতেন। সময়ে সময়ে জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির পরীক্ষা নেওয়া হত। কিছু জটিল সমস্যার সমাধানের ছাত্রদের মেধার পরীক্ষা দেওয়া হত।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : মুসলিম যুগে শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত সম্মানীয় ছিলেন। তাঁরা ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন। এমন কী রাজা মহারাজাও শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতেন। ছাত্ররা ছিল শিক্ষকদের বাধ্য পরিণামে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক খুব আন্তরিক ছিল সেই প্রাচীন কালের মত। যেহেতু ত্র সংখ্যা খুব বেশী ছিল না তাই শিক্ষকদের পক্ষেও প্রতিটি ছাত্রকে ভালভাবে জনা বোঝা সম্ভব হত। এর ফলে অবাধ্যতা এবং অনিয়মজনিত বহু অজানা সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যেত। একজন অবাধ্য ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ার অসীম ক্ষমতা ছিল একজন শিক্ষকের। ঠিক তেমনি আবার ভাল ছাত্ররা শিক্ষক দ্বারা পুরস্কৃতও হত।

নারী শিক্ষা : অনাবৃত অবস্থায় কোন নারীর গৃহের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তারা আপাদমস্তক নিজেদের আবৃত রাখত। "পর্দা প্রথা" মুসলিম সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। মুসলিম শাসন কালে অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং নির্দয়ভাবে এই অনুশাসন আরোপিত করা হত। অতএব স্ত্রীগণ বিশেষত বয়স্থা নারীদের মাদ্রাসায় প্রবেশাধিকার ছিল না। যদিও মকতাবে যাওয়ার অনুমতি ছিল। মুসলিম যুগে এই কারণেই তাদের নারী জাতির এক বিরাট অংশ অশিক্ষিত থেকে যেত। উচ্চ শিক্ষিতা মুসলিম নারী সেই কালে খুব বিরল ছিল। এর কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। রাজকন্যাগণ এবং বিত্তশালী পরিবারের মহিলারা গৃহে বসেই শিক্ষা পেত। সে যুগের নারী যেমন রাজিয়া সুলতান, রাজকুমারী গুল বদন (সম্রাট আকবরের কন্যা) জেবউন্নিসা, নুরজাহান এবং মুমতাজ মহল উল্লেখযোগ্য এবং এঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের ফলে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এমন নারীর সংখ্যা খুবই সামান্য ছিল।

শিল্প এবং সাহিত্যের বিকাশ : মুসলিম সাহিত্য এই সময়ে অত্যন্ত উন্নতি করে। পরবর্তী কালে মুসলিম শিল্পকলাও সাধারণ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় একই সঙ্গে শিল্পকলা, চারুকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হয়। এই বিষয়গুলিকেও শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠক্রমের আওতায় আনা হয়। মুঘল শাসকেরা শিল্পকলাকে শিক্ষার অঙ্গ করে নেন এবং শিল্পীদের দারুণভাবে উৎসাহিত করতেন।

সামরিক অনুশীলন : মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় সামরিক অনুশীলন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মুসলিম শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভারতে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলের বিস্তার এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের প্রচুর যুদ্ধ বিগ্রহে অংশ নিতে হত। যুদ্ধ/অস্ত্র শিক্ষা তাদের রাজত্বকে সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজন হ'ত। এটি আজ আর কোন গোপন কথা নয় যে ভারতবর্ষে মুসলিমরা তাদের শাসন কায়েম করেছিল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে। সশস্ত্র বাহিনীর নূতন নূতন অস্ত্র এবং সামরিক অনুশীলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিষয়টির ওপর মুসলিম শাসকেরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিল।

৩.৪.৩ রাষ্ট্রের ভূমিকা (Role of the State)

বৈদিক এবং বৌদ্ধ যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বাংশেই স্বাধীন ছিল। শিক্ষায় রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা যেমন ছিল না তেমনি কোন নিয়ন্ত্রণও ছিল না। এর ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় কারণ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। মুসলিম শাসন ছিল প্রধানত রাজকেন্দ্রিক, ফলে রাজার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর অপরিসীম নিয়ন্ত্রণ ছিল। সে কালে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি যে পুরোপুরি শাসন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল ছিল এমন অনেক উদাহরণ আছে। স্লেভ বংশের শাসক যেমন ইলতুৎমিস, রিজিয়া সুলতানা এবং বলবন এরা শিক্ষার প্রতি নিপুণ আগ্রহী ছিলেন এবং অনেকগুলি মাদ্রাসা স্থাপন করেন : একইভাবে খিলজি বংশের

পত্তনকারী জালালউদ্দিন শিক্ষার উন্নতির বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন ঠিক তেমনি তুঘলক বংশের কয়েকজন শাসকও শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের সময়কালে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত অগ্রগতি হয়। এই সময়ে প্রায় প্রতিটি শাসক শিক্ষার প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সম্রাট আকবর হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবদান রাখেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দেন। মুঘলদের শাসনকালে বহু উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এগুলি মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আগ্রা, দিল্লী, জৌনপুর, বিদার, গোলকুণ্ডা, লাহোর, শিয়ালকোট, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, লখনউ প্রভৃতি স্থানে। জৌনপুর ইসলামিক শিক্ষার একটি অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হত। এটি "সিরাজ-ই-হিন্দ" নামেও পরিচিত ছিল।

৩.৫ প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা (Education in Pre-Indipendent India)

ঔরঙ্গজীব পরবর্তী অধ্যায়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অবনমন শুরু হয়। এই সময়ে অতি দুর্বল রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম এবং অস্থিরতার ভিত্তি স্থাপন করে। এই রকম এক অবস্থার মধ্যে ইউরোপীয়গণ ভারতে প্রবেশ করে। প্রথমে ইউরোপীয়রা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভারতে বিভিন্ন কোম্পানী স্থাপন করেন। এদেশে আগত বিদেশীদের মধ্যে ব্রিটিশরা ছিল সবচেয়ে চতুর। তারা সবচেয়ে ভালভাবে ভারতবর্ষের সেই সময়কাল আভ্যন্তরীণ দুর্বল অবস্থার সুযোগ নেয় এবং অত্যন্ত সফলভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে নিজেদের জড়িত করে শুধুমাত্র ভারতের মাটিতে নিজেদের শক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে তারা একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পত্তন করে। এই রকম এক অবস্থার মধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যা বৈদিক, বৌদ্ধিক এবং মুসলিম যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানা রকম স্বেচ্ছাচারিতা এবং অনিয়মের ফলে ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে তা অবনতির প্রায় শেষ সীমায় গিয়ে ঠেকে। বৃটিশরা ভারতীয় ব্যবস্থাকে পুরোপুরি শিক্ষার দেশীয় ব্যবস্থা বলে অভিহিত করে। এই ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে বৃটিশরা বরং এটিকে নিশ্চিহ্ন করতে তাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা যথাসাধ্য করেছিল। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে রাজনৈতিক সমবেদনা অর্জন এবং খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা যাবতীয় কাজ কর্ম চালাতে থাকে। ১৭৮০ সালে মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্যে "কলকাতা মাদ্রাসা" স্থাপিত হয় অপরদিকে হিন্দুদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে "বেনারস সংস্কৃত বিদ্যালয়" ১৭৯১ সালে স্থাপিত হয়।

৩.৫.১ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের দাবী সনদ্ (The Charter of 1813)

চার্লস গ্রান্টের বিখ্যাত রচনা "অবসারভেশন" বা পর্যবেক্ষণ থেকে সে সময়কার শিক্ষার রূপরেখাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি সেই সময়কার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলে বর্ণনা করেন এবং এর পরিবর্তন এবং সংস্কারের ওপর জোর দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৮১৩ সালের দাবী সনদ ভারতে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার আগমনের পথ করে দেয়। এই বাবদ কোম্পানি এক লক্ষ টাকা ধার্য করেন সাহিত্যের উন্নতি কল্পে। এই দাবী সনদ একটি তিক্ত মতপার্থক্যের জন্ম দেয় যেটি প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিতর্ক নামে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে পরিচিত। উভয়দিকের গোঁড়া সমর্থকেরা পরস্পরের প্রতি যুযুধান হয়ে পড়ে। প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমেই সাহিত্যে উন্নতি সাধন এই ধারণাকে প্রবলভাবে সমর্থন করে। ওয়ারেন হেস্টিংস, এইচ টি প্রিন্সেপ, লর্ড মিন্টো, এইচ এইচ উইলসন ইত্যাদিরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেন। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় ব্যবস্থাকে হাস্যকর বলে অভিহিত করে। এমনকি এর সাহিত্য এবং ভাষাকেও হাস্যকর বলে মনে করে। লর্ড ম্যাকুলে যিনি এই

বিতর্কের অবসানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত তিক্ত এবং তির্যক মন্তব্য পেশ করেন। ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর উক্তি "ইউরোপের যে কোন সাধারণ পাঠাগারে একটি মাত্র তাকই সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যকে ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট"। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম, তার আচারনিষ্ঠতা ইত্যাদিকেও হাস্যকর বলে অভিহিত করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত লর্ড মেকলেএর দৃষ্টিভঙ্গিই থেকে গিয়েছিল (তাঁর বহুখ্যাত মেকলে'স মিনিট্‌সে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলা আছে)।

নিম্নগামী পরিশ্রুতন মতবাদ : এই ভাবেই এদেশে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার জমিটি প্রস্তুত হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে বৃটিশরা সাধারণ মানুষকে শিক্ষাদানের বিষয়ে উৎসাহী ছিল না, অতএব তারা শিক্ষায় "নিম্নমুখী পরিশ্রুতন" মতবাদের উপস্থাপন করে। বৃটিশরা এরূপ একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যে সবার আগে ভারতীয় উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা শিক্ষিত হবে এবং তাদের মাধ্যমে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। সাধারণ জনগণ উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকদের দেখান পথ অবলম্বন করবে এবং এইভাবে ধীরে ধীরে ওপরতলা থেকে নিচু তলার সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বে।

৩.৫.২ ১৯৫৪ সালে উডের সনদ্ (Wood's Despatch of 1854)

সেই সময়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ সমিতির সভাপতি ছিলেন চার্লস উড। ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই একটি দাখী সনদ পেশ করা হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত এই হলফনামা বা সনদের প্রধান স্থপতি ছিলেন চার্লস উড। অতঃপর এটি ১৮৫৪ সালে উডস-এর পত্র প্রেরণ নামেই পরিচিত হয়। এই পত্রপ্রেরণটি ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস একটি দিক চিহ্ন। আজও শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক কিছুর ব্যাপারে ভারতবর্ষে এর কাছে ঋণী।

উক্ত পত্র প্রেরণে যা যা বলা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত সার নীচে দেওয়া হল :

১. **শিক্ষার লক্ষ্য** : শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে একজন মানুষকে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী জ্ঞানের মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

২. **পাঠক্রম** : পাঠক্রমটি হবে এই রকম— সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, এবং একই সঙ্গে ইংরাজি, পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং আইন এই বিষয়গুলির সমন্বয়ে।

৩. **শিক্ষাদানের মাধ্যম** : শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে ইংরাজি ভাষা, যদিও এর পাশাপাশি সাধারণ জনগণের শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে ভারতীয় ভাষাগুলিকেও গণ্য করা হবে।

৪. **জন নির্দেশ দপ্তর** : প্রতিটি রাজ্যে জননির্দেশ দপ্তর এবং এর শীর্ষে সুপারিশক্রমে একজন নির্দেশক থাকবে।

৫. **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা** : কলকাতা এবং বোম্বাই দুটি শহরেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শাসন ব্যবস্থা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হবে।

৬. **শ্রেণী/পর্যায় ভিত্তিক শিক্ষা** : ঐ সনদে শ্রেণী/পর্যায় ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের মাধ্যমেই কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো প্রথম তৈরী হয়।

৭. **অনুদান ব্যবস্থা** : এই সুপারিশটি শিক্ষা ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তির উদ্যোগকে প্রেরণা জোগানই ছিল এই সুপারিশটির আসল উদ্দেশ্য। সরকারের একার পক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা সম্ভব ছিল না অতএব বেসরকারী এবং জনকল্যাণ মূলক সংস্থাগুলির এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। এর জন্যই অনুদানের প্রয়োজন ছিল। তাই সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষাদানের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৮. **শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ** : এই সুপারিশের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যায়তনের পত্তন হয়। এর আগে শিক্ষকদের অনুশীলনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই সুপারিশে আগে একথা অনুভবই করা হয়নি যে শিক্ষকদেরও সুপরিকল্পিত ভাবে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে, যাতে তাঁরা পরবর্তীকালে ছাত্রদের শিক্ষাদানের শৈলীটি অর্জন করতে পারেন।

এই সনদে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারেও সুপারিশ করা হয় এবং আরো বলা হয় যে কর্মমুখী শিক্ষা এবং ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশনাও করতে হবে।

এই সনদটি বহু শিক্ষাবিদ এবং ঐতিহাসিকের মতে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার 'Magna Carta' বা মহৎ দাবী স্বরূপ। এই প্রথম ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শাসন ব্যবস্থায় একটি পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত এবং উন্নত শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া গেল। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রচলনও এই সময় শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে স্যার ফিলিপ হার্টগ বলেন যে "উডস-এর সনদের ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত সরকারের সাধারণ নীতির সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতিও প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে ভারতের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও তার বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ফলে ভারতবর্ষেরই কল্যাণ সাধন হবে"। As a result of wood's despatch on educational policy evolued as a part of general policy of Government of India in the interest of India and to develop her intelectual resources to the for her own benifit.

ভারতীয় শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এই সনদটি নিঃসন্দেহে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলিল যেটির প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নূতন যুগের সূচনা হয়।

৩.৫.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ১৮৮২ (The Indian Education Commission 1886)

উডসের সনদ পেশ করার পর সারা দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ করে এর কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় বৃটিশ রাজের কাছে। বহু জায়গায় বৃটিশদের সাধারণ মানুষের রোষের সামনে পড়তে হয় কিন্তু প্রভূত শক্তিশালী বৃটিশ রাজ সেই বিদ্রোহকে দমন করতে সক্ষম হয়। ১৮৮২ সাল নাগাদ এমন ভাবা হয় যে সারা দেশে শিক্ষার কতটা উন্নতি হয়েছে তার পরিমাপ করা প্রয়োজন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে তাকে তাকে দূর করতে হবে এবং সেই মত ১৮৮২ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে ভারতের শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উইলিয়াম হান্টার বাদে এই কমিশনে আরো ২০ জন সদস্য ছিলেন। "এটি ১৮৮২'র হান্টার শিক্ষা কমিশন নামেও পরিচিত ছিল"। এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষায় যে সব সমস্যা আছে তার সমাধানের পথ দেখান। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুদানের উপযোগিতা কতটা তাও খতিয়ে দেখা ছিল এই কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ। মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চ শিক্ষা এই দুই স্তরের নানা বিষয় অনুধাবন করাও ছিল এই কমিশনের কাজের অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে এই কমিশন একটি ৭০০ পাতার সুবৃহৎ খতিয়ান/বিবরণী পেশ করে। শিক্ষা কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল :

১. **প্রাথমিক শিক্ষা** : এটি প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়। এটিকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বাস্তব সম্মত এবং কার্যকরী হতে হবে। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আরো মনোযোগী হতে হবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন ভার থাকবে স্থানীয় অধিবাসী দ্বারা গঠিত পরিচালন সমিতির হাতে যেমন জেলা বোর্ড, শহরাঞ্চলে পৌরপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন। এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপন করতে হবে।

২. **মাধ্যমিক শিক্ষা** : কমিশন সুপারিশ করে যে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়দের ওপর থাকবে এবং এর জন্য সরকার শুধু অনুদান মঞ্জুর করবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরাজি ভাষা। এটির পাঠক্রম দুভাগে বিভক্ত থাকবে। প্রথম ভাগে শিক্ষার সাধারণ বিষয়গুলি থাকবে এবং দ্বিতীয় ভাগের বিষয়গুলি হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়।

কমিশন আরো কিছু বিষয়ের ওপর জোর দেয় তার মধ্যে একটি হল যে সমস্ত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক স্তরের তাঁদের আরো প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাদানের মান আরো উন্নত হয়। শিক্ষা খাতে অনুদান যেন সারা দেশ জুড়ে একই মাত্রা বজায় রাখে।

উচ্চতর শিক্ষাকে আরও উন্নততর করার কথাও এই কমিশন সুপারিশ করেছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য সঙ্গতিগুলির ভারতীয়করণ, নারী শিক্ষা এবং শিক্ষার অন্যান্য দৃষ্টিকোণ গুলিকেও উন্নত করার কথা বলা হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে এই কমিশনের সুপারিশগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে এটিই সর্ব প্রথম কমিশন যারা শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলির প্রতিও এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করায়।

৩. **উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার উন্নতি** : বৃটিশরা এদেশে যখন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে চলেছে তখনও কিন্তু ভারতবর্ষে বৈদিক, বৌদ্ধ এবং মুসলিম যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু কিছু চল ছিল। ইতিপূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে তিক্ত বিরোধ, বাদানুবাদ এবং বিতর্ক চলছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তার অবসান হয়। ১৮৫৪ সালে উড-এর সনদ অনুযায়ী একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন হয় এবং এর ফলে বেশ কিছু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একমাত্র মদ্র রাজ্যে, বোম্বাই এবং বাংলা ছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন বা উন্নতি অন্য কোথাও তেমন নজরে পড়েনি বা দেখা যায়নি। এই সময় এই সমস্ত জায়গায় বেশ কিছু বিদ্যালয় শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ করে।

উড-এর সনদের সুপারিশ অনুযায়ী অনেক নতুন পদক্ষেপ বা নবপ্রচেষ্টা নেওয়া হতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাধারণ নাগরিকদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কার্যালয়ের পত্তন। অনুদান ব্যবস্থার বিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, স্থানীয় উদ্যোগে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সম্প্রসার, কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ সম্প্রসার সম্ভব হয়নি।

সেই কোম্পানীর আমল থেকেই মিশনারী'রা এদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করে আসছিলেন। তাঁরা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁদের সেবাদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মান্তরিত করণ-এর নীতি চরম সমালোচিত হয়েছিল। যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা বেশ কিছু উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

এই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাও এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এর প্রথম কারণ ছিল ১৮৫৭ সালে ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টা যা কিনা মাঝ পথেই ভেঙে দিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ ছিল ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠন। এই সময় বহু দিন যাবৎ শিক্ষা কোন অগ্রাধিকার পায়নি। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভাইসরয় হিসেবে ভারতে আসেন এবং ভারতীয় শিক্ষাকে উন্নত করার আন্তরিক এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান।

৩.৫.৪ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯০৪ (Indian Universities Act 1904)

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে প্রথমবার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাশ করান হয়। এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে বর্ণিত হল :

১. বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পঠন পাঠনের দায়িত্ব নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র

হয়ে থাকতে পারবে না।

২. সদস্যদের সংখ্যা এবং কার্যকালকে নির্দিষ্ট করা হয়।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়াদির মন্ত্রণা সভার ওপর এর মধ্যে অধ্যাপকরাও থাকবেন।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক সভার ভূমিকা এবং ক্ষমতাও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়।

এরপর বিংশ শতাব্দীর শুরু দেখল ভারতে "স্বদেশী" আন্দোলনের জাগরণ। এই আন্দোলন বহু ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার করার জন্য এদের মধ্যে "গোপালকৃষ্ণ গোখলে" ছিলেন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ভারত সরকারের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবী নিয়ে তিনি একটি বিল পেশ করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের সংস্কারের দাবী দাওয়াও জোরদার হতে থাকে কিন্তু এই সময়ে (১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় এই সব সংস্কারের গতিরুদ্ধ হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯১৭ : স্যার এম. এফ. স্যাডলার-এর সভাপতিত্বে ১৯১৭ সালে এই কমিশনকে নিয়োগ করা হয়। এটি সাদলার কমিশন নামেও পরিচিত। যদিও এই কমিশনটি নিয়োজিত হয়েছিল শুধু মাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখার জন্য কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে এটিকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও দেখতে হত। এই কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি নীচে দেওয়া হল :

১. বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা এবং স্বয়ংশাসনের অধিকার দিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করতে হবে।

২. উপাচার্য হবেন একজন বেতনভুক কর্মী।

৩. পাঠক্রমগুলিকে প্রয়োজনে পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং অনার্স বা সাম্মানিক পাঠক্রম চালু করতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে। এর জন্য ব্যবস্থাপক সভা থাকবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বোর্ড এবং শিক্ষা সমিতি থাকবে যারা বিভিন্ন পাঠক্রমের নিদান দেবেন।

এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যও সুপারিশ করে। কমিশনের মত অনুযায়ী পূর্বের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক গলদ ছিল। কমিশন সুপারিশ করে যে একমাত্র মধ্যবর্তী (intermediate) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই একজন শিক্ষার্থী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। স্নাতক স্তরের পাঠক্রম তিন বছরের হতে হবে। হাইস্কুল এবং মধ্যবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রতিটি রাজ্যে আলাদা পর্ষদ গঠন করতে হবে। শিক্ষা দপ্তরের বাইরে থেকে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

এই কমিশন অন্যান্য দিকগুলিও দেখত যেমন স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মমুখী শিক্ষা ইত্যাদি। কমিশনের এই সুপারিশগুলি শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সূচী ছিল না দেশে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই পরিচালন সূচী মেনে চলত। এই কমিশনের সুপারিশ হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য একটি সতন্ত্র সমিতি গঠন অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত ছিল।

এই কমিশনকে ভীষণভাবে সমালোচিত হতে হয়েছিল কারণ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে রূপরেখাটি এই কমিশন তৈরী করে তা ছিল ভীষণভাবে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ।

৩.৫.৫ দ্বৈতশাসনের আওতায় শিক্ষা (Education Under Diarchy)

১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে স্বাধীন ভারতের দাবী প্রভাবিত করতে থাকে। ভারতীয়দের ভাবনাকে শান্ত করতে বৃটিশ সরকার শাসিত ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসন প্রচলন করে। এই দ্বৈতশাসনের আওতায় শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু বিষয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ছিল আর কিছু বিষয় নির্বাচিত সদস্যদের অধিকারে ছিল। সংরক্ষিত বিষয়গুলি ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যেমন স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আইন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং অর্থ দপ্তর অপরদিকে অসংরক্ষিত বিষয়গুলি ছিল জন কল্যাণমূলক যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এটি প্রমাণিত হয় যে এই ধরনের পুনর্বিন্যাসের ফলে কার্যকরী কিছুই হয়নি বরং শাসনব্যবস্থাকে এইভাবে কক্ষে বিভক্ত করে শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই এক বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে যার ফলে কাজের কাজ কিছুই করা যায় নি।

হারটগ কমিটি : ১৯২৭ সালে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের ক্ষমতা ছিল ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য আর একটি কমিটি বা সমিতি গঠন করার। এই ক্ষমতা বলে সাইমন কমিশন স্যার ফিলিপ হারটগ-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে যারা শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়গুলি অনুধাবন করে। ১৯২৯ সালে এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই কমিটির সুপারিশগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয় এবং এর অবনতির জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে দায়ী করে। প্রাথমিক শিক্ষার অবনতির প্রধান কারণগুলি হল দুর্বল পাঠক্রম ও তার মান, যথেষ্ট আর্থিক সহায়তার অভাব, স্থানীয় মানুষ জনের প্রচেষ্টার অভাব ইত্যাদি। এই কমিটি এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিপর্যয়ের দুটি প্রধান কারণকে সনাক্ত করে যেগুলি আবহমান কাল ধরে চলে আসছিল একটি হ'ল অপচয় এবং দ্বিতীয়টি—স্থবিরতা। এই কমিটি অপচয় বলতে বুঝিয়েছিল যে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়া বা মাঝপথে শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া। আর স্থবিরতা বলতে বুঝিয়েছিল একটি ছাত্রকে এক এক বছরের বেশী একটি শ্রেণীতে আটকে রাখা। এই কমিটি অনুসন্ধান করে অন্য যে বিষয়গুলি পায় তা নীচে দেওয়া হল :

১. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অগ্রগতি হচ্ছিল প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

২. যানবাহন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাবে বেশীর ভাগ অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

৩. কিছু কিছু সামাজিক বিশ্বাস এবং সংস্কার প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৪. একটি মাত্র শিক্ষক নির্ভর বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দান।

৫. যথাযথ পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা এবং নজরদারির অভাব।

এই কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলে যে এটির অবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে ভাল। যদিও এর কিছু খুঁত সম্বন্ধেও কমিটি আভাসিত করে। কমিটির মতানুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। এটি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট অপচয়ও লক্ষ্য করে কারণ দেখা যায় বহু ছাত্র মাধ্যমিক স্তরে অনুত্তীর্ণ থেকে যাচ্ছে।

এটি মাধ্যমিক পাঠক্রমটিরও সমালোচনা করে। তাদের মতে যেটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীদের নিজ পায়ে দাঁড়াতে বা স্বনির্ভর হতে অসমর্থ।

এই কমিটি তাই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে যদিও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা কিছু মতামত জানায়। যদিও ছাত্র এবং বিদ্যালয় উভয়ের সংখ্যাগত বৃদ্ধিকে কমিটি প্রশংসা করে কিন্তু একই

সঙ্গে শিক্ষার মানের অবনতির সমালোচনা করে এবং এই মানকে তুলে ধরার আহ্বান জানায়।

৩.৫.৬ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন/স্বনিয়ন্ত্রণ (১৯৩৫) (Provicial Autonomy (1935)

বৃটিশ সরকারের দ্বৈতশাসন প্রথা যে ভারতীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল, ইতিমধ্যে তা বহুবার আলোচিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনাধিকার এবং তার দ্বারা অবদমন ভারতের সাধারণ মানুষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে উঠতে সাহায্য করেছিল। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং তার অনেক নেতা পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনকে সুতীব্র করে তুলেছিল। এর ফলে ১৯৩৫ সালে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে কিছু সাংবিধানিক রদবদল করে, যেটি প্রাদেশিক স্বনিয়ন্ত্রণ বলে পরিচিত এবং এর ফলে কিছু দ্বৈতশাসনগত বৈষম্য দূর হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশে কিছু নির্বাচিত সদস্য নিয়ে ঐ প্রদেশের একটি প্রতিনিধি সরকার তৈরী হয়, কিন্তু এটির কার্যকারিতা এবং গতিপ্রকৃতিও এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয় এবং পরিণামে শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

অ্যাবব্ট-উড রিপোর্ট ১৯৩৭ : তৎকালীন ভারত সরকার এই সময় দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি বৃটেন থেকে আহ্বান করে যারা দেশে কর্মমুখী শিক্ষার রূপরেখাটির প্রস্তাবনা করবে। এর আগের প্রতিটি সরকারী রিপোর্টে একথা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয় যে ভারতে কর্মমুখী শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করেনি এবং চাহিদার সাপেক্ষে কোন নতুন পথের দিশা দেখায় নি। এই কারণে সাধারণ নাগরিকও এই শিক্ষার একটি নবরূপ হোক এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ অ্যাবব্ট এবং এস. এইচ. উড এই দুই বৃটিশ বিশেষজ্ঞ ১৯৩৭ সালে তাঁদের নিয়োগের মাত্র চার মাস সময়ের মধ্যে সরকারের কাছে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। এই কমিটির মূল সুপারিশগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল :

১. কর্মমুখী শিক্ষাসূচীকে স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হতে হবে।

২. কর্মমুখী শিক্ষাকে কলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার সমতুল গণ্য করতে হবে।

৩. কর্মমুখী শিক্ষাকে অন্য শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৪. কর্মমুখী শিক্ষার জন্য আলাদা বিদ্যায়তন থাকতে হবে।

৫. কর্মমুখী শিক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করতে হবে।

৬. কর্মমুখী শিক্ষার জন্য দুস্তরের শিক্ষায়তন তৈরী করতে হবে। নিম্ন বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়। নিম্ন বিদ্যালয়গুলিতে যোগ দেওয়ার যোগ্যতামান হবে অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং এর পাঠ্যসময় হবে ৩ (তিন) বৎসরের আর উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য যোগ্যতা মান হবে দশম শ্রেণী পাশ এবং এর পাঠ্যসময় হবে ২ (দুই) বৎসরের।

৭. কর্মমুখী শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের কাছাকাছি হতে হবে।

৮. কর্মমুখী শিক্ষার শেষে সফল শিক্ষার্থীদের সংশাপত্র দিতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্জেন্ট এর রিপোর্ট : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে বৃটিশরা নিজেদের জয় সম্পর্কে তত আশাবাদী হয়ে পড়ে এই সময় তারা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধনের দিকে মনোযোগী হয়। সেই সময় তদানীন্তন বৃটিশ রাজ ভারত সরকারে নিযুক্ত শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি প্রকল্প তৈরী করতে বলে। ১৯৪৪ সালে তিনি সেই প্রকল্প জমা দেন। এই প্রকল্পটি সার্জেন্ট স রিপোর্ট নামে পরিচিত। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরকে পর্যালোচনা করে সংশোধনের পরামর্শ দেয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারমর্শ নীচে তাদের উল্লেখ করা হল :

১. ৬-১৪ বৎসর বয়সের প্রতিটি বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত থাকবে ছেলেদের বিভাগ ৬-১১ বৎসর পর্যন্ত।

২. ৩-৬ বৎসর বয়সের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে।

৩. উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা দু'ভাগে বিভক্ত থাকবে— "সাধারণ শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় এবং কর্মমুখী শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়।

৪. সাধারণত উচ্চ বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রমটি পড়ানো হবে তার বিষয়গুলি হ'ল— ভারতীয় ভাষা, মাতৃভাষা, ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি এবং সংগীত ইত্যাদি। অন্যদিকে কর্মমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ান হবে ফলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং সেই সঙ্গে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, বাস্তুশাস্ত্র, শর্ট হ্যান্ড এবং টাইপিং ইত্যাদি।

৫. বালিকা শিক্ষার্থিনীদের জন্য কমিশন আরো যে দুটি বিষয় সুপারিশ করে সেগুলি হল, চারুকলা এবং গৃহবিজ্ঞান ইত্যাদি।

৬. এই রিপোর্টে মধ্যবর্তী শ্রেণীর বিলুপ্তির কথাও বলা হয়।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধিক ছাত্র সমাগম ঠেকাতে এই রিপোর্টে পরামর্শ দেওয়া হয় যে বিদ্যালয় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মাত্র এক শতাংশ (১%) ছাত্রকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

৮. এটি বিশ্ববিদ্যালয় যোজনা কমিশন গঠনের জন্যও সুপারিশ করে।

৯. শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পরামর্শও এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

১০. চাকুরীরত ব্যক্তিদের কারীগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য অর্ধ-সময় এবং পুরো-সময় ভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়েও সুপারিশ করা হয়।

এই রিপোর্টে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারেও সুপারিশ করা হয়।

এই রিপোর্টটি হল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃটিশ সরকারের অসাফল্যের স্বীকারোক্তি। এই রিপোর্টটি আকারে হয়ত ছোট ছিল কিন্তু এই রিপোর্টে প্রতিটি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করে কিছু সুচিন্তিত এবং সুপরামর্শ দেওয়া ছিল। তদানীন্তন ভারত সরকার এই সুপারিশগুলি নীতিগতভাবে মেনে নেয় এবং এগুলিকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। কেন্দ্রে এই প্রথম একটি শিক্ষা দপ্তরের উদ্বোধন হয়। দিল্লীতে একই সময় সারা ভারত কারিগরী শিক্ষা সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৫.৭ শিক্ষায় উন্নতি (Development in Education)

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক বিরাট প্রভাব ফেলে। বহু জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি মনে করেন যে সেই সময় চালু শিক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ অচেনা, বহিরাগত, ক্ষতিকর এবং ভারতবর্ষের স্বার্থ সম্বন্ধে পুরোপুরি উদাসীন ছিল। এই ধরনের শিক্ষাকে বর্জন করার ডাক ওঠে সারা দেশে এবং এর ফলস্বরূপ বেশ কিছু স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই সময় কিছু উদ্ভাবনী প্রকল্পও শুরু হয়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা : বাধ্যতামূলক শিক্ষার ধারণাটি তৎকালীন ভারতবর্ষে তুলনামূলক ভাবে নতুন ছিল। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিষয়টিকে প্রবর্তন করেন। এই ব্যাপারে তিনি একটি বিল প্রস্তুত করেন এবং সেটি উত্থাপন করেন কিন্তু ১৮৯৭ সালে সিয়াজী রাও গায়কোয়াড় যিনি তৎকালীন করদ রাজ্য বরদার শাসক ছিলেন তাঁর রাজ্যের আমরেলি তালুকে প্রথম বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন

করেন। এটি একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। এদেশে বৃটিশ রাজত্বের শেষ কয় বছরে বৃটিশ সরকার বাধ্যতা মূলক শিক্ষাকে মেনে নেয়। সার্জেন্ট রিপোর্ট এই ধারণাগুলিকে গ্রহণ করে এবং এগুলিকে প্রয়োগ করার সুপারিশ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা : ১৯৩৫ সালে সংবিধান সংশোধনের সূচনা পর্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠন করে। এই সুযোগ কিছু নিজস্ব শিক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পের একটি ব্যবস্থা ছিল বিদ্যা মন্দির বিদ্যালয় চালু করা এগুলি শুরু হয়েছিল তৎকালীন মধ্যাঞ্চল এবং বারেরএ। এই প্রকল্পের জনক ছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত বরিশঙ্কর শুক্লা। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পটি পল্লি বা গ্রামীণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। তৎকালীন বোম্বাইতে "ঐচ্ছিক বিদ্যালয়" প্রকল্পটি চালু করা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে অতুলনীয় ছিল মহাত্মাগান্ধীর চিন্তা প্রসূত প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প "ওয়ার্ধা প্রকল্প" নামেও পরিচিত। ২২ এবং ২৩ শে অক্টোবর ১৯৩৭ সালে মহাত্মাগান্ধীর শিক্ষাব্রতীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পটিকে নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। ডঃ জাকির হুসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এই প্রকল্পের কার্যকরী দিকগুলি নির্দিষ্ট করার জন্য। দুমাসের মধ্যে এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে বর্ণিত হল :

১. হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান। এই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি শিশুকে দক্ষ এবং আত্ম প্রত্যয়ী করে তোলা যাতে সে পরবর্তী জীবনে এই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারে। এইভাবে জ্ঞান বা শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে।

২. এই প্রকল্পের অধীন শিক্ষার মাধ্যম হবে শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষা যাতে তারা পরিপূর্ণরূপে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে।

৩. এই প্রকল্পে শিশুটি হয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুটির ব্যক্তিত্বে সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং হস্তশিল্প হবে এই উন্নতি বিকাশের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম। এটি তার দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি সাধন করবে।

৪. সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত শিক্ষার সুযোগ শিশুর অত্যন্ত প্রয়োজন, এই শিক্ষাদানপ্রক্রিয়াটি এমন হবে যে শিশুটি যে ধরনের হস্তশিল্পকে বেছে নিয়েছে তার মধ্যে দিয়েই সে অন্যান্য বিষয় যেমন ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এইগুলি সম্বন্ধেও অবহিত হতে পারবে।

৫. প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকেই শিক্ষাদান চলবে। শিশুর ওপর কিছু আরোপ করা চলবে না। প্রাথমিক শিক্ষার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রয়োজন ভিত্তিতে এর পাঠক্রমের পরিবর্তনশীলতা। যাইহোক পাঠক্রমটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বলিত হতে হবে :

(ক) তন্তু প্রস্তুতি ও বয়ন, ছুতারের কাজ, পোড়ামাটির কাজ, চামড়ার কাজ, মৎস চাষ ইত্যাদি।

(খ) মাতৃভাষা, (গ) অঙ্ক, (ঘ) সমাজ বিদ্যার বিষয় যেমন, (ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি), (ঙ) চিত্রকলা এবং সঙ্গীত, (চ) শারীর শিক্ষা, খেলাধূলা ইত্যাদি এবং (ছ) সাধারণ বিজ্ঞান।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ : এই প্রকল্পটির সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছিল সেই সব শিক্ষকদের প্রতি যারা এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বুঝে এবং এটির দর্শন অনুধাবন করে এই কাজে সাগ্রহে আত্মনিবেদন করবে। তাই "ওয়ার্ধা"তে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ ছিল দু' ধরনের :

১. এক বছরের স্বল্প সময়কালীন

২. দু' বছরের দীর্ঘ সময়কালীন

কংগ্রেস সরকার শাসিত প্রতিটি প্রদেশে এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। শিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্রীয়

উপদেষ্টা মণ্ডলী তৎকালীন বোম্বাই এর মুখ্যমন্ত্রী বি.জি. খের এর নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করে যারা প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাসকরণে পরামর্শ দেবে। খের সমিতির পরামর্শগুলি CABE গ্রহণ করে। এর ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন গুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রাথমিক শিক্ষার নূতন নামকরণ করে "নয়ি তালিম" করা হয়।

৩.৫.৮ বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে শিক্ষার অগ্রগতি (Progress of Education in the First Four Decades of the 20th Century)

লর্ড কার্জনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ এবং তাঁর প্রচেষ্টার ফল ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতিতে লক্ষ্য করা যায়। তিনি শিক্ষার বস্তুগত ও মানগত দুই ধরনের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। একাধিক প্রদেশে সাধারণ মানুষের ক্রমান্বয়ে শিক্ষার চাহিদার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা হয় কিন্তু আর্থিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা এই বাধ্যতা মূলক শিক্ষা প্রকল্পটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৭ সালের শেষে দেখা যায় ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৯২,২৪৪ এবং ছাত্র সংখ্যা ১,০২,২৪,২৮৮ যা ১৯২৬ সালে ছিল যথাক্রমে ১,৮৪,৮২৯ এবং ছাত্র সংখ্যা ১,৩০,২৭,৩১৩। ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১,৯৭,৭০০।

মাধ্যমিক শিক্ষারও সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছিল। সেই সময় ভারতে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৫৩০ ছাত্র সংখ্যা ১১,০৬,৮০৩ তুলনায় ১৯০৫ সংখ্যাটি ছিল ৫১২৪ এবং ৫,৯০,১২৯। দেশ ভাগের পর ১৭৪৭ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১,৯০৭ (এর মধ্যে ১৭৩৩টি ছিল বালিকা বিদ্যালয়) ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৩,৫৩,৮৫৬ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩,৫৬,১২৫।

এই সময় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯১২ সালে মাত্র ১৫টি এমন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল এবং শিক্ষানবীশের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন।

লর্ড কার্জনের ভারতে পদার্পণের পর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত এবং স্থিতিশীল অগ্রগতি হয়। ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর পরবর্তী ৩০ (তিরিশ) বছরে আর নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। এই ব্যবধানের পর আরও কিছু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেগুলি হল মাইশোর (১৯১৪), বেনারস, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭), আলিগড় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬) এর পর যথাক্রমে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০) (অধুনা বাংলাদেশ) ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮) প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এই সময় কিছু নতুন মহাবিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে আরও কিছু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যেমন দিল্লী (১৯২২), নাগপুর (১৯২৩), আগ্রা (১৯২৭), অন্ধ্র (১৯২৬), আন্নামালাই (১৯২৯), ত্রিভাঙ্কুর (১৯৩৭), উৎকল (১৯৪৫), সাগর (১৯৪৬), রাজস্থান (১৯৪৭) প্রভৃতি বৃটিশ শাসন কালের শেষ ভাগে স্থাপিত হয়। যদিও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল— তবে সব মিলিয়ে ভারতে তৎকালীন ৪০ কোটি জন সংখ্যার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্রই ১৮টি। অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন কর্মমুখী শিক্ষা, নারী শিক্ষা, পিছিয়ে পড়া জনজাতির শিক্ষা এসব ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি কিন্তু হয়নি। সার্জেন্টের রিপোর্টে শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতিতে যে আশার কিরণ দেখা গিয়েছিল তা বেশ কিছু ভারতীয়কে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল। ভারতে বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি অবশ্যই জ্বাজ্বল্যমান কিছু ত্রুটি ছিল, যা বৃটিশরা ভাল করেই জানত, অথচ তথাপি তারা সেটাই চালিয়ে গিয়েছিল। একথা ঠিক যে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয়দের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এইটিই প্রথম ব্যবস্থা যা সাধারণ মানুষকে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার ব্যাপারে সচেতন করে তোলে উক্ত ব্যবস্থাটি অপকারের চেয়ে উপকারই বেশী করেছিল। এটি আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচিত করেছিল। এটি ভারতীয়দের মনে প্রাচীন গৌরবকে পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছিল। এটি মানুষকে জাতীয়তাবোধ, গণতান্ত্রিকক জীবন সম্বন্ধে সজাগ করে তোলে এবং সর্বোপরি ভারতের সাধারণ মানুষের মনে পরিচালন শৈলী বা দেশ চালনার সম্বন্ধে ধারণার উদ্রেক করে।

৩.৬ স্বাধীন পরবর্তী বিকাশশীল ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা (Education in Post-Independent and Emerging India)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনমুক্ত হয় এবং এর পরই যাত্রা করে "পূর্বনির্ধারিত নিয়তির পথে" ছত্রভঙ্গ, বিধ্বস্ত, দেশ বিভক্ত একটি জাতির সেই সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল সামাজিক পুনর্গঠন। শিক্ষা ছিল সামাজিক উন্নতির একটি সোপান।

৩.৬.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৭-৪৮) (The University Education Commission)

খ্যাতনামা দার্শনিক এবং পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ আমেরিকা এবং ইংলন্ড থেকে একদল শিক্ষাবিদ এবং তাঁদের সঙ্গে কিছু ভারতীয় শিক্ষাবিদকে কমিশন তাঁদের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানায়। এক বছরের মধ্যে এঁরা তাঁদের রিপোর্ট জমা দেয়।

এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যাগুলিকে খতিয়ে দেখে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষার মূল লক্ষ্য, শিক্ষার মান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নারী শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, কর্মশিক্ষা, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং আইন শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র-সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা এবং পরিচালন ব্যবস্থা ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানা বিষয়ে আশু কর্তব্য সুপারিশ করে।

গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

১. **শিক্ষার লক্ষ্য** : ভারতের অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বর্তমানের অবস্থা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

- শিক্ষার লক্ষ্য হবে দেশে এমন নাগরিক গড়ে তোলা যারা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেবে।
- দেশের সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে আরও উন্নত করা এবং তাকে ধরে রাখা।
- নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটিয়ে পুরনো কিছু ধারনা যা অগ্রগতির পথে ছিল অন্তরায় তাকে বর্জন করা।
- জ্ঞানার্জন এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।
- মন এবং আত্মাকে শিক্ষিত করে তোলা।
- নূতন এবং উদ্ভাবনী চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- নৈতিক মূল্যবোধ এবং নিয়মানুবর্তিতাকে চরিত্রের মধ্যে প্রোথিত করা।
- বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।

২. **শিক্ষা দানের মান** : বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা গ্রহণের মানকে তুলে ধরার জন্য কমিশন অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল। এটি উচ্চ শিক্ষিত, নিবেদিত প্রাণ সুশিক্ষককের জন্য সুপারিশ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে ব্রতী হবেন। কমিশন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক কর্মচারীর জন্য উচ্চ বেতনহারের পরামর্শও দেয়। এটি আরো বলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকে জনপ্রিয় করার জন্য গবেষকদের ভাতা এবং বৃত্তি দেওয়া উচিত।

৩. **পাঠক্রম :** পাঠক্রমের পুর্ণবিন্যাস হওয়া প্রয়োজন। নূতন ভারতের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্বর্তী মহাবিদ্যালয়গুলির পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত। পাঠক্রমই শেষ নয় বরং এটি একটি শিক্ষা ব্যবস্থার অবলম্বন। সাধারণ, চিন্তামূলক এবং কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে সাযুজ্য এবং যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি বন্ধন থাকতে হবে।

৪. **শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ :** এই ক্ষেত্রে কেতাবী পড়াশুনার বা পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর বেশী জোর দিতে হবে। এই সব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই সব প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবনী চিন্তা এবং গবেষণাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

৫. **বাস্তু ও কারিগরী শিক্ষা :** এইগুলির জন্য জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে হবে। বাস্তু শাস্ত্রের জন্য এই কমিশন আরো বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করে। দেশের প্রয়োজন মেটাতে এর পাঠক্রমকে বহুমুখী হতে হবে। গবেষণা ও দক্ষতার ওপর আরো বেশী জোর দিতে হবে।

৬. **স্ত্রী শিক্ষা :** স্ত্রী শিক্ষার বিষয়গুলি সাধারণ শিক্ষার বিষয়ের মতই হবে তবে দৈনন্দিন জীবনের কথা ভেবে স্ত্রী শিক্ষায় ঘর গৃহস্থালীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু বিষয় পড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থাও থাকবে। এ জন্য সুশিক্ষিতা মহিলা শিক্ষিকা সম্পন্ন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা দরকার।

৭. **ধর্মীয় শিক্ষা :** কমিশন গভীরভাবে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়েও চিন্তা করে। তাঁদের মতে সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ধর্মীয় শিক্ষা চালু হওয়া উচিত। একই সঙ্গে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও মাথায় রাখতে হবে। বিভিন্ন ধর্মকে সুরক্ষিত রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য এছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের আর কোন ভূমিকা নেই।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে :

(ক) ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের মত করে নির্দেশ দেবে।

(খ) বিভিন্ন ধর্মগুরু যেমন শঙ্করাচার্য, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ, গুরু নানক, মহাবীর প্রভৃতির আত্মজীবনী প্রথম বর্ষের ছাত্রদের পড়তে হবে। দ্বিতীয় বর্ষে সর্বধর্মের সারবস্তুগুলি পড়তে হবে এবং তৃতীয় বর্ষে দর্শনের মূল বিষয়বস্তু ও তার সমস্যা ইত্যাদি জটিল বিষয়গুলি পড়তে হবে।

৮. **গ্রামীণ শিক্ষা :** ভারতবর্ষ গ্রাম নির্ভর দেশ। অতএব গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া গ্রামাঞ্চলের জনগণের কাছে উচ্চ শিক্ষার প্রসারলাভ সম্ভব নয়। এতএব প্রয়োজন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের।

৯. **পরিচালন ব্যবস্থা :** বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ত্রুটিগুলিকে কমিশন তুলে ধরে। তারা সুপারিশ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যৎসামান্য মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরিদর্শক, আচার্য, উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়াদির মন্ত্রণাসভা, শিক্ষক মণ্ডলী ইত্যাদি নিয়োগের ব্যাপারেও পরামর্শ দেয়।

১০. **অর্থ :** কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির ওপর জোর দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থদান করে তবে তাদের আয়করে ছাড় দিতে হবে। কমিশন একজন খ্যাতনামা (দেশনেতা) রাজনীতিক, চিন্তাবিদ এবং শিক্ষককে সভাপতি হিসেবে পেয়েছিল তাই স্বাভাবিক ভাবেই কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে ঐ ব্যক্তিত্বের দর্শন এবং অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে পড়েছিল। কমিশন অত্যন্ত সঠিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় অপর্যাপ্ততা, অপচয় প্রভৃতিকে চিহ্নিত করে এবং এগুলিকে দূর করার জন্য মূল্যবান পরামর্শ দেয়। এর মধ্যে কিছু সুপারিশ সংবিধানের জন্য দেওয়া সুপারিশগুলির মত প্রায় একই ধরনের ছিল।

৩.৬.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) (Secondary Education Commission (1952-53)

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি নানা সমস্যা এবং ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে জর্জরিত ছিল যেগুলির জন্য এই শিক্ষা ক্ষেত্রটি ইতিপূর্বেও সমালোচিত হয়। একথা স্মরণে রেখে ভারত সরকার ডঃ এ. লক্ষণস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করে। শ্রী এ. এন. বসুকে এই কমিশনের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাগুলির খতিয়ে দেখে ১৯৫৩ সালের ২৯ অগাস্ট কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে।

I. ত্রুটি : এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করে :

১. এটির সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

২. এটি সংকীর্ণ একপেশে, একটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে এটি অসমর্থ।

৩. স্বাধীন চিন্তা এবং মৌলিক চিন্তাকে উন্নত করতে এটি সাহায্য করে না।

৪. পরীক্ষা ব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীর ক্ষমতার পূর্ণ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ।

৫. পাঠক্রম এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল পুঁথিগত বিদ্যা নির্ভর, যান্ত্রিক এবং শিক্ষার্থীর মনে কোন আগ্রহে জন্ম দেয় না।

৬. এক একটি শ্রেণীতে ছাত্র ও শিক্ষকের অসমানুপাতিক হার।

৭. অনুপযোগী শিক্ষাদানের মাধ্যম।

II. লক্ষ্য : এক বিশাল সংখ্যক ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্র ছিল মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি। প্রাথমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাঝে এইটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সূত্র কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটিই ছিল পুরো শিক্ষা শৃঙ্খলের মধ্যে দুর্বলতম বিন্দু। অতএব শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপর জোর দেয় যাতে এটিকে পুনর্বিন্যাস করে শক্তিশালী করে তোলা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলি নীচে বর্ণিত হল :

১. গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সামাজিক কর্তব্য এবং দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারে এমন জাতীয়তা বোধ সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা।

২. ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টিশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটনা। যাতে মাধ্যমিক শিক্ষান্তে তারা জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

৩. তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং মানবিক শক্তির উন্নতি ঘটান।

৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং নেতৃত্বদানের গুণগুলির বিকাশ ঘটান।

III. মাধ্যমিক শিক্ষার সময় সীমা : কমিশনের মত অনুযায়ী ১১-১৭ বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বটি চলবে এর মধ্যে প্রথম তিন বছর শিক্ষার্থী নিম্নবিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পরবর্তী চার বছর সে উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে পাঠ গ্রহণ করবে। মাধ্যমিক স্তরে আরও এক বছর যোগ করে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী শিক্ষার স্তরটিকে অবলুপ্ত করতে হবে। অতএব স্নাতক স্তরের পাঠক্রমটির সময়কাল হবে ৩ (তিন) বৎসর।

IV. বহুমুখী বিদ্যালয় : ছাত্রদের বহুবিধ এবং নানামুখী আগ্রহের কথা ভেবে কমিশন বহুমুখী বিদ্যালয় খোলার সুপারিশ করে। প্রতিটি জেলায় একটি করে বহুমুখী বিদ্যালয় থাকবে। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি শিক্ষা হবে

অন্যতম প্রধান বিষয়। ছাত্রীদের জন্য গৃহবিজ্ঞান বিষয়টিকে আবশ্যিক করতে হবে।

V. পাঠক্রম : ছাত্রদের আগ্রহ এবং স্বার্থের কথা ভেবে এবং জনসমাজ এবং সমকালের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কমিশন পাঠক্রমের স্বীকৃতির জন্য কিছু সুপারিশ করে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বিষয়গুলি সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ ছিল অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান, ভাষা, সমাজতত্ত্ব, শারীর শিক্ষা, অঙ্কন ইত্যাদি আর উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ছিল বহুবিধ অন্যান্য বিষয় যেমন :

১. কলা

২. বিজ্ঞান

৩. শিল্প

৪. বাণিজ্য

৫. কৃষি

৬. চারুকলা

৭. গৃহ বিজ্ঞান

VI. পাঠ্য পুস্তক : মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য কমিশন একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করে। এই কমিটি গঠিত হবে একজন উচ্চ আদালতের বিচারক, একজন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মচারী একজন উপাচার্য, একজন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দুজন শিক্ষাবিদ এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত সরকারি দপ্তরের নির্দেশক।

এই কমিশন পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে যে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয় সেগুলি হ'ল পুস্তকটির সামগ্রিক উপস্থাপনা, মুদ্রণ, ব্যবহৃত কাগজ, ছবি এবং অঙ্কিত চিত্রের মান এবং সর্বোপরি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু। কমিশনের মতানুযায়ী কোন একটি বিষয়ের জন্য নির্বাচিত পাঠ্য পুস্তককে ঘন ঘন বদলান যাবে না।

VII. শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থ : বিদ্যালয়ের শাসন ব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাপারে কমিশন বিস্তৃতভাবে সুপারিশ করে। এটি কার্যকরী ভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিষয়ে বিশেষ জোর দেয় এবং বলে যে শুধু ত্রুটিগুলিকে খুঁজে না দেখিয়ে শিক্ষকদের সঠিক পথে চলার উপায় জানাতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থার বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ হল যে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।

VIII. শিক্ষকগণ : শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন একথাও কমিশন অত্যন্ত জোর দিয়ে বলে। চাকুরী ক্ষেত্রের অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি শিক্ষকরাও যাতে পেতে পারে কমিশন সে কথাও বলে। শিক্ষকদের অবসরের বয়স হওয়া উচিত ৬০ বৎসর। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথাও এটি সুপারিশ করে। বৎসরে পাঠের দিন কোনভাবেই যেন ২০০ দিনের কম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে কমিশন অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দেয় যদিও মাধ্যমিক শিক্ষার সব সমস্যা এর ফলে হয়ত পুরোপুরি নির্মূল হওয়া সম্ভব হয়নি তবুও মাধ্যমিক শিক্ষার কল্যাণ সাধনে এটি একটি সৎপ্রচেষ্টা।

৩.৬.৩ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) (National Education Commission [1964-66]

ভারত যাতে ধীরে ধীরে পরিকল্পিত উন্নতির যুগে প্রবেশ করে, এইলক্ষ্য নিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি চালু করা

হয়। এই পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকর করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আবহমান কালধরে চলে আসা দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে পড়ে। ডঃ ডি. এস. কোঠারির সভাপতিত্বে ১৯৬৪ সালে ১৪ই জুলাই ভারত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশনে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং সমাজ সংস্কারকেরা ছিলেন। জে. পি. নায়েক ছিলেন সম্পাদক সদস্য। শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে কমিশন পর্যালোচনা করে। তাদের রিপোর্টটি তিন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। প্রথম খণ্ডের ছয়টি অধ্যায়ে শিক্ষার স্বীকৃত দানের বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এগারোটি অধ্যায়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটিতে নানা পরামর্শ আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটিতে নানা পরামর্শ আলোচিত হয়েছে। এই থেকে বোঝা যায় যে রিপোর্টটি ছিল সুবিস্তৃত এবং শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সবকটি বিষয়কে ছুয়ে লেখা।

১. **শিক্ষা এবং জাতীয় লক্ষ্য :** শিক্ষা এবং জাতীয় লক্ষ্যের বিষয়ে কমিশন স্থির নিশ্চিত হয় যে শিক্ষা আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে। জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য কমিশন কিছু কার্যসূচী ঠিক করে যেগুলি এই রকম :

- খাদ্য দ্রব্যে স্বনির্ভরতা
- অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বেকারত্বের অবসান
- সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঐক্য
- রাজনৈতিক উন্নতি

এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য কমিশন কিছু কার্যকরী উপদেশ দেয় যেমন :

- শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযুক্তি
- শিক্ষার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুগঠিত করা
- শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উন্নতি

২. **শিক্ষাব্যবস্থার গঠন :** বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মান উন্নত করতে শিক্ষা কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো এবং গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক পরামর্শ দেয় তার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে দুটি পরামর্শ আলাদা ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে :

- মাধ্যমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা
- জাতীয় স্তরে একটি মাত্র পরীক্ষা হবে। উচ্চতর শিক্ষার বিষয়ে এটি পরামর্শ দেয় যে ১২ বৎসর শিক্ষালাভের পর একজন ছাত্র উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে পারবে তার আগে অর্থাৎ ১০ বৎসর সাধারণ শিক্ষা এবং এর পর ১ বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আরো বেশী সুযোগ সুবিধার কথা সুপারিশ করে।

৩. **শিক্ষকদের অবস্থান :** সমাজে শিক্ষকদের অবস্থা এবং অবস্থান উভয় নিয়েই কমিশন অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে এবং একে উন্নত করার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়।

(i) শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন সরকারকে স্থির করতে হবে।

(ii) কেন্দ্রীয় সরকারী শিক্ষকদের সমতুল হয়ে ওঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করবে।

(iii) শিক্ষকদের সমানহারে বেতন; এটি নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(iv) যাতে করে শিক্ষিত মানুষ শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করে তাই একই শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সমান হারে শিক্ষকদেরও বেতন দিতে হবে।

কমিশন শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্যও পরামর্শ দেয়, তাদের চাকুরীতে পদোন্নতি অবসরকালীন সুবিধা এবং কার্যক্ষেত্রের উন্নতির বিষয়েও পরামর্শ দান করে। কমিশনের মতানুযায়ী এর শুরু হওয়া উচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্তর থেকে যারা সবচেয়ে বেশী দুর্দশাগ্রস্ত।

৪. **শিক্ষকদের শিক্ষা :** শিক্ষকদের শিক্ষার গুরুত্বর ওপর জোর দিতে গিয়ে শিক্ষা কমিশন কর্মশিক্ষার ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করে। কমিশনের মতানুযায়ী অনুশীলন কেন্দ্রগুলির অবস্থা খুবই খারাপ, এখানে যোগ্য শিক্ষকের অভাব, নিষ্প্রাণ পাঠক্রম যা শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে না, হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিবর্তে অতি মাত্রায় তত্ত্ব নির্ভর। এই ত্রুটিগুলি তখনই দুর করা সম্ভব যখন শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটিকে আরো উন্নত করা হবে। বিভিন্ন স্তরের শিকদের প্রশিক্ষণের সময়কালও নির্দিষ্ট করতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিরও উন্নতি ঘটাতে হবে।

৫. **নথিভুক্তি ও মানব সম্পদ :** কমিশনের মত অনুযায়ী রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মানবসম্পদ উন্নয়ন হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এর জন্য শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করা চলবে না। কমিশন লক্ষ্য করে যে ছাত্র সংখ্যার যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে তার জন্য একটি জাতীয় "নথিভুক্তি নীতি" গ্রহণ করতে হবে এবং এর ফল স্বরূপ প্রতিটি শিশুকে সাত বছরের জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনা হবে। কমিশন নথিভুক্তির নীতিটি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে চালু করার পরামর্শ দেয়।

৬. **শিক্ষায় সমানাধিকার :** যে কোন সভ্য এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটি স্বতন্ত্র নাগরিক এটি আশা করে। তাই কমিশন অত্যন্ত সঠিক কারণেই বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাংবধানিক সুযোগ রেখেছে। এটি আরো সুপারিশ করে যে দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে পুস্তক সরবরাহ করতে হবে, উজ্জ্বল ছাত্রদের জন্য ভাতা এবং সাম্মানিক বৃত্তি চালু করতে হবে। কমিশনের মতে এই ধরনের পদক্ষেপ বঞ্চিত শ্রেণীকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাহায্যের জন্যও এই কমিশন সুপারিশ করে।

৭. **পাঠক্রম :** কমিশন শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাসের ওপর জোর দেয়—

(i) **নিম্ন প্রাথমিক স্তর :** ভাষা (মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা অথবা প্রাদেশিক ভাষা), সাধারণ গণিত, পরিবেশ শিক্ষা, সৃষ্টিশীল কাজকর্ম, কাজের অভিজ্ঞতা এবং শারীর শিক্ষা।

(ii) **উচ্চ প্রাথমিক স্তর :** ভাষা (মাতৃভাষা এবং হিন্দি অথবা ইংরাজি) গণিত (অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, হাতের কাজ, সমাজসেবা, শরীর শিক্ষা, নীতি এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষা।

(iii) **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর :** ৩টি ভাষা, গণিত (অঙ্ক), বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান চারু শিল্পের অভিজ্ঞতা, শারীর শিক্ষা, নীতি শিক্ষা।

(iv) **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর :** ভাষা এবং বিভিন্ন বর্গ থেকে যে কোন তিনটি বিষয় কাজের অভিজ্ঞতা, শরীর শিক্ষা, চারু কলা এবং নীতি শিক্ষা।

এই কমিশন ত্রিভাষা অনুমোদিত বিধির সুপারিশ করে যেমন, মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রের কাজ কর্মের ভাষা এবং একটি আধুনিক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় ভাষা।

৮. **শিক্ষার পদ্ধতি** : শিক্ষাদানের পদ্ধতির কথা স্মরণে রেখে কমিশন এটিকে নমনীয় এবং প্রাঞ্জল করার সুপারিশ করে। এটি তখনই সম্ভব যখন একজন শিক্ষক এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। এইজন্য গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহ দিতে হবে। বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপাঠ্য পুস্তকের অভাবের জন্য কমিশন দুঃখ প্রকাশ করে N.C.E.R.T ধারা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনার একটি সাধারণ কার্যক্রম নেওয়া উচিত। পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য মানানসই পারিশ্রমিক দিতে হবে। কমিশন আরো সুপারিশ করে যে বিদ্যালয় সমবায়িকার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। এটি আরো বলে যে শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য বেতারে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক পরামর্শ এবং পথ নির্দেশ করা যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উপাদান একথাও কমিশন স্বীকার করে। এর প্রয়োজনে যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত পরিচালন পর্ষদ স্থাপন করার কথাও কমিশন উল্লেখ করে।

৯. **বিবর্তন** : শিক্ষা ক্ষেত্রে বিবর্তন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একথা কমিশন বিবেচনা করে এবং এই বিবর্তনকে যে উন্নততর হতে হবে সে কথাও বলে। কমিশন আরো বলে যে বর্তমান ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিপূর্ণ। কমিশন সুপারিশ করে যে এমন কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের যথাযোগ্য মূল্যায়ন হবে যেটি বর্তমান ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মৌখিক এবং অনুসন্ধান মূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। কমিশন পরামর্শ দেয় যে রেকর্ড কার্ড বজায় রাখতে হবে।

১০. **বিদ্যালয় প্রশাসন এবং পরিদর্শন** : বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং পরিদর্শন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে কমিশন একটি চতুর্মুখী কার্যক্রমের সুপারিশ করে; সেগুলি হল :

১. জনশিক্ষার জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা

২. দেশজুড়ে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কার্যক্রম

৩. পরিদর্শন

৪. পরিদর্শন এবং প্রশাসনের পৃথকীকরণ

১১. **উচ্চতর শিক্ষা : উদ্দেশ্য ও উন্নতি** : উচ্চতর শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যগুলি কী কী হওয়া উচিত এমন বহু বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করে। এই সুপারিশের অন্যান্য বিষয়গুলি হ'ল প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত মহাবিদ্যালয়গুলির উন্নতি, শিক্ষাদান এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতির উন্নতি শিক্ষাদানের মাধ্যম, ছাত্র পরিসেবা, ছাত্র সংগঠন, ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি। উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

সান্ধ্যকালীন ক্লাস বা ডাকযোগে শিক্ষা এই ধরনের আংশিক সময়ের শিক্ষার প্রচলনের কথাও কমিশন সুপারিশ করে। স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার কাজগুলি একমাত্র সেইসব বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে পারে যাদের এই ধরনের পরিকাঠামো আছে। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের কথা কমিশন সুপারিশ করে এও বলে যে স্ত্রী শিক্ষার ভাতা এবং ছাত্রবৃত্তি চালু করতে হবে। পাঠসূচী তাদের পছন্দ মত হতে হবে। অতিরিক্ত ভীড় এড়ানোর জন্য কমিশন আরো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিক্ষা নিয়ে গবেষণার কথাও কমিশন সুপারিশ করে। এবং এর জন্য উৎসাহভাতা দেওয়ার কথাও বলে। শিক্ষা বিষয়ক নানাবিধ কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান করার সুপারিশ করে এই কমিশন। আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করে যে রাজ্য সরকার যেন এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারেও কমিশন অভিমত ব্যক্ত করে, স্বীকৃত মহাবিদ্যালয়গুলি কিভাবে চলবে, অন্যান্য মহাবিদ্যালয় স্থাপন, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ইত্যাদি বিষয়েও অভিমত দেয়।

১২. কৃষিকার্যে শিক্ষা : এই কমিশন কৃষিকার্যে শিক্ষার জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনার সুপারিশ করে। এটি আরো সুপারিশ করে যে প্রতি রাজ্যে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কৃষি মহাবিদ্যালিয় ও পলিটেকনিক বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। কৃষি বিষয়ক তথ্য যোগানের জন্য আরো বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করে এই কমিশন।

এছাড়া অন্য যে সব বিষয়গুলি কমিশন খতিয়ে দেখে সেগুলি হল প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা, বাস্তু শাস্ত্র, কর্মশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা এবং বয়স্ক শিক্ষা। কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন এবং আর্থিক অবস্থার বিষয়েও সুপারিশ করে। ভারতবর্ষের মত একটি দেশে যে শিক্ষা বিষয়ে পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন সে কথাও বিশেষ জোরের সঙ্গে কমিশনের সুপারিশে বলা হয়। কমিশন বলে এ বিষয়ে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে যেহেতু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের প্রচুর অবদান আছে। কমিশন শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করে এবং বলে যে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রগুলির উন্নতিকল্পে এগিয়ে আসা। সরকারের উচিত কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়ে আরো পরিকল্পনা এবং সুপারিশ গ্রহণ করা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা ভেবে কমিশন আর্থিক ব্যবস্থাকে বর্তমানের তুলনায় সাড়ে চারগুণ বৃদ্ধি করতে বলে যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক চাহিদার পূরণ হয়। অন্যান্য উৎস থেকেও শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনের কথাও কমিশন সুপারিশ করে। কমিশন কিছু বিশেষ নিয়মনীতির ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দের কথা বলে যাতে পুঁজি বা সঞ্চিত অর্থের অপচয় এবং অপব্যবহার না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

অল্প কথায় বলা যায় যে কমিশন যে উপরোক্ত সুপারিশগুলি করে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারত সরকারের পূর্বতন শিক্ষা মন্ত্রী বিচারপতি এম. চাগলা একে এভাবে বর্ণনা করেন যে এটি শিক্ষার মহৎ দাবী, বিশেষভাবে শিক্ষকদের জন্য কারণ এটিকে শিক্ষকদের অবস্থা এবং অবস্থানের উন্নতির জন্য একাধিক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই কমিশন আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ওপরও জোর দিতে বলে। কিন্তু এটি অত্যন্ত দুঃখের কথা যে কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি গ্রাহ্যই করেননি।

এর কারণ হতে পারে যে এই কমিশনের বেশীরভাগ সদস্যই বিদেশী হওয়ার দরুণ ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তাঁরা ভালভাবে অনুভবই করতে পারেন নি এবং হয়ত সেই কারণে এই কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশকে মনে হয়ে ভীষণ রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

৩.৬.৪ শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি ১৯৮৬ (১৯৯২)

এই সময় দেশ একই সঙ্গে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং শিক্ষার দ্রুত বিস্তার এই দুই অবস্থার সম্মুখীন হয়। দেশে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার সমস্যা সারা দেশের শান্ত জলাশয়ের মত রূপটিকে প্রবল ভাবে জর্জরিত এবং আন্দোলিত করে দেয়। শিক্ষা এই ত্রুটিগুলিকে দূর করতে কোন ভাবেই সাহায্য করতে পারছিল না। এছাড়া সারা বিশ্বে শিক্ষার যে পটপরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল আমাদের দেশ তার চেয়েও অনেক পিছিয়ে ছিল। সমগ্র বিশ্ব ততদিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কম্পিউটর বিপ্লবের মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে বা কব্জায় চলে আসে। এই সময় ভারতবর্ষ শ্রী রাজীব গান্ধীর মত একজন নেতাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে লাভ করে তিনি বয়সে তরুণ, গতিময়তায় বিশ্বাসী এবং একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ১৯৮৬ সালের বাজেট অধিবেশনে ভারতীয় সংসদ শিক্ষার বিষয়ে একটি জাতীয় নীতি গ্রহণ করে। ১২টি খণ্ড সম্বলিত ঐ নথিতে শিক্ষার বিষয়ে সমস্ত কিছু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা ও লিপিবদ্ধ করা আছে। বিভিন্ন কারণে এটি অত্যন্ত উদ্ভাবনী চিন্তা প্রসূত এবং নূতন পথের দিশারী। শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি কিছু মূলগত পরিবর্তনের সুপারিশ করে।

এন.পি.ই.'র আদলে শিক্ষার প্রকৃত নির্যাস এবং ভূমিকা সম্বন্ধে বলা হ'ল :

(i) "সকলের জন্য শিক্ষা" হবে আমাদের জাতীয় প্রেক্ষাপট। এটি মৌলিক থেকে বস্তুনির্ভর এবং আত্মিক উন্নতি এই সব কয়টি দিক দেখবে।

(ii) শিক্ষা বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানব সমাজের উন্নয়ন ঘটায়।

(iii) শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যা সংবেদনশীলতা এবং ধ্যানধারণাকে আরও সূক্ষ্মরূপে পরিচিত করে।

(iv) শিক্ষা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি অনন্য বিনিয়োগ।

১. **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা** : এই ব্যবস্থায় জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, অঞ্চল নির্বিশেষে প্রতিটি ছাত্রকে একটি ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত হতে হবে। এটি সারা দেশ ব্যাপী ১০ + ২ + ৩ বৎসর রূপে শিক্ষার একটি কাঠামো প্রস্তুত করে এর মধ্যে (পাঁচ বৎসর সাধারণ শিক্ষা, পাঁচ বৎসর নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা, দু' বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং তিন বৎসর স্নাতক স্তরের শিক্ষা) একটি জাতীয় পাঠক্রম পরিকাঠামোর উপর ভিত্তি করে এন. এস. ই. (National System of Education) তৈরী হবে যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে কিছু সাধারণ মূল বিষয়ও থাকবে। সাধারণ উচ্চতর শিক্ষায় এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তঃআঞ্চলিক যাতায়াত এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ একটি ছাত্র উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য দেশের যে কোন অঞ্চলে গিয়ে যেন সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা এবং গৃহিনীদের শিক্ষাদানের বিষয়টিকেও সার্বজনীন করতে হবে। এছাড়া কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের শিক্ষার দিকেও নজর দিতে হবে। দূরশিক্ষাকে উৎসাহ দিতে হবে। প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো সুগঠিত, জোরদার করতে হবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও বেশী সহযোগিতা পূর্ণ হতে হবে।

N.P.E. স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে সমস্ত রকম বৈষম্য দূর করে একে আরও উন্নত করার বিশদ পরিকল্পনা করে। তফশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সমাজে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া অংশ এবং প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে।

২. **বয়স্ক শিক্ষা** : বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব অনুভব করে N.P.E. এই বিষয়টির ওপর জোর দেয় যাতে ভারতীয় জনগণের মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক অশিক্ষিত কেউ না থাকে। গোটা সমাজের পূর্ণ সহযোগিতায় সারাদেশে N.P.E.গণ শিক্ষা করণের বিষয় প্রচারাভিযান চালাতে শুরু করে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এক বিশাল কর্মসূচী নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে বেতার, দূরদর্শন এবং চলচ্চিত্র এবং এর সঙ্গে দূরসঞ্চারী শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদিকে যথা সম্ভব জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. **শিশু শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস** : যথাসম্ভব প্রাথমিক অবস্থায় শিশু পরিচর্যা এবং শিশু শিক্ষার কার্যক্রমটিকে N.P.E. বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এটি হবে পুরোপুরি শিশু ভিত্তিক এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব যাতে বজায় থাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় জোয়ার আসবে। এটি প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেয় :

(i) ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর শিক্ষা এবং তাদের নথিভুক্তি।

(ii) শিক্ষার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি। এটির উদ্দেশ্য হবে পুরোপুরি শিশুকেন্দ্রীক। প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো সুদৃঢ় এবং আকর্ষণীয় করা, আরো শক্তিশালী এবং সুফলদায়ী করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা যেমন দুটি বৃহৎ শ্রেণীকক্ষ, খেলনা, ব্ল্যাক বোর্ড, মানচিত্র, রেখচিত্র, শিক্ষার আনুসঙ্গিক দ্রব্য ইত্যাদি দেওয়া হবে এবং সঙ্গে থাকবেন একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষিকা।

৪. **অপ্রচলিত শিক্ষা :** কর্মরত বালক বালিকা এবং বিদ্যালয় অনুত্তীর্ণদের জন্য N.P.E. একটি বৃহৎ কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে শক্তিশালী করা হবে।

৫. **মাধ্যমিক শিক্ষা :** মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করে N.P.E. শিক্ষাকে কর্মমুখী হওয়ার প্রস্তাব দেয় যাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল্যবান মানব সম্পদ জোগান দেওয়া যায়।

৬. **কর্মমুখীনতা :** প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে সুপরিকল্পিত এবং প্রয়োগক্ষম কর্মমুখী শিক্ষার কার্যক্রম যে গুরুত্বপূর্ণ হবে N.P.E. সেকথা বুঝতে পারে। এদের মত অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কথা মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী কর্মমুখী শিক্ষাকে শিক্ষার একটি ভিন্ন ধারা হিসেবে রাখতে হবে। এই শিক্ষার দায়িত্ব সরকার এবং যাঁরা চাকুরীতে বহাল করবেন সেই কর্মসংস্থান কর্তৃক উভয়কেই নিতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতক সুযোগ পাবেন নিজেকে পেশাদার হিসেবে গড়ে তুলতে। এমন একটি প্রস্তাব ছিল যে ১৯৯৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমের মোট ছাত্র সংখ্যার ২৫% যেন কর্মমুখী শিক্ষার আওতায় আসে।

৭. **উচ্চতর শিক্ষা :** জ্ঞানের অচিন্তনীয় এবং অভূতপূর্ব বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে N.P.E. সুপারিশ করে যে এটিকে পূর্বের চেয়ে আরো বেশী গতিময় হতে হবে এবং ক্রমাগত নূতন নূতন এলাকায় প্রবেশ করতে হবে। সারা দেশে বিরাট সংখ্যক মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা স্মরণে রেখে N.P.E. প্রস্তাব দেয় যে শিক্ষার আরো বেশী সুযোগ সুবিধা বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত মহাবিদ্যালয়গুলিকে স্বয়ংশাসিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা যাতে অর্জন করা যায় সেই মত পাঠক্রমকে প্রয়োজনে নতুনভাবে সাজাতে হবে। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত কঠোরভাবে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে আসন পূরণ করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাকে বিশেষ ভাবে সহায়তা, বা সাহায্য করা হবে।

৮. **মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং দূরসঞ্চারী শিক্ষা :** মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং দূরসঞ্চারী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যতে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধাগুলি বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে;

৯. **পেশার থেকে ডিগ্রিকে ছিন্নকরণ :** N.P.E. এই অভিমত দেয় যে আধুনিক প্রযুক্তিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনই এমন জায়গা দেওয়া হবে না যাতে নূতন প্রজন্ম ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি থেকে ছিন্নমূল হয়ে যায়। তাই পাঠক্রম এবং শিক্ষা দানের পদ্ধতি সবসময়ই সংস্কৃতির বিষয় দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হয়ে থাকবে। শিশুরা নিজেরাই ঐক্য, সৌন্দর্যবোধ-এর প্রতি সংবেদনশীল হবে।

১১. **মূল্য বোধের শিক্ষা :** চারিদিকে নানান প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখে N.P.E. সুপারিশ করে যে সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনে পাঠক্রমকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

N.P.E. কাজের অভিজ্ঞতা, পরিবেশগত সমস্যার বিষয়ে সচেতনা, গণিত শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং শারীর শিক্ষা প্রভৃতিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয়। এবং এই ক্ষেত্রগুলিকে জোরদার করার কথাও বলে।

১২. **পরীক্ষা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস :** এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় যে পরীক্ষা পদ্ধতিকে নতুন করে সাজাতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন সঠিক পদ্ধতিতে হয়। যে পদ্ধতিতে অতিরিক্ত বিষয় বাদ দেওয়া যায় এবং যে পদ্ধতি মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেয় না।

১৩. **শিক্ষক :** শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রের অবস্থাকে উন্নত করার কথা N.P.E. প্রস্তাব করে। এটি শিক্ষকদের আরো বেশী শিক্ষিত হওয়ার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে।

এটি শিক্ষকদের অনুশীলনের জন্য জেলা অনুশীলন কেন্দ্রের প্রস্তাবও দেয়। সব শেষে N.P.E. বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করে।

৩.৬.৫ শিক্ষার সামগ্রিক প্রভাব

১৯৮৬ সালে শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতি গ্রহণ করার পর মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক N.P.E.-কে কার্যকরী করার ব্যাপারে একটি কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসে এই কর্মসূচীটি গ্রহণ করা হয় সংসদে বর্ষাকালীন অধিবেশন চলার সময়। এই কর্মসূচীর স্বপক্ষে কিছু বিস্তৃত কার্যপদ্ধতির নথি পেশ করা হয় যেটি সঠিক ভাবে মেনে চললে N.P.E. সুপারিশগুলি কার্যকর হবে। এটি প্রয়োগের ফলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি যে হয়েছিল সেগুলি নীচে বিশদে আলোচনা করা হল।

১. **প্রাথমিক শিক্ষা :** একেবারে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যেএকটি উচ্চাকাঙ্খী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই কার্যসূচীর পোষাকী নাম 'অপারেশন ব্লাক বোড' (OBB) সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে এটি সুগঠিত করবে। OBB একটি অত্যন্ত সফল কার্যসূচী যার মাধ্যমে অনেক সুযোগ সুবিধা প্রাথমিক স্তরে পৌঁছবে। এর মধ্যে আছে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যায়তনগুলির মেরামতি এবং প্রয়োজনে পুনর্নির্মাণ। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে শিক্ষক এবং একজন শিক্ষিকা নিয়োগকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত, খেলাধুলা এবং বিনোদন সংক্রান্ত বেশ কিছু জিনিস পত্র বিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হয়েছে।

২. **মাধ্যমিক শিক্ষা :** (i) গ্রামাঞ্চলে সাধারণ বিদ্যালয়ের আদলে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে যাতে গ্রামের ছাত্ররা সুশিক্ষা পেতে পারে। (ii) মাধ্যমিক শিক্ষাকে কর্মমুখী করে তোলা : সারা দেশে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে +২ স্তরে কর্মমুখী শিক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক কর্মচারীরা আলাদা। এক একটি বাণিজ্য বা শিল্পকেন্দ্রের ওপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন গ্রন্থাগার, হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩. **উচ্চতর শিক্ষা :** এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো সুগঠিত করা হয়েছে স্বশাসিত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, দূর সঞ্চারী শিক্ষা ব্যবস্থায় আরো সুযোগ সুবিধা আনা হয়েছে। **নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।**

৪. **শিক্ষণ :** বিদ্যালয় শিক্ষার কথা ভেবে শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিকে সুগঠিত করা হয়েছে, শিক্ষণ বা অনুশীলনের বিষয় বস্তুর পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যসূচী যেটি নেওয়া হয়েছে তা হল নিম্ন মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যাতে চাকুরীরত অবস্থায় সারা বছর ধরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য প্রতিটি জেলায় DIETS স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য নুতন বিষয় স্পষ্টভাবে জানার কার্যসূচীর ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫. **শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচী :** NPE পরবর্তী যুগে অশিক্ষা দূরীকরণ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গুলির লক্ষ্যই হল জনসাধারণকে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব তত বেশী শিক্ষিত করে তোলা। সংক্ষেপে বলা যায় যে NPE তাদের কর্মসূচী অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এদেশে সম্পাদন করে আসছে এবং এর ফলে শিশু পরিচর্যা, গণশিক্ষা ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। UEENE (Universal Elementary Education-Non Formal Education) পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, স্ত্রী শিক্ষা, প্রযুক্তি শিক্ষা, কর্মশিক্ষা ইত্যাদি এর অঙ্গ।

৩.৬.৬ বিকাশশীল ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

তথ্য প্রযুক্তির জগতে ভারত এক অতি শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। আমাদের দেশ পরমাণু শক্তিতেও প্রথম সারির রাষ্ট্র এ কথা আজ সারাবিশ্ব মেনে নিয়েছে। মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা এবং প্রযুক্তিতে ভারত আজ এই

ক্ষেত্রে সফল কয়েকটি দেশের সঙ্গে তুলনীয়, শিল্পক্ষেত্রেও আমাদের দেশ আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। ভারতীয় ছাত্র, প্রযুক্তিবিদ, বাস্তুকার, চিকিৎসক ইত্যাদি খুবই উজ্জ্বল এবং এদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু ভারতীয় সমাজে এখনও বহু ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং বিতর্কের জায়গা থেকে গেছে। এগুলিকে দূর করার জন্য অতীতে বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ কোন লাভ হয়নি। তাই বিকাশশীল ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত একথা বলা খুব শক্ত। এতদসত্ত্বেও সুদূর ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা কেমন হতে পারে তার একটি অনুমান বা ছবি এখন থেকেই পাওয়া যায়।

গণশিক্ষা : গত শতাব্দীর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। দেশ ভাগের আগে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি এর পর স্বাধীন ভারতবর্ষের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ কোটিতে। ১৯৫১ সাল থেকে ভারতের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে এবং ৫১ কোটিতে গিয়ে পৌঁছয়। ৬০ বৎসর পর ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটিকে অতিক্রম করতে চলেছে। এই অবস্থাটি অত্যন্ত ভয়াবহ। এই জনসংখ্যার ব্যাপক হারে বৃদ্ধির পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে যেমন শারীরিক সুস্থতা, পুষ্টিকর খাদ্যের আরো উন্নতি, মহামারী দূরীকরণ, সাধারণভাবে মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভ ইত্যাদি। কিন্তু এই জন বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশ এবং উন্নতির ক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব পড়েছে, অর্থনৈতিক উন্নতি ভীষণভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

গত ছয় দশক ধরে ভারত নানাভাবে চেষ্টা করেছে এই জনবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে কখনও বা বল প্রয়োগের দ্বারা আবার কখনও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সন্তোষজনক বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নি। নানা কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে মানুষের সচেতনতাকে জাগিয়ে তুলতে শিক্ষার একট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এতদিন জনশিক্ষা বলতে কেমন করে জনবৃদ্ধি হয়, শিশু পরিচর্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, ছোট পরিবারের সুবিধা, পরিবার পরিকল্পনা এসবই বোঝাত। আজ সময় এসেছে জন শিক্ষায় নূতন কোন পদক্ষেপ গ্রহণের। জন শিক্ষাকে আজ তাই এদেশের প্রতিটি ঘরে প্রত্যেক গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এক বিশাল কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এর প্রয়োজনে বর্তমান পাঠক্রম, পাঠদানের পদ্ধতি, সময়সূচী ইত্যাদিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

পরিবেশ শিক্ষা : এটি একটি আত্মবিরোধী মন্তব্যের মত শোনায় যে ভারতের মত একটি দেশ যার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত উন্নত আজ সেই দেশই পরিবেশ দূষণের যন্ত্রণায় কাতর। আগামী দিন (ভবিষ্যৎ কাল) গবেষণা করে জানবে আরো কোথায় কোথায় অতীতে পর্বত ছিল কতগুলি নদী ছিল এবং কতরকমের গাছপালা ছিল। আমরা আজ এই দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি তার কারণ পরিকল্পনাবিহীন জনবসতি স্থাপন এবং শিল্প স্থাপনের জন্য। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্প স্থাপনের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তা এমনভাবে করা হয়েছে যে মানুষের আজ প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, সাধারণ মানুষের জীবন যে আজ বিপন্ন প্রায় তা সহজেই বলা যায়। একটু দার্শনিক ভাবে বলা যায় যে উন্নতিশীল ভারতবর্ষ আগামী কয়েক দশকে বহুতল বাড়ীর সমন্বয়ে একটি কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হবে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের বায়ুটুকু অপ্রতুল হয়ে পড়বে হয়ত বা শ্বাস প্রশ্বাসের বায়ু মানুষকে কিনতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে যে পরিবেশগত সমস্যা শুধু কোন বিশেষ শহর, রাজ্য বা কোন একটি দেশেই সীমাবদ্ধ নয় এটি আজ এক বিশ্বব্যাপী সমস্যা। সেই ১৯১৫ সাল থেকে মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়ে নানারকম চিন্তা ভাবনা চলেছে কিন্তু আজ সারা বিশ্ব এই পরিবেশ সমস্যার সম্মুখীন। ভারতবর্ষে পরিবেশ শিক্ষা কোন নতুন বিষয় নয়। এমনকি অতীতে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে জোর দেওয়া হত। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কী ধরনের সেটিকে ভালভাবে বোঝাই হচ্ছে আজকের যুগে পরিবেশ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি "নক্সন" এক বার পরিবেশ শিক্ষার উন্নতি কল্পে একটি সম্মেলন ডাকেন। তিনি বলেন যে মানুষে, মানুষে সম্পর্ককে কেন্দ্র তার সংস্কৃতি এবং তাকে কেন্দ্র করে যে পরিপার্শ আবর্তিত হচ্ছে তাকে জানা ইত্যাদির জন্য যে মূল্যবোধের উন্নতি এবং দক্ষতার প্রয়োজন পরিবেশ শিক্ষা মানুষকে সেটিই শেখায়।

এর প্রয়োজনে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমকে নতুন করে সাজান দরকার নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বনোচ্ছেদ এবং কৃষির কারণে পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার থেকে নিরাময়ের উপায় কী? সেগুলিকেও এই পাঠক্রমের বিষয়ের অন্তর্গত করা। জন সচেতনা তৈরীর উদ্দেশ্যে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার প্রতিটি স্তরে চালু করা উচিত। এই বিষয়গুলি কিভাবে পড়ান হবে সে ব্যাপারে পদ্ধতিগত কোন নির্দান হয়ত দেওয়া সম্ভব নয় তবে একথা বলা হয় যে এগুলি অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিক হতে হবে। ছাত্ররা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জানবে বায়ু দূষণ, জল দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, শব্দ দূষণ, মানসিক দূষণ এবং শিল্প বিকাশের জন্য পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝায়।

শিক্ষা এবং আধুনিকতা : ভারতবর্ষ আজ আধুনিকতার সংযোগ স্থলে এসে পড়েছে। আমাদের মহাকাশ যান আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু এও সত্য যে আমাদের দেশের অগণিত সাধারণ নাগরিক স্রেফ অশিক্ষিত থাকার জন্য এই সব বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শ্রেণী নির্বিশেষে যতদিন না সকল মানুষকে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই সব উন্নতি হয়ত অর্থহীন থেকে যাবে। এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এটির প্রয়োগ কাল থেকে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে গত শতাব্দী শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আমরা আমাদের লক্ষ্যের ৫০% এর ধারে কাছেও যেতে পারিনি। নতুন শতাব্দী শুরু হয়েছে কিন্তু লক্ষ্য আজও অনেক দূরে বলেই মনে হচ্ছে। যদিও মাথাপিছু আয় বেড়েছে দারিদ্র সীমার নীচে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ এই সীমারেখার সামান্য উপরে উঠে এসেছেন। তবু আজও বহু মানুষ রয়ে গেছেন অভুক্ত এবং আশ্রয়হীন এবং দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নতি সম্পর্কে অজ্ঞ। এই পটভূমিকায় আধুনিকতার দিকে দেশের এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষার ভূমিকা কতখানি তা বুঝতে হবে। আধুনিকতার বিষয়ে সমগ্র দেশবাসী কিন্তু ঐকামত পোষণ করেন না। অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মানুষ নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানর জন্য প্রকৃতির উপর দখল নেবে এবং এর ফলে মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হবে। আবার রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে সরকারের আধুনিকীকরণের যে সব পন্থা অবলম্বন করা উচিত তা হল যে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ যে অভূতপূর্ব জ্ঞান অর্জন করেছে তাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং বিজ্ঞান জগতে বিপ্লবের ফলেই সম্ভব।

আবার কারো মতে আধুনিকিকরণ একটি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া যা পরম্পরাগত ভাবে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধের বিন্যাস এবং উৎসাহ ও নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলবে। ভারতবর্ষে আধুনিকিকরণ জীবনধারা, চিন্তাধারাকে আমাদের পরম্পরাগত সংস্কৃতি এবং নিয়মনিষ্ঠা থেকে ভেঙে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিয়েছে।

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে কী করে মানিয়ে নেওয়া যায় এবং ভবিষ্যৎকালকে কেমন করে ঐক্যবদ্ধ করতে হয় শিক্ষাকে এই বিষয়টির ওপর জোর দিতে হবে। কোঠারী কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী "মানুষ হল প্রগতিশীল এবং উন্নতিশীল" একই সাথে সমাজও প্রতি-নিয়ত পরিবর্তনশীল। এটি কখনই স্থবির এবং গতানুগতিক হতে পারেন না। এর কাঠামো অবিরত পাল্টাবে, কখনও দ্রুতগতিতে কখনও ধীরগতিতে, কিছু পুনর্বীকরণের মাধ্যমে সময়ের সাথে নিজের জায়গা করে নেবে। অতএব শিক্ষার পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরী যাতে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যারা অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে যায় তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় এবং একই সাথে সাম্য, মুক্ত এবং ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে সমাজকে একটি নিয়মের মধ্যে আনা।

জাতিভেদ প্রথার মেরুকরণের ফলে যে ক্রমবর্ধমান ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষাকে তার সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এগুলিকে ব্যবহার করছে। একথা সত্য যে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ অবহেলিত থেকে গেছে কিন্তু অন্যের ক্ষতি পূর্বক স্বার্থ সাধন কখনই তার সমাধান নয়। এটির থেকে সামাজিক এবং ধর্মীয় মতভেদ এবং অনৈক্য তৈরী হতে পারে। শিক্ষা যা কিনা আধুনিকীকরণের এক

অত্যন্ত কার্যকরী হাতিয়ার তাকে সমাজের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে পড়তে হবে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারিক পরিবর্তনের ফলে একটি সাম্যবাদী সমাজ যা হতে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস মুক্ত, বিদ্বেষ মুক্ত। অবহেলিত নারীদেরকেও সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে। এতদিন পর্যন্ত কর্মরতা মহিলারা তাদের পরিবারে কী ধরনের আর্থ-সামাজিক ভূমিকা পালন করে এসেছেন তা বিশেষ কারো মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, কিন্তু আজকের বিকাশশীল ভারতীয় সমাজে পারিবারিক বন্ধনকে টিকিয়ে রাখা পরিবারে এবং সমাজে ঐক্য বজায় রাখতে এঁদের ভূমিকা আজ অনেকখানি। এটি আজকের শিক্ষার অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। আজ সময় এসেছে যখন নারীর চাহিদা এবং নারী মুক্তির বিষয়টি সরকারকে নতুন করে দেখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় শিক্ষাকে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় মোকাবিলা করার জন্য আন্দোলিত, গতিময়, এবং আরো মননীয় হতে হবে।

৩.৭ এককের সারাংশ (Unit Summary)

১. **বৈদিক যুগ** : প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বৈদিক দর্শন নির্ভর ছিল। সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি বলে বেদকে ধরা হয়। সাধারণ ভাবে বেদ কথাটির অর্থ হল কোন কিছুকে জানা তবে এর আরো গভীর অর্থ আছে। বেদ শুধু জ্ঞানের প্রতিনিধিত্বই করে না এটি জীবন দর্শনের জীবনের পথ দেখানোর কথাও বলে। এক এক ধরনের বেদ জীবনের এক একটি বিষয়কে উপস্থাপিত করে।

২. **বৌদ্ধ যুগ** : অতিরিক্ত ধর্মীয় আচার আচরণ যাগ-যজ্ঞ ক্রমবর্ধমান বর্ণভেদ ইত্যাদির জন্যই বৈদিক শিক্ষার অবনতি হয়। এই সময় ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবে একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৃদ্ধিলাভ করে যা বৈদিক জর্জরিতদের নূতন জীবনের সন্ধান দেয়। ভগবান বুদ্ধের বৌদ্ধ জীবন দর্শনের জন্ম দেয়।

৩. **মুসলিম যুগ** : ১১ শতক থেকে উপর্যুপুরি আক্রমণের মাধ্যমে ইসলামের ভারতবর্ষে প্রবেশ ঘটে। ইসলামের সাথে সাথে একটি নূতন ধর্ম এবং নূতন শিক্ষা ব্যবস্থারও এদেশে প্রবেশ ঘটে। ইসলামী অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয় শিল্প এবং সংস্কৃতির দ্বারা দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভারতের অপার ঐশ্বর্য্য তাদের আরো বেশী করে আকৃষ্ট করে। বহু মুসলিম আক্রমণকারী ভারতে অনুপ্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় ভাবে ভারত শাসন করতে সমর্থ হয়। উল্লেখযোগ্য বংশগুলির মধ্যে দাস বংশ, খিলজি বংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ, লোধি বংশ এবং মুল বংশ প্রায় ২০০ বৎসর ধরে এদেশে তাদের সাম্রাজ্য এবং শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে।

এযুগে শিক্ষা পুরোপুরি ধর্ম এবং ইসলাম মন্ত্রভিত্তিক ছিল, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনএবং কোরাণ পাঠ ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। অতএব তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলাম ধর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে তারা গুরুকুল, বৌদ্ধ বিহার, মঠ এবং মন্দির ইত্যাদিকে ধ্বংস করে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

৪. **প্রাক স্বাধীনতা যুগ** : মুসলিম শাসকেরা এদেশে বহু প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে দিয়ে সে জায়গায় ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং ইসলামীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তা সত্ত্বেও পাশাপাশি ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা তখনও টিকে ছিল ঠিক এমনই সময় ভারতীয় দৃশ্য পটে ব্রিটিশদের প্রবেশ ঘটে : তারা এই ব্যবস্থাটিকে দেশীয় বলে অভিহিত করে এবং বলে যে এটি ক্রমশ অবক্ষয় প্রাপ্ত হবে। তাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তারা এই শিক্ষা ব্যবস্থাটির অবলুপ্তির জন্য যা যা করা দরকার তাই করে।

১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দাবি সনদ ভারতে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করে। এই সনদে ভারতীয় সাহিত্যে পুনর্বিন্যাসের জন্য এক লক্ষ টাকা দাবী করা হয় যা প্রথাগত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পশ্চিমী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এক তিক্ততার সৃষ্টি করে। এই মত বিরোধটি "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের" মতবিরোধ নামে পরিচিত, লর্ড ম্যাকলে এটির নিষ্পত্তি করেন। লর্ড ম্যাকলের বিখ্যাত নথিটিতে ভারতীয় সাহিত্য, ধর্মীয় আচার ব্যবহার ইত্যাদির তিক্ত সমালোচনা করা হয়, এবং একই সাথে পশ্চিমী জ্ঞান, ভাষা, বিজ্ঞান এবং পশ্চিমী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সুখ্যাতি করা হয়।

বৃটিশরা ধীরে ধীরে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং "নিম্নমুখী পরিশ্রুতন তত্ত্ব"-র স্বপক্ষে কথা বলে যারা অর্থ দাঁড়ায় সমাজের উচুঁতলার বা শ্রেষ্ঠ বা বাছাই করা শ্রেণীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

উড-এর সনদ (১৮৫৪) : উড-এর সনদ শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি মহৎ দাবী। এটির ফলে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এটির সুপারিশক্রমে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত হয়।

এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি অঞ্চলে একজন নির্দেশকের অধীনে জন নির্দেশ কার্যালয় স্থাপিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষায় অনুদানের ব্যবস্থা, শিক্ষকদের জন্য বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা এ সবই এই সুপারিশের ফল।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) : এটি হান্টার কমিশন নামেও সুপরিচিত। এটিই প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথম শিক্ষা কমিশন।

এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করে সেগুলির সমাধানের পরামর্শ দেওয়া।

এটি প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়। এটি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাস্তবমুখী এবং কার্যকরী করার জন্য সুপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার ভার আঞ্চলিক সমিতির হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও এই কমিশন করে।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থাও খতিয়ে দেখে এবং এর পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করার জন্য সুপারিশ করে। এই সুপারিশে বলা হয় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম অংশটি সাধারণ বিষেয় সম্বলিত হবে আর দ্বিতীয় ভাগে কর্মমুখী বিষয়গুলি থাকবে।

এটি উচ্চতর শিক্ষা স্ত্রী শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য বিষয়েও সুপারিশ করে।

১৮৯১ সালে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হন। তিনি এদেশে শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান। একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯০৪ সালে ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) : এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক বিষয়ে অনেক গুরুত্ব পূর্ণ ব্যবস্থার কথা বলা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় যাতে পাঠদানের বিষয়টি নিজের আয়ত্তে রাখে সে ব্যাপারে জোর দেয়। ব্যবস্থাপক সভার ভূমিকা সম্বন্ধেও এতে বলা আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭) : এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার এন. এফ. সাদলার। এটি সাদলার কমিশন নামেও পরিচিত। যদিও এই কমিশনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলিকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল কিন্তু এটি ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থাও খতিয়ে দেখে।

এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান করার জন্য সুপারিশ করে। এটি পাঠক্রম তৈরীর জন্য একটি বোর্ড গঠনের পরামর্শও দেয়। এটি ব্যবস্থাপক সভা স্বীকৃত দানের পরামর্শও দেয়। যাই হোক ভারতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে তৈরী করার উপর জোর দেয় এবং এই প্রস্তাবটি যথেষ্ট সমালোচনার মুখে পড়ে।

হার্টগ কমিটি : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয়দের "স্বরাজ" এই চাহিদাকে নিবৃত্ত করার জন্য বৃটিশ সরকার দ্বৈতশাসন চালু করে। দ্বৈতশাসনের মাধ্যমে যে সাংবিধানিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল তা ছিল নিছকই একটি বিভ্রম একথা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়। ১৯২৭ সালে তৎকালীন সরকার ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য সাইমন কমিশনকে নিযুক্ত করে। একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করার কথাও বলা হয়।

কমিশন স্যার ফিলিপ হার্টগের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে, এবং ১৯২৯ সালে এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। কমিটি তদানীন্তন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে আনে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় এই কমিটির রায়/আবিষ্কারগুলি। তাঁর মত অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি না হওয়ার পেছনে প্রধানত দুটি কারণ "অপচয়" এবং "স্থবিরতা"। কমিটি অন্যান্য বিষয়েও তাদের পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে জানায়।

অ্যাবট উড রিপোর্ট (১৯৩৭) : অ্যাববট এবং এস. এইচ. উড. এই দুই বৃটিশ বিশেষজ্ঞকে ১৯৩৭ সালে ভারতে কর্ম শিক্ষার বিষয়ে একটি পরিকল্পনা করার জন্য নিয়োগ করা হয়। এই রিপোর্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ করা হয় যেমন আঞ্চলিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে কর্মমুখী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি স্বাধীন শাখা বলে পরিচিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় নিম্ন এবং উচ্চ উভয় স্তরেই এই শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

সার্জেন্ট রিপোর্ট : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তদানীন্তন সরকার ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবতে শুরু করে। সার্জেন্ট রিপোর্ট এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। এটির প্রধান সুপারিশগুলি হল এদেশের ৬-১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, উচ্চ বিদ্যালয় গুলিতে দুই ধরণের শিক্ষা যথা—সাধারণ শিক্ষা এবং কর্ম শিক্ষা উভয় ব্যবস্থাই রাখতে হবে, পাঠক্রমকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাত্রাতিরিক্ত ছাত্র সমাগম কার্যকরী এবং সফলভাবেআটকাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৭-৪৮) : ১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর খ্যাতনামা দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়।

এই কমিশন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার, আর্থিক ব্যবস্থা এবং গ্রামীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

এই কমিশন অনুভব করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং দেশের ভবিষ্যৎ চাহিদা এই দুটি বিষয়কে নির্ভর করে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা। কমিশন শিক্ষাদানের গুণগত মানোন্নয়নের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেয়।

ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনই হল এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশগুলি খুবই সাহায্য করেছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৪৩) : ১৯৫২ সালের ৩২শে সেপ্টেম্বর ডঃ এ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়ার এর সভাপতিত্বে ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োজিত হয়। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলিকে খতিয়ে দেখা এবং তার সুরাহার পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই কমিশনের প্রধান কাজ। এই বিষয়ে সুপারিশ করার সময় কমিশন লক্ষ্য করে যে ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতম অংশ। অনেকগুলি ত্রুটি নিয়ে

এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি টলমল অবস্থায় ছিল যেমন এটি ছিল সংকীর্ণ, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় ছাত্রদের কোন সাধন-এর প্রকৃত মূল্যায়ন করতেও ছিল অক্ষম।

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) : ১৯৬৪ সালে ডঃ দৌলত সিং কোঠারির সভাপতিত্বে ভারত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে। দেশের সামগ্রিক চাহিদার কথা ভেবে কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়গুলিকে খতিয়ে দেখে। কমিশন পরবর্তীকালে তিন খণ্ডে বিভক্ত এক বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করে।

এই কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার লক্ষ্য নিয়ে বিস্তারিত ভাবে কাজকরে। এটি জোরের সঙ্গে বলে যে শিক্ষাকে আমাদের দেশের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে হবে। শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এটি বিভিন্ন কর্মসূচীর সুপারিশ করে যথা—শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক মেলবন্ধন, শিক্ষার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা, শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকিকরণের গতি সঞ্চার, শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ।

জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) : ১৯৮৬ সালে ভারতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। এটি বার (১২) খণ্ডে সম্বলিত। শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি বেশ কিছু মূলগত পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। জাতীয় প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে N.P.E. সমগ্র দেশের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশ করে যেটির কাঠামো হবে ১০ + ২ + ৩ (প্রথম পাঁচ বছর প্রাথমিক শিক্ষা, পরের পাঁচ বছর নিম্ন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা, এরপর দু'বছর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং শেষ তিন বছর স্নাতক স্তরের শিক্ষা)। N.P.E. ন্যূনতম শিক্ষার ওপর জোর দেয়, এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলা, শিশু পরিচর্যা ও পুষ্টি এবং বয়স্ক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে দূর সঞ্চারী শিক্ষার প্রসারেও গুরুত্ব আরোপ করে।

N.P.E. মূল্যায়ন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যসের ওপরও জোর দেয়। এটি আরও বলে যে ক্ষেত্রবিশেষে কাজের প্রয়োজনটাই আসল, এবং সেটিকেই বড় করে দেখা উচিত এক্ষেত্র সব সময় ডিগ্রিকে গুরুত্ব দিলে চলবে না একে এক কথায় বলা যেতে পারে কাজ ও ডিগ্রির মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।

১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের পর এটিকে অত্যন্ত সততা এবং উৎসাহের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। এই নীতির বাস্তব রূপায়নের কয়েকটি উদাহরণ হল "অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড", নবোদয় বিদ্যালয়, + ২ স্তরে কর্মশিক্ষার প্রচলন, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং ১০ + ২ + ৩ এই কাঠামোয় শিক্ষা ক্রমের বিন্যাস।

বিকাশশীল ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা : তথ্য ও প্রযুক্তির জগতে ভারত আজ এক অতি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে বিকাশমান। ভারত আজ পারমাণবিক শক্তিতেও এক শক্তিধর রাষ্ট্র। মহাকাশ প্রযুক্তিতেও ভারত অত্যন্ত উন্নত। শিল্পক্ষেত্রেও আশ্চর্যজনক উন্নতি লাভ করেছে কিন্তু এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতা এবং বৈষম্য থেকে গেছে। যদিও সুদূর ভবিষ্যতের কিছু আশাপ্রদ ছবি এখনই দেখা যাচ্ছে।

জনশিক্ষা : ভারতের জন সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ২০০১ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটি যথেষ্ট চিন্তার কারণ। অতএব শিক্ষাকে এই ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরিবেশ শিক্ষা : এক সময় যে দেশটির পরিবেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল এবং আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল স্বাস্থ্যকর আজ সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের যন্ত্রণায় কাতর। এটি সত্যিই একটি স্ববিরোধী উক্তির মত শোনায় যে দূষণ আজ একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। এটি আজ সমগ্র মানবজাতির সমস্যা।

যদিও ভারতবর্ষে পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষা একটি নতুন ধারণা তবুও এটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কথা ভেবে প্রয়োজনে কর্ম পরিকল্পনা নিতে হবে। এর পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক অত্যন্ত উদ্ভাবনী চিন্তাসহ নূতন করে লিখতে হবে।

শিক্ষা এবং আধুনিকতা : ভারত আজ আধুনিকতার সংযোগস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। এর একদিকে আমাদের স্বদেশী প্রযুক্তিতে নির্মিত মহাকাশযান, উপগ্রহ ইত্যাদি মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্যদিকে বিশাল জনসংখ্যা আজও এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে যেখানে অনাহার, আশ্রয়হীনতা নিত্যদিনের সঙ্গী এটি যেন আমাদের দেশের আরেকটি দিক। আধুনিকীকরণ যদিও একটি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া এবং ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে সাম্য এবং ঐক্য ছাড়া এটির টিকে থাকা সম্ভব নয়, তাই আধুনিকীকরণ বা আধুনিকতার বিষয়ের শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, শুধুমাত্র সকলকে সমানাধিকার দিয়েই নয় বরং অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে প্রকৃত ভারসাম্য বজায় রেখে।

৩.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১. প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকে কোন বিষয়গুলিকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা উচিত? এবং কেন?

২. ঐতিহাসিকগণ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন অন্ধকার যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন?

৩. ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় উডস্-এর শিক্ষা সনদটির অবদান কতখানি?

৪. অপচয় এবং স্থবিরতা বলতে কী বোঝ? এগুলিকে কাটিয়ে ওঠার উপায় কী?

৫. প্রাথমিক শিক্ষা কী? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটির অবদান কতখানি?

৬. ধর্মীয় শিক্ষা কী? আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই শিক্ষা কীভাবে দেওয়া যেতে পারে?

৭. জাতীয় উৎপাদন বলতে কী বোঝ? এক্ষত্রে শিক্ষা কীভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে?

৮. "মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতম সংযোগ ক্ষেত্র" এটিকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি কী?

৯. ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি কী? সংক্ষেপে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

১০. পশ্চিমবঙ্গে কর্মশিক্ষার উন্নতি নিয়ে আলোচনা করুন।

৩.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

বিনির্দিষ্ট কাজ (যে কোন দু'টি)

১. মুসলিম এবং প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করুন।

২. ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩. ১৯৮৬ সালের নতুন শিক্ষা নীতিকে একজন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে evaluate করুন।

৪. ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃটিশ শাসনের অবদান নিয়ে আলোচনা করুন।

কার্যকলাপ :

১. দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে জনশিক্ষার বিষয়গুলি খুঁজে বার করুন।

২. একটি উপজাতি অঞ্চলে বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করে আপনার প্রথম কী ধারণা হ'ল তা লিপিবদ্ধ করুন এবং এটির সুষ্ঠু পরিচালনের বিষয়ে পরামর্শ দিন।

৩. তোমার অঞ্চলের একটি স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন, অন্যান্য সাফল্য এবং কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন।

৩.১০ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion Clarification)

১. প্রাচীন এবং বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করুন

(ক) বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

(খ) স্ত্রী শিক্ষা

(গ) "বর্ণ প্রথার" ভূমিকা

২. পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে বিরোধ

(ক) পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি

(খ) প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি

(গ) মতবিরোধের প্রভাব

৩. ধর্ম যাজকদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভূমিকা

(ক) ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে

(i) ধর্ম প্রসার এবং ধর্মান্তকরণ

(ii) শিক্ষার প্রসার

(খ) গণ শিক্ষা বা গুণমান সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা

৪. ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ

(ক) এটির বিভিন্ন রূপ

(খ) সাংবিধানিক সুযোগ

(গ) ১৯৪৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশাদি

৫. সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা

(ক) সাংবিধানিক সুযোগ

(খ) এটি মৌলিক অধিকারভুক্ত হবে কিনা?

(গ) অতি বাস্তবতা

৬. ভাষা বিতর্ক

(ক) ত্রিভাষা অনুমোদিত বিধি

(খ) জাতীয় ভাষা বনাম ইংরাজী ভাষা

৩.১১ অন্যান্য বিষয় (Other Points)

.....

.....

.....

.....

৩.১২ উৎস (Reference)

- A. S. Altekar—Education in Ancient India.
- V. P. Bohil—The History of Education in India.
- Radha Kumud Mukherjee—Ancient Indian Education.
- N. N. Mazumdar—Education in Ancient India.
- Raja C. Kunhar—Some Aspects of Education in Ancient India.
- S. M. Jafar—Education in Muslim India.
- E. E. Keay—History of Indian Education Ancient and in later times.
- Law, Narendranath—Promotion of learning in India during Mohammedan Rule.
- A.N. Basu—Education in Modern India.
- Bhagwan Dayal—The Development of Modern Indian Education.
- Humayun Kabir—Education inNew India.
- S. N. Mukherjee—Education in India—Today and Tommorow.
- S. Narullah and J. P. Maik—A History of Education in India.
- M. R. Paranjape—A Source Book of Modern Educare.
- Zabir Hussain Committee—Report on Basic Education.

- K. G. Saiyaidain—Compulsory Education in India.
- K. K. Shrimati—The Wardha, Scheme.
- D. M. Desai—Universal Compulsory and free Primary Education.
- Report of Universities Education Commission—1949.
- Report of Secondary Education commission—1953.
- Report of Education Commission—1964-66.
- New Education Policy, 1986.

পর্ব-২

সমাজ অনুধাবন
[UNDERSTANDING SOCIETY]

পর্ব-২

সমাজ অনুধাবন

মানুষ সমাজিক জীব, মানুষ হল প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফসল। বিবর্তন একটি বিরামহীন স্ব-পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে কালে কালে জন্ম নেয় নানাবিধ অভিনব বস্তু। প্রকৃতির এই বিবর্তন ধারাবাহিক ভাবে তিনটি পর্বের মধ্যে দিয়ে সাধিত হয়েছে - সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত বির্বতন পর্ব, জৈবনিক বিবর্তন পর্ব এবং মানসিক তথা সামাজিক বিবর্তন পর্ব, অর্থাৎ এই বিবর্তন বস্তু, জীবন এবং মন এই তিনটিকে নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। সময়ের নিরিখে সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবর্তন শুরু হয়েছে বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা কাল থেকে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি বছর আগে এই বিবর্তনের শুরু। জীবনের সূচনা হয় তিরিশ (৩০) লক্ষ বছর আগে এবং এই বিবর্তনের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা নবাগত জীব - মানুষ, সেই মানুষের জন্ম হয়েছে তিন লক্ষ বছর আগে। সৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনার মানুষ হল একটি জীবিত অস্তিত্ব। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় জীব জগতে মানুষ একটি প্রাণী, প্রাণীকুলের মধ্যে মেরুদন্ডী প্রাণীদের একজন, মেরুদন্ডীদের মধ্যে স্তন্যপায়ীদের একজন, স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আবার সবচেয়ে উচ্চ স্তরের, উচ্চস্তরের মধ্যে হোমিনিদ (Hominid) এবং হোমিনিডদের (Hominid) মধ্যে হোমো সেপিয়নস। তাই জীবকুলের সকলকেই বলা চলে আমাদের আত্মীয় বর্গ। মানুষের মনের সংযোগের সাথে মনোসামাজিক বিবর্তনের পর্বটি ঘটেছে।

প্রথম একক ঃ প্রথম এককে মনুষ্য সমাজকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে, সময়ের পরিবর্তনকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, আদিকাল থেকে আধুনিক সমাজ-খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে আধুনিক সাইবারনেটিক্স যুগে এক নিরবিচ্ছিন্ন পদযাত্রা, বর্বরতা এবং সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য বোঝার এবং বর্তমান অবস্থার নিরিখে ভবিষ্যত সমাজকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় একক ঃ এখানে ভারতের মহৎ অভিজ্ঞতার কথাগুলির উপস্থাপন করা হয়েছে। মহাযোগী শ্রী অরবিন্দ ব্যাপকভাবে তাঁর আদর্শ এবং অগ্রগতির কথা বলেছেন। তাঁর যোগী দর্শন মানব সভ্যতার বিবর্তনের ওপর আলোকপাত করে। তাঁর দর্শন আমাদের জানায় ভবিষ্যত অগ্রগতির আদর্শ উপায় কী হওয়া উচিত এবং কেমন করেই বা তাকে উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয় একক ঃ এটিতে ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি, ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সমাজের মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে ও তাকে সম্পাদন করার ব্যাকুল বাসনা প্রভৃতিকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

একক ১ ☐ সমাজ অনুধাবন (UNDERSTANDING SOCIETY)

গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ সমাজের অর্থ

১৩.১ সমাজের সংখ্যা

১৩.২ সমাজ ও সমাজ বিদ্যা

১.৩.৪ সামাজিক স্তর বিন্যাস

১.৪ যুগোপোযোগী সমাজ

১.৪.১ খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে সাইবারনেটিক্স যুগ

১.৪.২ প্রাগৈতিহাসিক সমাজ

১.৪.৩ আধুনিক সমাজ

১.৪.৪ সমাজের বৃত্ত

১.৫ বর্বরতা এবং সভ্যতা

১.৫.১ বর্বরতার চরিত্র

১.৫.২ সভ্যতার চরিত্র

১.৬ ভবিষ্যৎ সমাজ

১.৬.১ আধুনিক সমাজের উন্নতির ঘটনাবলী

১৬.২ সমকালীন আধুনিকতার প্রক্রিয়া ও ধারা

১.৬.৩ আধুনিকিকরনের অনাতম উপাদান সমূহ

১.৬.৪ উপযোগী চাহিদা

১.৬.৫ ভারতীয় সমাজ ও ভবিষ্যৎ

১.৬.৬ ভবিষ্যতের জন্য আজীবন শিক্ষা

১.৭ একক-এর সারাংশ

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৯ বাড়ীর কাজ

১.১০ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১১ উৎস

১.১ ভূমিকা (INTRODUCTION)

মানুষ হল একটি সামাজিক ও চিন্তাশীল জীব, যে কিনা প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফল।

প্রায় তিরিশ লক্ষ বছর আগে মানুষ পরিবেশের একটি প্রাণী হিসেবে তার পথ চলা শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের জীবনের কারিগর হয়ে ওঠে। কোন সময়েই মনুষ্য সমাজ এক জায়গায় থেমে

থাকেনি বরং এটি প্রতিনিয়ত গতিময় হয়ে পরিবর্তিত সময় এবং নূতন নূতন চাহিদার মোকাবিলা করে এসেছে যাতে সমাজ টিকে থাকে এবং তার অগ্রগতি হয়। প্রকৃতির সম্বন্ধে চিন্তাশীল হওয়ার জন্য মানুষ শুধু যে নিজেকে তুলে ধরার ব্যাপারেই সচেতন তাই নয় বরং সমগ্র প্রকৃতির রক্ষনাবেক্ষণ তার সাহায্য এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিষয়েও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

১.২ উদ্দেশ্য (OBJECTIVES)

এই এককটি অনুধাবন করার পর একজন পাঠক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে সক্ষম হবে ঃ

- সমাজের সঠিক অর্থ এবং সেই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা
- সেই শুধু মাত্র খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে আধুনিক সাইবার্নেটিক্স যুগ পর্যন্ত সমাজের পরিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।
- প্রাগৈতিকহাসিক এবং আধুনিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য
- বর্বরতা এবং সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য।
- সমাজের ভবিষ্যৎ সম্ভবনা সম্বন্ধে ধারনা।

১.৩ সমাজ বলতে কি বোঝায়? (MEANING OF SOCIETY)

১.৩.১ সমাজের সংজ্ঞা (Defining Society)

সমাজ শব্দটি হল মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত একটি সাধারণ আখ্যা। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় সমাজ বলতে সত্যিকারের কী বোঝায়, তাহলে হয়ত অনেকেই এই প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর দিতে পারবেন না। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ একেক রকম উত্তর দেবেন যেগুলির মধ্যে অতি অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। অতএব আমরা সমাজের প্রকৃত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করি। প্রত্যেকেরই সমাজ সম্বন্ধে নিজ, নিজ ধারনা থাকতে পারে। পাঠক নিজের মত করে সমাজের সংজ্ঞা নিরুপনের চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

সমাজ কী?

আপনার নিজস্ব সংজ্ঞা নীচের সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে লিপিবদ্ধ করুন ঃ

পাঠক হয়ত নিম্নে বর্নিত সমাজের সংজ্ঞার মধ্যে থেকে সমাজ সম্বন্ধে তাঁর নিরুপিত সংজ্ঞার সাথে মিল খুঁজে পাবেন

- একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী একদল মানুষ;
- একটি সুসংহত জনসমন্বয় যারা একটি অঞ্চলে একত্রে বসবাস করে;

- একটি সুসংহত জনগোষ্ঠীকে কেবল মাত্র তখনই সামাজিক আখ্যা দেওয়া যাবে যদি দেখা যায় যে তারা দীর্ঘকাল ধরে একত্রে বসবাস করছে।
- একটি সুসংহত জন গোষ্ঠী যারা শুধু মাত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি অঞ্চলে একত্রে বসবাস করছে তাই নয় দেখতে হবে তাদের আপাত স্বার্থের মধ্যে মিল আছে কিনা, তাদের ঐহিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক কিনা এবং সাধারণ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল আছে কিনা।
- একটি সুসংহত জনগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি সবই এক ও অভিন্ন।
- একটি সুসংহত জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে জীবনের প্রাথমিক অবস্থা শর্তগুলি যেমন - পোষাক পরিচ্ছদ, জীবন যাত্রা, চিন্তা ভাবনা, আচার আচরণ এবং ভাবের আদান প্রদান ইত্যাদি একই রকম।
- একটি এমন ব্যবস্থা যার সাহায্যে মানুষ একত্রে একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করতে পারে।
- একটি নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠী যারা একই নিয়ম, একই আইন এবং একই আদর্শ মেনে চলে।
- একটি গোষ্ঠী যাদের ঐতিহ্য ভিত্তি এবং স্বার্থ এক এবং অভিন্ন।

উপরের সংজ্ঞাগুলির সাথে যদি পাঠক মোটামুটি ভাবে এক মত হয় তবে বলা যেতে পারে যে সমাজ সম্বন্ধে উপরে লিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যতীত আরো অনেক সংজ্ঞা হতে পারে।

একথা সত্য যে সমাজ মানে কিছু ব্যক্তির সম্পাবদ্ধভাবে এক জায়গায় থাকাকেই বোঝায় না। যেমন একটি রেলগাড়ীতে ভ্রমণরত একদল যাত্রী বা সামরিক ছাউনিতে থাকা একটি সৈন্যবাহিনী একটি সমাজ গড়তে পারে?

অতএব সমাজের সঠিক অর্থ অনুধাবন করার জন্য নিয়মিত চর্চার প্রয়োজন। সমাজবিদ্যা হ'ল প্রকৃতির উৎকর্ষতা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি এবং সামাজিক আচার ব্যাবহার সমন্বে বৈজ্ঞানিক উপায়, পঠন এবং অবলোকন।

সমাজের সংজ্ঞা

- একদল মানুষের একত্রে বসবাস এবং তাদের পারস্পরিক চাহিদার নিবৃত্তি (Laski)
- শুধুমাত্র রাজনৈতিক সম্পর্কের জন্যই যে মানুষ পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে তা নয় মানুষের সামগ্রিক কার্যকলাপই তাদের পারস্পরিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং একত্রিত করে রাখে। (Leacockl)
- একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠন ও সমিতি। (G.D.H. Cole)
- সমাজ বলতে আমরা বুঝি কিছু ঐক্যবদ্ধ মানুষের সমষ্ঠি যারা কিনা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক যুক্ত এবং এর ফলে একধরনের স্থায়িত্ব এবং স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলতে পারে (১৯৫৩) (S.F. Nidel)
- সমাজ হ'ল মানুষ নামে এক জৈবিক বস্তুর একত্রিভূত আত্মা, মন এবং শরীরের যোগফল। (Sri Aurobindo)

DEFINITIONS OF SOCIETY

A group of human beings living together for the satisfaction of their mutual wants. *(Laski)*

Not only political relations by which men are bound together but the whole range of human relations and collective activities. *(Leacockl)*
The complex organised association and institutions within the community. *(G.D.H. Cole)*
By society we can only mean an aggregate of human beings bound together in some unity, that is, acting in an integrated and regular manner and possessed of some degree of permanence and stability (1953). *(S.F. Nidel)*
A society, a great human collectivity is an organic being with a common soul, mind and body. *(Sri Aurobindo)*

১.৩.২ সমাজ এবং সমাজবিদ্যা (Society and Sociology)

সমাজ হল একত্রিভূত বহু মানুষের একটি গোষ্ঠী যাদের সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠানে এবং ভাব বিনিময়ের মাধ্যম সাধারণত এক রকম। এটির চলমানতা এবং সময়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, বিবাহ নামক প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য সামাজিক পদ্ধতির মাধ্যমে যা সমাজ দ্বারা গৃহীত এবং অনুমোদিত। এটি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অন্তঃনির্ভর মানব গোষ্ঠী যাদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক, যারা পরম্পরাগত ভাবে একই ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করে, যাদের জীবন যাত্রার ধরনও এক এবং উক্ত মানব গোষ্ঠীর কল্যাণে যারা একই রকম নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে। গোষ্ঠী বদ্ধ মানুষের মধ্যে এই ধরনের ভাবগতিক সমাজে এক ঘনসন্নিবদ্ধ ঐক্যের জন্ম দেয় এবং এর ফলেই সমাজে এক ধরনের উচ্চাকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। সমাজের সাধারণ বিষয়ও সমস্যা গুলি নিয়ে প্রতিটি সদস্যের একে অপরের সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্তা চলতে থাকে। এর ফলে সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে। একটি সামাজিক বা সমাজ জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে তার সদস্যদের মধ্যে কি ধরনের আলোচনা গুরুত্ব পাচ্ছে তার ওপর। মুক্ত সমাজ জীবন এবং উদার সমাজ গঠন পুরোপুরি নির্ভর করে তার সদস্যরা কতখানি খোলা মেলা মুক্ত মনে নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করে তার ওপর।

অতঃপর, একটি সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

- একটি সাধারণ অঞ্চল
- সাধারণ ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
- বাচনিক দক্ষতা এবং ভাষা
- নিবিড় আদানপ্রদান
- সাধারণ আচরণ বিধি
- ঐক্য এবং সহানুভূতি
- সামাজিক ব্যবহার এবং সামাজিক জীবনের নিয়মনীতি
- সাধারণ উচ্চাশা

সমাজবিদ্যা হল মানুষ এবং সমাজ সম্বন্ধে নিয়মনিষ্ঠ ভাবে জ্ঞান আহরণের বিষয়। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণ এবং অনুধাবনের এটি এক প্রকার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। নৃতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞান, জাতিবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ববিদ, মানব-পরিবেশ বিজ্ঞানী - অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানী এবং মনস্তত্ত্ববিদ এঁরা নিরন্তর গবেষণা এবং চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কোন ভাবে যাতে মানব সমাজের বিবর্তনের ধারার মধ্যে

বিচ্ছিন্ন সূত্র গুলিকে খুঁজে বার করা যায় এবং মানব সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাতের মাধ্যমে একটি পরিষ্কার ছবি তুলে ধরা যায়।

সমাজ বিদ্যার মূল ক্ষেত্রটি হল "সমাজতন্ত্র"

ক্ষুদ্রতম পরিবার থেকে শুরু করে জটিল জাতি গোষ্ঠী, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমন্বিত গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে বৃহত্তর বিশ্ব মানব জাতি ও এর অন্তর্ভুক্ত।

১.৩.৩ সমাজ ও রাষ্ট্র (Society and State)

রাষ্ট্রেরও আগে সমাজ এমনকি এটি ধর্ম স্থান, পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দলেরও আগে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ কী? দুটির মধ্যে পার্থক্য প্রভেদই বা কী?

নিম্নলিখিত সারণী থেকে তা বোঝা যাবে।

সমাজ	রাষ্ট্র
সমাজতন্ত্র	রাজনৈতিক সংগঠন
সামাজিক নিয়মভুক্ত	রাজনৈতিক নির্দেশ ভুক্ত
রাষ্ট্রের আগে	সমাজ থেকে উদ্ভূত
রাষ্ট্রের চেয়েও বিস্তৃত আঞ্চলিকতা জরুরী নয় সংগঠন বা অসংগঠিত	সমাজের তুলনায় সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা ভিত্তিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া জরুরী
দুই-ই হতে পারে।	

১.৩.৪ সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social Stratification)

সামাজিক স্তরবিন্যাস হ'ল মানব সমাজের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে ঃ

- এটি নিছক ব্যক্তি জীবনের বৈসাদৃশ্য, পার্থক্য বা মতভেদ নয়
- এটি যুগ যুগ ধরে অটল, যেন সমাজ বৃক্ষের কান্ড
- এটি সার্বজনীন কিন্তু অবিচল বা সর্বত্র সমান নয়
- এটির মধ্যে শুধু বৈষম্যই নয় অবিশ্বাসও আছে

ডেভিস্-মুর'এর গবেষণা প্রবন্ধ (The Davis-Moore Thesis)

ডেভিস-মুর'এর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি দাবি করে যে সামাজিক স্তর বিন্যাস হ'ল সার্বজনীন, কারণ সমাজের কার্যক্ষেত্রে এটির লাভজনক গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যথায়, সামাজিক স্তরবিন্যাসের কিছু কিছু রূপ যে বিশ্বের সর্বত্র একই রকম দেখা যায় এই সত্যটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশা আছে যে পেশার কার্যকরী গুরুত্ব যত বেশী সমাজ সেই পেশাকে তত বেশি পারিতোষিক সম্মান দেয়। এটিই হ'ল সমাজে দক্ষতা বা সঙ্গতির বিষম বন্টনের ভিত্তি। গুরুত্বপূর্ণ

কাজের স্বীকৃতির চিহ্নগুলি হ'ল সেই কাজের দ্বারা একজন অধিক আয় করবে, অধিক ক্ষমতা এবং সামাজিক সম্মান ভোগ করবে। সম্পত্তির বিষম বন্টন সমাজে মানুষকে আরো কঠোর পরিশ্রম এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। সম্পত্তির বিষম বন্টনের এই ব্যবস্থা যা কিনা মূলত বিভিন্ন কাজের গুণগত মানের ওপরে ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় তার ফলেই সামাজিক স্তর বিন্যাসের সৃষ্টি হয়। বিষম পারিতোষিক বা সম্মান প্রদানের (অর্থাৎ কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি ও তার কাজের স্বীকৃতি) নিয়ম সম্বলিত একটি সমাজ, আসলে অত্যন্ত সৃজনশীল এক সমাজ।

বিবিধ সামাজিক নিয়ম (Different Social Systems)

সামাজিক স্তর বিন্যাস জাতি এবং বর্ণ প্রথার প্রনয়ন করে। যদিও প্রকৃত জাতি এবং বর্ণ প্রথা বলে আসলে কিছু নেই। যদিও এই দুটিরই উপাদান ইউনাইটেড কিংডম'ত্র (UK) আজও দেখা যায়।

ভারতবর্ষে জাতি প্রথা (The Caste System : India)

সমাজ সংগঠিত হয় জাতিতে। প্রকৃত জাতি প্রথা হ'ল একটি আবদ্ধ প্রথা। জাতি প্রথা হল সাধারণভাবে সম্পত্তির পুনর্বন্টন ভিত্তিক সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

একদল সাধারণ মানুষ সহস্র জাতির কোন একটি গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। একটি সাধারণ মানুষের জীবনের গতিপ্রকৃতি এবং রূপরেখা বিরাট ভাবে প্রভাবিত এবং নির্ধারিত হয় সে কোন্ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে তার ওপর।

কোন একটি জাতির অন্তর্গত পরিবারগুলি বংশানুক্রমিক ভাবে একই ধরনের কাজ করে চলে। সম্পত্তি পুনর্বন্টন কেন্দ্রিক সমাজে কিছু কিছু বৃত্তি যেমন কৃষি কাজ সকলের জন্য খোলা থাকতে পারে।

কিন্তু সাধারণভাবে জাত নির্ধারিত বা পরিচিত হয় সেই গোষ্ঠীর সদস্যরা কি ধরনের কাজ (বৃত্তি/পেশা) করে তার ওপর যেমন নাপিত, কামার, স্বর্ণকার বা কর্মকার, মুচি, কুমোর, ধোপা, পুরোহিত ইত্যাদি।

- সাধারণত স্বজাতির মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হয়
- মানুষ সাধারণভাবে বিশ্বাস করে যে আপনা থেকে যে কাজ তাদের উপর সমর্পিত করা হয়েছে সেগুলি সততার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারলেই তাদের জীবনের আকাঙ্খা, ইচ্ছা প্রভৃতি পূর্ণ হবে।
- সাধারণ মানুষ নিজ নিজ জাতির সম্বন্ধে গর্বিত বোধ করে এবং পুরাকালের কোন মুনি ঋষির থেকে তার স্বজাতির উৎপত্তি তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করে এবং উক্ত মুনি/ঋষি কি বিষয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন সে কথা জেনে পুলকিত হয়।
- মানুষ বিশ্বাস করে যে, সে জাতির অন্তর্গত হয়ে সে জন্মগ্রহণ করুন না কেন চারটি পুরুষার্থ যথা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ইত্যাদির উপলব্ধিতে তা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

যানবাহনের সুবিধা, গতিময়তা, নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ এবং নতুন নতুন নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থাকার ফলে আধুনিক কালে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে অনেকেই আর বংশানুক্রমিক পেশায় আবদ্ধ না থেকে শহরাঞ্চলে নতুন পেশার সন্ধানে চলে আসছেন। আজকের যুগে পেশা এবং সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে জাতি প্রথা অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

বর্ণ প্রথা : ইউনাইটেড কিংডম (Class System : UK)

মধ্যযুগে ইংলন্ডে জাতি ব্যবস্থার মত ত্রিস্তর সম্প্রদায়ে গোটা সমাজ বিভক্ত ছিল।

- প্রথম সারি বা অভিজাত সম্প্রদায় : সে কালে ১৫০টি অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত পরিবার ছিল যা সমগ্র ইংলন্ডের জন সমষ্টির মাত্র ৫শতাংশ কিন্তু এদের হাতেই ছিল যাবতীয় ভূসম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। ফলে এঁরা ছিলেন পরম ঐশ্বর্য্যশালী।
- দ্বিতীয় সম্প্রদায় বা যাজক শ্রেণী : যাজকরা গির্জার অধীনে থাকা ভূমি ও সম্পত্তির থেকে ভাতা প্রাপ্ত হতেন।
- মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় : বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ ক্রীতদাসবৎ বা দায়বদ্ধ কৃষকের মত উচ্চবিত্তের জমিতে কাজ করতেন, এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অনিশ্চিত কেউ বা হয়ত বিদ্যালয়ে যাবার বা সামান্য পড়াশুনার সুযোগ পেতেন। এঁরাই হলেন তৎকালীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

এই সময় শিল্পবিপ্লব একটি আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। অর্থনীতির অভ্যুত্থান ঘটে। শহরে বসবাসকারি সাধারণ মানুষ ঈর্ষনীয় ভাবে অর্থবান হয়ে পড়ে। অর্থ, শিক্ষা, আইনসিদ্ধ অধিকার এসব চিরাচরিত সামাজিক অবস্থান এবং বর্ণ প্রথায় পরিবর্তন আনে। কিন্তু অতীতের রাজতন্ত্র সেখানে আজও সামাজিক পরম্পরা বজায় রেখে চলেছে।

বর্ণবৈষম্য : দক্ষিণ আফ্রিকা (Apartheid : South Africa)

দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজ নিকট অতীতেও বর্ণবৈষম্যে যা কিনা বর্ণবিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এটি অবশ্য এখন অনেকটা কেটে গেছে। যদিও বর্ণ বিদ্বেষ পৃথিবীর নানা দেশে হঠাৎ হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

শ্রেণীহীন সমাজ : একটি পরীক্ষা যা কার্যকর হয়নি পূর্বতন (ইউ.এস.এস.আর) [Classless Society : The Experiment that failed (Former USSR)]

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন (ইউ.এস.এস.আর) দাবী করে যে সামাজিক শ্রেণী কাঠামো অবলুপ্ত করে তারা এক শ্রেণীহীন সমাজ তৈরী করতে পেরেছিল এবং এই পুনর্গঠনের হয়েছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা কারখানা এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তিগুলিকে ব্যক্তির হাত থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। ১৯১৭ থেকে ১৯..... পর্যন্ত কমিউনিষ্ট শাসনকালে সে দেশে কোন সামাজিক বৈষম্য ছিল না। কিন্তু অতীতের ইউ.এস.এস.আর একটি ভিন্ন ধরনের শ্রেণী কাঠামো তৈরী করেছিল তা এই রকম ঃ

- সবার ওপরে ছিলেন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মিগণ
- এরপর বুদ্ধিজীবি ও পেশাদার শ্রেণী
- অতঃপর শ্রমিক শ্রেণী এবং
- সবশেষে ক্ষুদ্র চাষী ও গ্রামের মানুষ

উপরি উল্লিখিত বিভিন্ন বর্গের মানুষের জীবনযাত্রার মানও ছিল ভিন্ন।

১.৪ সময়ের সাথে সমাজ (SOCIETY IN TIME)

১.৪.১ খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে সাইবারনেটিক্স যুগ (From the Age of Food Gathering Stage to the Age of Cybernetics)

প্রাচীন মানুষ ছিল পরিবেশের একটি জীব। ক্রমে ক্রমে মানুষের দৃঢ় মনস্কতা তাকে শারীরিক ধকল নেওয়া থেকে মুক্ত করে এবং দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যাবহার রপ্ত করতে শেখে। শারীরিক ধকল কম হওয়ার ফলে তার মস্তিষ্কের এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পাশাপাশি তার বোধশক্তি উন্নতি তথা কল্পনা শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটে। এইভাবে দক্ষতার মাধ্যমে অপরীসীম বলীয়ান হয়ে এবং বুদ্ধির যথাযোগ্য চর্চা এবং প্রয়োগ ঘটিয়ে একদা যে মানুষ প্রকৃতির একটি জীব মাত্র ছিল ক্রমশ সেই মানুষ-ই প্রকৃতিকে নিজের বশে নিয়ে আসে এবং আপন পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আজ মানুষের চারপাশের পরিবেশ যেমন মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সবই মানুষের নিজে হাতে তৈরী। মানুষ এ-সবই করেছে তার চিন্তাভাবনা ইচ্ছা, বিচারবুদ্ধি এবং কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে। এর পেছনে আছে তার পরিবার, সমাজ, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ভাষাগত এবং প্রযুক্তিগত প্রভাব। মানুষের চেতনা, অবচেতনা এবং অতিসচেতনা এই ধরনের মানসিক গঠন এবং একই সঙ্গে তার ধারনা, জ্ঞান, সদিচ্ছা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং জাগতিক পরিকাঠামো তার চারপাশের পরিবেশকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ত্রিশ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে মানুষ ক্রমানুসারে উন্নতির পাঁচটি স্তর পার হয়ে এসেছে। এই স্তরগুলি হল ঃ

- শিকার এবং সংগ্রহ
- উদ্যান পালন এবং মেষপালন
- কৃষিকাজ
- শিল্প স্থাপন
- প্রযুক্তি

ত্রিশ লক্ষ বছর ধরে মানুষের অস্তিত্ব আসলে ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং দৈনন্দিন জীবনে জাগতিক বস্তুর প্রয়োজন এবং তার জোগানেরই ইতিহাস। এটি যেন মানুষের স্বচ্ছল থেকে আরও স্বচ্ছল হওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্খার একটি জীবন্ত কাহিনি।

খাদ্য সংগ্রহের যুগ (Age of Food Gathering Stage)

মানব সমাজে আদি এবং প্রাচীনতম উৎপাদনশীল প্রযুক্তি হল **শিকার** ও সংগ্রহ সেই সময় মানুষ পশু শিকার এবং ফল-মূল সংগ্রহের জন্য অতি সাধারণ কিছু অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল। ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বহু দেশে লুপ্ত প্রায় কিছু মানব প্রজাতির মধ্যে আজও এই ধরনের জীবন যাপন দেখা যায়। আদি মানুষের ক্ষেত্রে পেশী শক্তিই ছিল একমাত্র শক্তির উৎস। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে এই শক্তিক্ষয় পূরণ করা হয়। খাদ্যকে পেশী শক্তিতে রূপান্তরিত করাই জীবন্তরে শক্তি প্রবাহকে অক্ষুন্ন রাখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল, কারণ তখনও পর্যন্ত মানুষ ছিল পরিবেশের একটি জীব মাত্র এবং জীবজগতে খাদ্য শৃঙ্খলের একটি যোগ সূত্র।

পশুশিকার, মাছ ধরা, আহার্য্য ফল সংগ্রহ শাক-পাতা, মুল, কন্দ এ-সবই ছিল খাদ্যের প্রধান উৎস এবং রসদ। এর জন্য তারা যে অস্ত্র ব্যবহার করত তা তৈরী হত শক্ত প্রস্তর খন্ড, বা অন্য কোন জন্তু জানোয়ারের শক্ত কঙ্কালের অংশ দিয়ে। এরা ছিল খাদ্য সংগ্রহ যুগের মানুষ। খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শিকারী মানুষের প্রয়োজন হত শিকার টিকে ঝলসে খাওয়ার উপযোগী করে তোলার এবং এইভাবে সে আগুনকে ব্যবহার করতে শেখে। কাঠকে প্রজ্জ্বলিত করেই মানুষ আগুন জ্বালাতে আরম্ভ করে।

উদ্যান পালন এবং মেষপালন যুগ (Age of Horticulture and Pastoralism)

উদ্যান পালন এবং মেষ পালন যুগের সূচনা হয় যখন থেকে মানুষ ছোটখাটো হস্তদ্বারা ব্যবহার্য যন্ত্রের সাহায্যে মাঠে শস্য ফলাতে শেখে এবং বন্য জন্তুকে পোষ মানাতে আরম্ভ করে সেই সময় থেকে। মানুষের প্রায় দশ লক্ষ বছর সময় লেগেছিল শুধু মাত্র খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে বন্য প্রাণীকে নিজ অধীনে এনে গৃহ পালিত করা এবং উদ্যান পালনের যুগে উত্তীর্ণ হতে। উদ্যান পালন এবং পশুপালনের কায়দা মানুষ আজ থেকে বড়জোড় ২০ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগে রপ্ত করেছে। আহার্য্য ফলটি খেয়ে তার বীজটি নিজেদের বসতির আসেপাশে খোলা জমিতে নিক্ষেপ করার পর তার থেকে আবার যখন নতুন গাছ / উদ্ভিদ গজাতে দেখে হয়ত এইভাবেই আদিম মানুষ প্রথম চাষবাসের উপায়টিকে আবিষ্কার করে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনেই বোধ হয় মানুষ হুল, শাবল, গাঁইতি ইত্যাদি বানাতে শেখে এবং ভূভাগের উর্বর অঞ্চলের ওপর তা প্রয়োগ করে। অপেক্ষাকৃত রুক্ষ অঞ্চলে শিকার করতে করতেই মানুষ হয়ত বন্য পশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করতে শেখে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় এমন বহু সমাজের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা কৃষি কার্য্য ও পশুপালন দুই-ই সমানভাবে করত। উদ্যান বা বাগিচা এবং পশুপালন থেকে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হওয়ার ফলে মনুষ্য সমাজ সংখ্যায় এবং আয়তনে বাড়তে থাকে। যদিও যারা পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা কিছুদিন অন্তর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করত। এদের জীবন ছিল যাযাবরের মত কিন্তু বাগিচা এবং ফলনের সাথে যারা যুক্ত ছিল তাদের সমাজের শিকড় যেন চাষের জমির গভীরেই প্রোথিত হয়ে যেত ফলে তারা বিশেষ একটা স্থান পরিবর্তন করত না এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করত। এই ধরনের সমাজে উত্তরাধিকার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সমাজের কিছু পরিবার প্রচুর পরিমাণে বিত্তশালী ছিল দেখা যায়। খাদ্য দ্রব্যের পর্যাপ্ত অতিরিক্ত উৎপাদন হওয়ার ফলে মানুষ অন্যান্য হাতের কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য এবং পৌরোহিত্য যজমানী ইত্যাদিকে সর্বক্ষণের পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে।

কৃষি যুগ (Age of Agriculture)

উদ্যান বা বাগিচা পালন এবং পশুপালন থেকে কৃষি কার্যে ব্যাপৃত হওয়া মানুষের জীবনে একটি উন্নত পদক্ষেপ। লাঙ্গল আবিষ্কারের পরই কৃষিকার্য বিকাশ লাভ করতে থাকে। পশুর সঙ্গে লাঙ্গল জুড়ে দেয়ার ফলে মাটির ভালভাবে কর্ষণ হয়। এবং পরবর্তী স্তরে এটি দীর্ঘদিন ধরে চাষযোগ্য জমিতে পরিণত হয় যেখানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যে উৎপাদনের ফলে হাজার হাজার লোকের উপকার হয়েছে। এটি মানব সমাজকে আরও বেশী সংখ্যায় এবং দীর্ঘমেয়াদী ভাবে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দেয়। কৃষি কার্যের মাধ্যমে মানুষ নূতন পথে প্রাকৃতিক শক্তি প্রবাহের মধ্যে নিজের স্থান করে নেয়। খাদ্য আহরণ রান্নার জন্য আগুন জ্বালানোর পাশাপাশি পণ্য সামগ্রী পরিবহন এবং মৃত্তিকা কর্ষণের জন্য মানুষ পশু শক্তিকে কাজে লাগাতে শেখে। কৃষিকার্য্য এবং পশু

পালন পাশাপাশি চলতে থাকে। এরপর আরো উন্নতি করার সাথে সাথে মানুষ জল এবং বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে হাওয়া কল, নৌকার পাল জলপ্রপাত চালিত কল ইত্যাদি বানাতে আরম্ভ করে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা কৃষি কার্যে যুক্ত নয় যে সব মানুষ তাদের নগর উন্নয়ন মুখী করে তোলে। কৃষিকার্যের সাথে সাথে মানব সভ্যতারও বিকাশ ঘটতে থাকে। গুজরাট উপকূলের অদূরে কাম্বের খাঁড়ি অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে নিমজ্জিত যে প্রাচীন শহর আবিষ্কৃত হয় তা খৃষ্টজন্মের ৭৫০০ বছর আগের, এটি আবিষ্কারের ফলে বলা যায় যে মানব সভ্যতার উৎস ছিল ভারতবর্ষ। কাম্বে অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া সমাজের সমসাময়িক অন্যরা তখনও ছিলেন শিকারি শ্রেণীর এবং সবে মাত্র কৃষি কার্য শুরু করতে শুরু করেছেন এই পর্যায়ের।

শিল্প বিপ্লবের যুগ (Age of Industrial Revolution)

বাষ্প চালিত ইঞ্জিনের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে শিল্প বিপ্লবের সূচনা ঘোষিত হয়। শিল্পে নিযুক্ত মানুষের শিল্প বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে যে বিপুল পরিমাণের শক্তির প্রয়োজন হয়, মানুষ বহুযুগ ধরে কেন্দ্রীভূত প্রাকৃতিক জীবাশ্ম যেমন জ্বালানীতেল, কয়লা, এবং প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি থেকে সেই শক্তি আহরণ করে। শুধুমাত্র জীবাশ্মে পরিণত জ্বালানী নয় মানুষ অন্যান্য শক্তি উৎসকেও ব্যবহার করে থাকে এর মধ্যে অন্যতম হল জলসম্পদ এবং আনবিক শক্তি যা কাজে লাগিয়ে মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে সৌরশক্তি, আগ্নেয়গিরি থেকে উৎপন্ন তাপ শক্তি এবং উষ্ণপ্রস্রবণকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগান হয়।

কৃষি নির্ভর সমাজে জমির হাতবদল এবং তাকে ব্যবহার করাই ছিল প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। কিন্তু শিল্প নির্ভর সমাজে যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার যথাযথ ব্যবহারই ছিল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান অঙ্গ। এই সময় থেকে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বাড়তে থাকে.এবং এটি ক্রমশ সার্বজনীন হয়ে পড়ে।

সাইবারনেটিক্স যুগ (Age of Cybernetics)

অতিদ্রুত গতিতে কার্যক্ষম বৈদ্যুতিন গণকযন্ত্র (Electronic Computer) তথা প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটিয়ে সাইবারনেটিক্স যুগের সূচনা করে। মাত্র দশ থেকে পনের হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকার্য পদ্ধতির আবিষ্কার করে, সেই তুলনায় তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লব পৃথিবীতে শুরু হয়েছে মাত্র তিন/চার দশক আগে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ধারাবাহিক পটপরিবর্তন হয়েছে এই ভাবে --- জমির হাতবদল থেকে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যুগ এবং যন্ত্রযুগ থেকে আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি; যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায় অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত দক্ষতা মানব সমাজকে আদিকালে খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে ধারাবাহিক ভাবে আজকের সাইবারনেটিক্স যুগে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে একধরনের শাসানি দিয়ে চলেছে।

১.৪.২. আদিম সমাজ (Primative Society)

আদিম যুগে মানুষ নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য পার্বত্য গুহা-গহ্বর জঙ্গলের গাছ ইত্যাদিকে আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করত। অন্য জীবজন্তুদের অস্তিত্ব রাখার মত আদিম যুগের মানুষকেও প্রতিদিন শিকারের খোঁজে বেরতে হত। আদিম যুগের মানুষের বৈশিষ্টগুলি হল ঃ

১) আদিম মানুষ পরিবার নিয়ে পার্বত্য গুহা-গহ্বর বা জঙ্গলের গাছ ইত্যাদি প্রাকৃতিক আশ্রয়ের মধ্যে বসবাস করত।

২) অতিসাধারণ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আদিম মানুষের জীবন ধারণের দক্ষতাও ছিল সীমিত। আদিম মানুষ প্রস্তর খন্ডের সাহায্যে ছোট খাটো কিছু অস্ত্র বানাতে শিখেছিল যা তারা শিকার এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করত।

৩) আদিম মানুষ সবসময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বন্য জন্তুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে থাকত।

৪) আদিম মানুষে সুসংহত রূপে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভাবে সংগঠিত ছিল না।

৫) আদিম মানুষের ভাষা এবং ভাব বিনিময়ের দক্ষতাও সীমিত ছিল।

৬) আদিম মানুষের মস্তিষ্ক এতটা উন্নত ছিল না।

১.৪.৩ আধুনিক সমাজ (Modern Society)

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞান এবং প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবনের মধ্যে আবদ্ধ।

শিল্পায়ন, নগরায়ন, দ্রুত গতির যানবাহন, তাৎক্ষনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নাগরিকদের হিতার্থে গঠিত সরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বায়নের ফলে আজ মানুষের জীবনে সামগ্রিক পরিবর্তন এসেছে।

আধুনিক সমাজের মানুষ আজ জীবনের সকল প্রকার স্বচ্ছন্দ যেমন আরামদায়ক গৃহ, বিদ্যুৎ, যানবাহন এবং টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা এ সবই উপভোগ করছে। আজকের মানুষ আধুনিক যুগের নিম্নলিখিত সুবিধা গুলি গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে ঃ

১) আধুনিক মানুষ আরামদায়ক নগরজীবন উপভোগ করছে।

২) প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ উন্নত মানের বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতা অর্জন করেছে।

৩) সম্পত্তির সুরক্ষার অধিকার অর্জনের মাধ্যমে আজকের মানুষ নিজের জীবনকে অনেক বেশী স্বস্তিদায়ক এবং সুরক্ষিত করতে পারছে।

৪) আজকের মানুষ বিদ্যালয়, গির্জা, সরকার, ব্যাঙ্ক এমন কি পরিবার প্রথার মত সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সুফল ভোগ করছে।

৫) জীবনের উচ্চ মান ধরে রাখার জন্য এবং তাকে উপভোগ করার জন্য আজকে মানুষের কাছে ভাল পরিবেশ এবং সম্পত্তি রয়েছে।

৬) সামাজিক এবং আর্থিক প্রেক্ষিতে আজকের মানুষ অনেক বেশী সচল।

৭) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা কাজে আজকের মানুষ অনেক উন্নত মানের যন্ত্রপাতি যেমন কম্পিউটার বা গণক যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করছে।

আধুনিক সুসভ্য মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (The characteristics of the modern civilised and cultured man)

আধুনিক সুসভ্য মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল এই রকম ঃ

- সে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং অর্জিত দক্ষতার মাধ্যমে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে।

- সে স্বস্তিদায়ক জীবন যাপন এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রযুক্তি কে কাজে লাগাতে পারে।
- সে নিজেকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্ত দিক থেকে সুসংগঠিত করতে পারে।
- নিজ পরিবারের সদস্য এবং নিজ গোষ্ঠীর /সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং একে অন্যের সমস্যা সঙ্কটকে ভাগ করে নেওয়ার দক্ষতায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।
- সে তার নিজের সম্প্রদায়ের সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল থাকবে এবং তার নিজের মধ্যে শুভবুদ্ধি এবং সামাজিক দায়িত্ব সচেনতার উন্মেষ ঘটাবে।
- সে জীবন যাত্রার উন্নততর মান সুনিশ্চিত করার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্খাগুলিকে পুনর্বিবেচনা করবে।

১.৪.৪ সামাজিক চক্র (The Cycle of Society)

মনুষ্য সমাজের বিবর্তন চিরকাল তার মানসিক পরিবর্তনের দ্বারা পরম্পরাগত ভাবে নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। ইওরোপীয় বিশেষত জার্মান ইতিহাসের ভিত্তিতে তাত্ত্বিক ল্যামপ্রেষ্ট (Lamprecht) মনে করেন যে মানব সমাজের উন্নতি হয়েছে কয়েকটি নির্দিষ্ট মনস্তাত্বিক স্তরের মধ্যে দিয়ে। তিনি এই স্তরগুলিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

- প্রতীকী
- স্বভাবসুলভ
- চিরাচরিত
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক
- বিষয় ভিত্তিক

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির যাথার্থতা বিশ্লেষণ করে শ্রী অরবিন্দ তাঁর "মানব চক্র" (The Human Cycle) নামক সুসংবদ্ধ নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন "এই ধরনের উন্নতি এক প্রকার মানসিক চক্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় এবং একটি জাতি বা সভ্যতা এই চক্রের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য। অবশ্যই উপরে উল্লিখিত শ্রেণী বিন্যাসগুলির মধ্যে কাঠিনাতা থাকতে পারে এবং ভুল ভ্রান্তিও থাকা অসম্ভব নয়, কারণ প্রাকৃতিক খামখেয়ালীপনা বা আঁকাবাঁকা চরিত্রের কারণে এটা হওয়া স্বাভাবিক। সমাজও মানুষের মনস্তত্ত্ব আসলে অত্যন্ত জটিল এবং বহু মাত্রিকতার সংমিশ্রণ যার ফলে এই ধরনের অন্তঃমিশ্রিত ধারণা গুলির এক আপাতগ্রাহ্য বিশ্লেষণের প্রবনতা দেখা যায়। মনস্তাত্বিক চক্রের যে তত্ত্ব তা কিন্তু কখনই ক্রমবিকাশমান পর্যায়গুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বা ধারাবাহিক প্রয়োজনীয়তা এবং তার শুরু ও শেষ কোথায় সে বিষয়ে কোন দৃঢ় ধারণা দেয় না। কিন্তু মনোজগৎ এবং বস্তুজগতের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি এবং নিয়ম অনুধাবন করার জন্য এদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। যদিও মনোজগতের এবং বস্তুজগতের উপদানগুলিকে আক্ষরিক অর্থে আলাদা ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন আমি পশ্চিমি চিন্তাবিদদের ধারণা তাঁদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। এগুলিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে যে সব নাম উপদেশ রূপে পাওয়া গেছে আমরা যদি তাদের অন্তর্নিহিত মূল্য বোধ গুলিকে বিশ্লেষণ করতে পারি তাহলে হয়ত দৃঢ়ভাবে

আচ্ছাদিত আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ওপর কিছুটা হলেও আলোকপাত করবে, এবং এটিই সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানের সনাতন পথ।"

"This development forms, then, a sort of psychological cycle through which a nation or a civilisation is bound to proceed. Obviously, such classifications likely to err by rigidity and to substitute a material straight line for the coils and zigzags of Nature. The psychology of man and his societies is too complex, too synthetical of many-sided and intermixed tendencies to satisfy any such rigorous and formal analysis. Nor does this theory of a psychological cycle tell us what is the inner meaning of its successive phases or the necessity of their succession or the term and end towards which they are driving. But still to understand natural laws whether of Mind or Matter it is necessary to analyse their working into is discoverable elements, main constitutents, dominant forces, though these may not actually be found anywhere in isolation. I will leave aside the western thinker's own dealings with his idea. The suggestive names he has offered us, if we examine their intrinsic sense and value, may yet throw some light on the thickly veiled secret of our historic evolution, and this is the line on which it would be most useful to investigate."

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যখনই প্রাচীন মনুষ্য সমাজকে নিরীক্ষণ করতে চাই তখন সেই সময়কার মনুষ্য জাতি সভ্য ছিল না বন্য ছিল অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর না অনগ্রসর ছিল সে সব বিচার করার আগে যেটি বেশী করে আমাদের চোখে ধরা দেয় তা হল একটি সাংকেতিক মানসিকতা যার দ্বারা সমস্ত চিন্তা, নিয়ম এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সংকেত, কিন্তু সেটি কিসের বা কী ধরনের? আমরা দেখি যে এই সময়ের সমাজ অনেক বেশী ধর্মনির্ভর এবং কল্পনাধর্মী, এবং এই ধর্মীয় বোধের উপর নির্ভর করে বিশেষত কিছু স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক রূপকল্পকে আশ্রয় করে ধর্ম এবং সমাজ এক সাথে চলেছে। এরপর মানুষ যখন ক্রমে বুদ্ধি নির্ভর, বিচার নির্ভর এবং পরীক্ষা নির্ভর হতে লাগল তখন থেকেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজের সূচনা হতে থাকে। এই সময় থেকেই সংকেত এবং চিরাচরিত নিয়ম নির্ভর জীবন ধারা সমাজ থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে থাকে। তখন থেকে মানুষ সংকেত বা সাংকেতিক চিহ্ন বা মূর্তি গুলির অস্তিত্ব তার দৈনন্দিন জীবন ও তার কার্যকলাপের পশ্চাৎপটের এক অদৃশ্য ব্যক্তি রূপে গণ্য করে থাকে যে দিব্য চেতনা, ঈশ্বর, যা সুবিশাল এবং সুগভীর, অনামী, লুক্কায়িত অথচ জীবন্ত একটি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বস্তু। তার জীবনের সমস্ত ধর্মীয় এবং সামাজিক ভিত্তি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং অধ্যায় তার কাছে সংকেতবহ যার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জ্ঞান এবং চিন্তা ধারাকে প্রকাশের পথ খোঁজে এক ধরনের বিস্ময়কর বোধ যা পিছন থেকে তার জীবনকে আকার দিচ্ছে এবং তার গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

"এই সাংকেতিক ভাবভঙ্গি থেকেই সমাজের সবকিছুকেই ধর্মীয়, পবিত্র, প্রতীক নির্ভর বলে ভাবার বা দেখার ধরন চালু হয়। যদিও এই ধরনের ভাবনা চিন্তার মধ্যে অনেক ধরনের স্বাধীনতা ছিল, যে স্বাধীনতা আমরা আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাইনা, কারণ তারা ইতিপূর্বে প্রতীক, সংকেত ইত্যাদি পেরিয়ে চিরাচরিত জীবন যাত্রার স্তরে এসে পৌঁছেছিল যদিও এই বিবর্তন উন্নতির পরিবর্তে অবক্ষয়ের দিকেই ঝোঁক নেয়। প্রতীক নির্ভর, অন্ড় ধর্মীয় রীতিনীতি ছিল আধ্যাত্মিক ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে সামাজিক রীতিনীতিগুলি নিয়ত উন্নতির প্রতি যুক্ত ছিল। এর মধ্যে একটা ব্যাপার যা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে চলেছিল সেটি হল মনস্তত্ত্বগত বিষয়গুলি। তাই

আমরা প্রথমে চার রকমের প্রতীক নির্ভর ধারণা দেখতে পাই। —ভাব প্রকাশের জন্য কিছু কাল্পনিক চিত্রলিপি নির্ভর ভাষা বৈদিকযুগের চিন্তাবিদেরা খুব সম্ভবত যেগুলির অর্থ বুঝতে পারেন নি, কিন্তু আধুনিক যুগকে বুঝতে এগুলি অত্যন্ত সাহায্য করেছে - - যথা মানুষের মধ্যে দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য আনন্দ এবং সহমত, দিব্য কর্ম, বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং কাজ। এই ধরনের বিভাজন থেকে চারটি মহাজাগতিক সূত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যেমন -- যে মহাবোধ যাবতীয় জাগতিক বস্তুর ক্রম এবং নীতি নির্ধারণ করে, যে ক্ষমতা তাকে অনুমোদন করে, তুলে ধরে এবং আরো শক্তিশালী করে, যে ঐক্য তার বিভিন্ন অংশগুলিকে প্রস্তুত করে এবং সাজায় এবং পরিশেষে সেই কাজ যা বিনির্দিষ্ট হয়ে আছে তার সম্পাদন। এই ধারণাগুলির থেকে একটি সুনিশ্চিত /দৃঢ় অথচ অনমনীয় নয় এমন একটি সামাজিক ক্রমপর্যায় তৈরী হয়, প্রাথমিক ভাবে যেটি মানসিকতা এবং দৈহিক গুণ এবং সেই সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যদিও এই ক্রিয়াকলাপগুলি নির্দিষ্ট হয় এটি কিভাবে এবং কার উপকারে লাগবে তার ভিত্তিতে। এটিই প্রাথমিক বা একমাত্র উপাদান নয়।"

"From this symbolic attitude came the tendency to make everything in society a sacrament, religious and sacrosanct, but as yet with a large and vigorous freedom in all its forms, - a freedom which we do not find in the rigidity of 'savage' communities because these have already passed out of the symbolic into the conventional stage though on a curve of degeneration instead of a curve of growth. The spiritual ideal govern all; the symbolic religious forms which support it are fixed in principle; the social forms are lax, free and capable of infinite development. One thing, however, begins to progress towards a firm fixity and this is the psychological type. Thus we have first the symbolic idea of the four orders, expressing - to employ an abstractly figurative language which the Vedic thinkers would not have used nor perhaps understood, but which helps best our modern understanding - the Divine as knowledge in man, the Divine as power, the Divine as production, enjoyment and mutuality, the Divine as service, obedience and work. These divisions answer to four cosmic principles, the Wisdom that conceives the order and principle of things, the Power that sanctions, upholds and enforces it, the Harmony that creates the arrangement of its parts, the Work that carries out what the rest direct. Next, out of this idea there developed a firm but not yet rigid social order based primarily upon temperament and psychic type (*guna*) with a corresponding ethical discipline and secondarily upon the social and economic (*karma*) function. But the function was determined by its suitability to the type and its helpfulness to the discipline; it was not the primary or sole factor."[11]

ভারতীয় এবং বিশ্বজনীন প্রেক্ষিতে শ্রী অরবিন্দ বর্ণিত ছয়টি স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

মনস্তাত্ত্বিক স্তর (Psychological Stage)	*বৈশিষ্ট্যসমূহ* (Characteristics)
প্রতীকী (Symbolic)	ভীষণভাবে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক। অন্যান্য উপাদানগুলি হ'ল মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক, তবে এগুলি হল আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ধারণার অধীনস্থ কয়েকটি উপাদান।

মনস্তাত্ত্বিক স্তর (Psychological Stage)	*বৈশিষ্ট্যসমূহ* (Characteristics)
স্বভাবসুলভ (Typal)	এটি ভীষণভাবে মনস্তত্ত্ব এবং নৈতিকতা নির্ভর। অন্য সবকিছু এমন কী ধর্মবিষয়ক উপাদানগুলিও মনস্তাত্ত্বিক ধারণার অধীন। ধর্ম তখন নৈতিক উদ্দেশ্যে এবং শৃঙ্খলাকে অনুমোদন করে। ধর্মই তখন সমাজের প্রধান কার্যকরী উপাদান হয়ে দাঁড়ায় বাকি সব আরো বেশী করে জগৎমুখী হয়ে পড়ে। দিব্য ভাবের সরাসরি প্রকাশ মানুষকে ক্রমশ আড়ালে নিয়ে যায়। সে তখন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব এ সবের ধার ধারে না। এই ধরনের বিশেষ স্তর মানুষের মনে এক মহৎ সামাজিক চেতনার সৃষ্টি করে যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যায়।
চিরাচরিত (Conventional)	বহির্বিশ্বের তাড়নায় যখন আত্ম চেতনার বহিঃপ্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মনুষ্য সমাজে তখনই এই স্তরটির জন্ম হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে শরীর এমন কী পরিধেয় বস্ত্র যেমন হয়ে ওঠে ব্যক্তির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে, চিরাচরিত স্তরের প্রকৃতি হল গতানুগতিক ধর্মভাব শক্ত ভাবে বজায় রাখা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অপরিবর্তনীয় ধরনটিকে ধরে রাখা, এবং পরিশেষে মানুষের জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপের ছাপ দেওয়া।
ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individualistic)	একটা সময় আসে যখন চিরাচরিত এবং প্রকৃত সত্যের মধ্যে অসহনীয় দুস্তর এক ব্যবধান দেখা দেয় এবং তখনই মানুষের বুদ্ধিমত্তার উদয় হয়। সে তখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কখনও বা হয়ত রোধান্বিত হয়ে প্রতীক, স্বভাবসুলভ এবং চিরাচরিত প্রথা এবং ধ্যানধারনা কে বর্জন করে। যেন রুদ্ধ কারাগারের দেওয়ালে আঘাত করে নৈতিক বোধ, আবেগ তাড়িত বাসনা, এবং চিরায়ত সত্য যা সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজতে থাকে। এই ভাবেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ম ও চিন্তা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে ওঠে। এই সময়েই প্রতিবাদী প্রগতিশীল, যুক্তিগ্রাহ্য এবং মুক্তিকামী যুগের সূচনা হয়।
বিষয় ভিত্তিক (Subjective)	সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার যাথার্থতা, তার নিয়ম ইত্যাদিকে খুঁজতে মানুষকে তার নিজের মধ্যে যে বিষয় ভিত্তিক অতলস্পর্শী গভীরতা গোপন রয়েছে তার অতলে ডুব দিতে হবে এবং একই সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক বস্তুগত জগৎকেও বুঝতে হবে। এ যেন মানব সভ্যতার ঘূর্ণায়মান চক্র যেখানে মানুষ নিজেকে বোঝার জন্য কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে তার নিজস্বতার গভীরে গিয়ে তাকে নতুন করে খুঁজে আরো ঊর্ধ্বমুখী একটি পথ রেখার সন্ধান পায়।

১.৫ বর্বরতা এবং সভ্যতা (BARBARISM AND CIVILIZATION)

১.৫.১ বর্বরতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Barbarism)

বর্বরযুগে মানুষ বন্য প্রাণীর মত জীবন যাপন করত। নিজ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্ব-অস্তিত্বরক্ষার জন্য এবং তদজন্য কিছু চাহিদা পূরনের হেতু মানুষ বন্য স্বভাবের কিছু কিছু জৈবিক জাতিপ্রকৃতির দ্বারা চালিত হত। বর্বর যুগে মানুষের মধ্যে যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায় তা হল ঃ

১) পরিবেশের জীব এবং বন্য প্রাণীর ন্যায় জীবন যাপন করে,
২) সে খাদ্যের খোঁজে যে কোন বন্য প্রাণীর ন্যায় চলা ফেরা করে।
৩) সে নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি স্ব অস্তিত্ব রক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি জৈবিক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়,
৪) সে মানসিক ভাবে উন্নত ছিল না,
৫) পারিবারিক জীবন, ধর্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার অতি সামান্য ধারণা ছিল,
৬) তার না ছিল সামাজিক রীতি নীতি না ছিল কোন নৈতিক চেতনা।

১.৫.২ সভ্যতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট (Characteristics of Civilization)

বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বস্তু থেকে জীবনের উৎপত্তি এবং জীবন থেকে মানুষের মাধ্যমে বুদ্ধি মত্তার উত্তরণ হয় - যার বৈজ্ঞানিক নাম " হোমোসেপিয়ানস্" ক্রমে মানুষ তার নিজ এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়। সে দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত নানান সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সেই সব সমস্যার সমাধানও খুজে পায়। এভাবেই মানুষ যে প্রকৃতির জন্য চিন্তাশীল জীব তার জীবনে এক মন সামাজিক স্তরের বা অধ্যায়ের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের মানব সভ্যতার জন্ম দেয়। বহু বছরের কঠিন সংগ্রাম নানা প্রকারের সন্ধান এবং পারিপার্শ্বিক সমস্যার অনুসন্ধান ও তার সমাধানের মধ্যে দিয়ে আজকের সভ্য সমাজ জীবনের বিকাশ ঘটে। "সাধারণ এবং জনপ্রিয় অর্থে সভ্যতা মানে" শ্রী অরবিন্দ বলেন "সভ্য সমাজের অবস্থান, তার পরিচালন, সংগঠন, সংরক্ষণ, শিক্ষণ এবং তার প্রয়োগ এ সকলের সমাহার অন্যত্র যার দেখা মেলে না।"

বর্বরতা এবং সভ্যতার জন্য নিচের ক্ষেত্রটি দেখুন

বর্বরতা এবং সভ্যতা (Barbarism and Civilization)

বর্বরতা সমাজের এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ তার শরীর এবং জীবন নিয়েই ব্যস্ত, তার অর্থনৈতিক এবং দৈহিক অস্তিত্ব এবং সর্বপ্রথমে তাদের যথোপযুক্ত পরিচর্যা এসবই মূল বিষয় এক্ষেত্রে মানসিকতার উন্নতির প্রায় কোন প্রাধান্যই নেই। অন্যদিকে সভ্যতা হল আর্থ সামাজিকতার এক সুসংঘবদ্ধ অবস্থা যেখানে মানসিক কার্যক্রমও জীবনের সাথে জড়িত এবং একটি প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য হয় যা পুরোপুরি না হলেও সমাজের বেশীরভাগ অংশ জুড়ে থাকে। কখনও হয়ত এসবের কিছু অংশ তাদের অক্ষমতার জন্য সাময়িক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে একপাশে সরে থাকে। যদিও সমাজ হয়ত সভ্য বা অতিমাত্রায় সভ্য। এই ধারণা সমস্ত সভ্যতার ইতিহাস

এবং প্রাগৈতিহাসিকতার ক্ষেত্রে সত্য সে আফ্রিকা, ইওরোপ, এশিয়া, গল, গথ, ভ্যান্ডাল বা তুর্কমেনীয় যে সভ্যতাই হোন না কেন বর্বরতাকে একপাশে সরিয়ে রেখে সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসেই এক জিনিস লক্ষ্য করা যায়। এটি অবশ্য স্বীকার্য যে বর্বরতার কোন এক স্তরের মধ্যেই বোধ হয় অত্যন্ত কর্কশ ভাবে সভ্যতার সূচনা হয়। এটিও অতি স্বাভাবিক যে একটি সভ্য সমাজে প্রচুর পরিমাণে বর্বরতা বা তার কিছু অবশিষ্টাংশ থেকে গেলেও থেকে যেতে পারে। সেই অর্থে সকল সমাজই আধা-সভ্য। আজকের সভ্যতাকে ভবিষ্যতের আরো উন্নত মানবিকতা এবং মানব সমাজ কতটা বিস্ময় এবং বিরক্তি নিয়ে এর সমস্ত সংস্কার এবং ত্রুটিপূর্ণ সভ্যতাকে যাচাই করবে এবং প্রাচীনপন্থী আখ্যা দিয়ে তাকে পিছনে ফেলে রাখবে সে কথা কে বলতে পারে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে কোন সভ্য সমাজে মানুষের মনকে হতে হবে গতিশীল, কর্মময়, মানসিকতার উন্নতি এবং বিকাশ ও তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার জীবন তাকে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং আত্ম সচেতন মানসিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ করে তুলবে।

কিন্তু একটি সভ্য সমাজে আংশিক পরম্পরাগত ভাবে সভ্য এবং অত্যন্ত ভাবলেশহীন রকমের সভ্য এসবের মধ্যে প্রকারভেদ আছে এবং এই প্রকারভেদ গুলি সভ্য মানুষ এবং রুচিশীল ও সংস্কৃত মনস্ক মানুষের মধ্যে তফাৎ নির্দেশ করে। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে সভ্যতার উন্নতি কল্পে নিছক যোগদান করাই যথেষ্ট নয় একজন মানুষের পক্ষে নিজেকে উন্নীত করতে তার মানসিক ক্রমোন্নতি অত্যন্ত জরুরী। সাম্প্রতিক প্রজন্ম সংস্কৃতিবান এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ও একান্ত বিষয়ী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রভেদ করতে সক্ষম এবং এই দুই এর প্রকৃত অর্থ কী সে সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট পরিস্কার ধারণা আছে। সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ও একান্ত বিষয়ী ব্যক্তি যাদের ফিলিস্তিনি বলা হয় তারা বাহ্যিকরূপে একপ্রকার সভ্যজীবন যাপন করে তাদের মধ্যে নানা রকম নিয়মকানুন, আচার ব্যবহার, সংস্কার ইত্যাদির দেখা মেলে, তেমন মুক্ত বুদ্ধি, মুক্ত চেতনা সৌন্দর্য্য এ শিল্পের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তারা ধর্ম, সাহিত্য, জীবন যেখানেই হাত দেয় তাই যেন কদর্যরূপ ধারণ করে। যে কারনে "ফিলিস্তিনি" দের এক অর্থে সভ্য অথচ বর্বর বলা চলে। তারা যেন শারীরিক দিক থেকে অর্ধ সভ্য আর মানসিক দিক দিয়ে পূর্ণ রূপে বর্বর। মানসিক জীবন প্রতিনিয়ত গার্হস্থ এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনা আশা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন ফিলিস্তিনি হল মানসিকভাবে বর্বর সাধারণ অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ। তাই বলা যেতে পারে যে তার মানসিক জীবন অত্যন্ত নিম্ন মানের সেখানে মানসিক অনুভূতি আবেগ, বাস্তব ক্রিয়াকলাপ যা মস্তিষ্কে উচ্চস্তরের উপাদন সে সবের দেখা মেলে না। এতদসত্ত্বে সে হয়ত খুব সক্রিয়, শক্তিশালী, কিন্তু তার ক্রিয়াকলাপ বা শক্তির নিয়ন্ত্রণ কখনও উচ্চস্তরের হয়না তার ক্রিয়াকলাপ কখনই তাকে কোথাও উন্নীত করেনা বা কোন মুক্তির পথে নিয়ে যায় না বরং সে কোন উন্নত ভাবনা উন্নত চিন্তাকে তার স্তরে নামিয়ে আনে। তার মধ্যে নান্দনিক বিষয়গুলি স্বল্প উন্নত ..... তার নৈতিকতা অনেকটা তার অভ্যাস প্রসূত সে মানসিকভাবে যতটা না ক্রিয়াশীল তার চেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। সাংস্কৃতিক মনকে ক্ষুদ্রসংখ্যক এবং সংখ্যালঘু কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে সভ্যতা কোনদিনই নিরাপদ থাকবে না। হয় জ্ঞানের মাধ্যমে নিজেকে প্রসারিত হতে হবে নতুবা সব সময়ই অজ্ঞতার গভীরে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যত কম সংখ্যক মানুষ এই জ্ঞানের আলো থেকে দূরে থাকবে সভ্য সমাজের বা বলা ভাল সভ্যতার ততই সঙ্কট পূর্ণ অবস্থা হবে এবং এই অবস্থায় যে কোন সময় এই ধরনের সভ্যতা বর্বরতার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এই ভাবে বর্বরতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গ্রীসিয় রোমান সভ্যতা বিলীন হয়ে গিয়েছিল যদিও এর ফলে মনুষ্য সমাজে যারা সর্বহারা শ্রেণী তাদের কিছুটা

স্বস্তি এবং আনন্দ হয়েছিল কিন্তু তা কখনই আলোকে উদ্ভাসিত হয়নি। জনসাধারণ যখন প্রকৃত অর্থে আলোক প্রাপ্ত হয় তখন সে আলো বাইরে থেকে খ্রীষ্ট ধর্মের মাধ্যমে এসে পৌঁছায়। খ্রীষ্ট ধর্ম -- যা কিনা প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কাছে শত্রু সম ছিল।

জ্ঞানকে যদি নিজেকে বাঁচিয়ে এবং ধরে রাখতে হয় তবে তাকে আগ্রাসী এবং ক্ষুরধার হতে হবে। আর তা না হয়ে জ্ঞান বা শিক্ষা যদি উদাসীন হয়ে থাকে তবে তা মানবতাকে নূতন করে বিপদ সঙ্কুল বর্বরতার সম্মুখীন করে তুলবে।

..... শ্রী অরবিন্দের মানব চক্র (The Human Cycle)

BARBARISM AND CIVILISATION

Barbarism is the state of society in which man is almost entirely preoccupied with his life and body, his economic and physical existence, - at first with their sufficient maintenance, not as yet their greater or richer well-being, - and has few means and little inclination to develop his mentality, while *civilisation* is the more evolved state of society in which to a sufficient social and economic organisation is added the activity of the mental life in most if not all of its parts; for sometimes some of these parts are left aside or discouraged or temporarily atrophied by their inactivity, yet the society may be very obviously civilised and even highly civilised. This conception will bring in all the civilisations historic and prehistoric and put aside all the barbarism. Whether of Africa or Europe or Asia, Hun or Goth or Vandal or Turcoman. It is obvious that in a state of barbarism the rude beginings of civilisation may exist; it is obvious too that in a civilised society a great mass of barbarism or numerous relics of it may exist. In that sense all societies are semi-civilised. How much of our present day civilisation will be looked back upon with wonder and disgust by a more developed humanity as the superstitions and atrocities of an imperfectly civilised era. But the main point is that in any society which we can call civilised the mentality of man must be active, the mental pursuits developed and the regulation and the improvement of his life by the mental being a clearly self-conscious concept in his better mind.

But in a civilised society there is still the distinction between the partially, crudely, conventionally ***civilised*** and the ***cultured***. It would seem therefore that the mere participation in the ordinary benefits of civilisation is not enough to raise a man into the mental life proper; a farther development, a higher elevation is needed. The last generation drew emphatically the distinction between the ***cultured*** man and the ***Philistine*** and got a fairly clear idea of what was meant by it. Roughly, the Philistine was for them the man who lives outwardly the civilised life, possesses all its paraphernalia, has and mouths the current stock of opinions, prejudices, conventions, sentiments, but is impervious to ideas, exercises no free intelligence, is innocent of beauty and art, vulgarises everything that he touches, religion, ethics, literature, life. ***The Philistine*** is in fact ***the modern civilised barbarian,*** he is often the ***half-civilised physical and vital***

barbarian by his unintelligent attachment to the life of the body, the life of the vital needs and impulses and the ideal of the merely domestic and economic human animal, but essentially and commonly he is ***the mental barbarian, the average sensational man.*** That is to say, his mental life is that of the lower substratum of the mind, the life of the senses, the life of the sensations, the life of the emotions, the life of practical conduct - the first status of the mental being In all these he may be very active, very vigorous, but he does not govern them by a higher light or seek to uplift them to a freer and nobler eminence, rather he pulls the higher faculties down to the level of his senses, his sensations, his unlightened and unchastened emotions, his gross utilitarian practicality. His aesthetic side is little developed..... His ethical bent is a habit of the sense-mind, it is the morality of the average sensational man..... He is not mentally active, but mentally reactive.

Civilisation can never be safe so long as, confining the cultured mentality to a small minority, it nourishes in its bosom a tremendous mass of ignorance, a multitude, a proletariate. Either knowledge must enlarge itself from above or be always in danger of submergence by the ignorant night from below. Still more must it be unsafe, if it allows enormous numbers fo men to exist outside its pale uninformed by its light, full of the natural vigour of the barbarian, who may at any moment seize upon the physical weapons of the civilisead without undergoing an intellectual transformation by their culture. The Graeco-Roman culture perished from within and from without, from without by the floods of Teutonic barbarism, from within by the loss of vitality. It gave the proletariate some measure of comfort and, amusement, btu did not raise it into the light. When light came to the masses, it was from outside in the form of Christian religion which arrived as an enemy of the old culture.

Knowledge must be aggressive, if it wishes to survive and perpetuate itself to leave an extensive ignorance either below or around it, is to expose humanity to the perpetual danger of a barbaric relapse.

(***Extracts*** from **Sri Aurobindo's work, *The Human Cycle***)

উন্নত বনাম শিক্ষিত /রুচিশীল জাতি / যুগ (Developed versus Cultured Nation or Age)

একটি জাতি যখন তাদের নিজেদের মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প কলার উন্নতি ঘটায় তখনও কিন্তু তাদের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি যতটা না জ্ঞান, সত্য, সৌন্দর্য্য চেতনা ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার তাড়নায় তাড়িত হয়। আমরা হয়ত এক অর্থে এই সবের ভিত্তিতে একটি জাতি বা কোন যুগকে সভ্যতার আওতায় ফেলতে পারি কিন্তু এ সব কখনই একটি জাতির রুচিশীল মানবিক সত্তাকে অনুভব করায় না। অতএব উনিশ শতকীয় ইওরোপিয় সভ্যতা তার যাবতীয় বিজয় গৌরব, প্রভূত উৎপাদন, বিজ্ঞানে বিশাল উন্নতি, বুধিজীবি ও বুধিমত্তার পরিচয় বহন করে এমন বহু কাজ প্রভৃতি এক থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন তা সীমাবদ্ধ, কারণ এই সভ্যতা তার সব কিছুকেই শেষপর্যন্ত বাণিজ্যিক এবং স্বার্থ সিধিমুলক সাফল্যের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করেছে। আমরা তাই বলতেই পারি যে এটি কখনও নিখুঁত মানবিকতা বিকাশের পরিবেশ নয় যেখানে মানুষের উন্নততর বিবর্তন সম্ভব হতে পারে। সে

ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে প্রাচীন "এথেন্স এর সভ্যতা বা ইতালীয় নবজাগরণ এমন কী প্রাচীন ধ্রুপদী ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় চেয়েও উক্ত সভ্যতা ছিল অনেক নিকৃষ্ট ইওরোপীয় সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা হয়তবা সে যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, জাগতিক তথা বস্তুগত উন্নতি অর্জনে অনেক ঘাটতি ছিল তথাপি জীবনের শৈল্পিক দিক এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রভৃতির প্রতি অনেক বেশী শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত এবং মানবিক পূর্ণতার বিষয়ে যথেষ্ট পরিস্কার ধারণার অধিকারী ছিল।

পরিপূর্ণ প্রকৃত রুচিশীল মানবিকতার সূত্রপাত একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন মানসিক চেতনার কার্যকরী দিকটি ছাড়াও কার্যকরী জ্ঞান, যুক্তি এবং অনুসন্ধিৎসতার বিশাল ব্যাপ্তির ফলে চরিত্র গঠন সুউচ্চ নৈতিক চেতনা এবং বিপুল মানবিক কর্মকান্ড সাধিত হবে। আর এই সব কিছু আমাদের নিম্ন বা মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা সম্ভব হবে না, এর জন্য চাই প্রকৃত সত্য, সৌন্দর্য্য এবং আত্ম উপলব্ধি চেতনা সম্পন্ন মন।

---- শ্রী অরবিন্দের মানব চক্র (The Human Cycle)
এর অংশ বিশেষ

DEVELOPED VERSUS CULTURED NATION OR AGE

Even when a nation or an age has developed within itself knowledge and science and arts, but still in its general outlook, its habit of life and thought is content to be governed not by knowledge and truth and beauty and high ideals of living but by the gross vital, commercial, economic view of existance, we say that, that nation or age may be civilized in a sense, but for all its abundant and redundant appliances and aparatus of civilization it is not the realisation or the promise of a cultured humanity. Therefore upon even the European civilization of the nineteenth century with all its triumphant and teeming production, its great developments of science, its achievement in the works of intellect we pass a certain condemnation, because it has turned all these things to commercialism and to gross uses of vitalistic success. We may say of it that this was not the perfection to which humanity ought to aspire and that this trend travels away from and not towards the higher curve of human evolution. It must be our definite verdict upon it that it was inferior as an age of culture to ancient Athens, to Italy of the Renascence, to ancient or classical India. For great as might be the defficiencies of social organisation in those eras and though their range of scientific knowledge and material achievement was immensely inferior, yet they were more advanced in the art of life, knew better its objects and aimed more powerfully at some clear ideal of human perfection.

Not to live principally in the activities of the sense-mind, but in the activities of knowledge and reason and a wide intellectual curiosity, the activities of the enlightend will which make the character and high ethical ideals and a large human action, not to be governed by our lower or average mentality but by truth and beauty and the self-ruling will is the ideal of a true culture and the begining of an accomplished humanity.

(***Extracts*** from Sri Aurobindo's *work*, ***The Human Cycle***)

১.৬ ভবিষ্যত সমাজ (FUTURE SOCIETY)

১.৬.১ আধুনিক সামাজিক উন্নতির ঘটনাবলী (The Phenomenon of Modern Social Development)

শ্রী অরবিন্দের আধুনিক সামাজিক উন্নতির ঘটনাবলী ("The pehenomenon of Modern Social Development") প্রবন্ধে তিনি যুদ্ধ এবং আত্ম সঙ্কলন ("War and Self Determination ") নামক একটি TREATIES তে লিখছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় মন্দির, সামরিক আভিজাত্য এবং শিক্ষিত আভিজাত্যের একদিকে অবনমন এবং অন্যদিকে বনিক ও বৈশ্য, শুদ্র প্রভৃতি বর্ণের উত্থান অর্থ এবং শ্রমের উন্নতি প্রভৃতি এক যোগে তাদের প্রতিদ্বান্দ্বিদের জাতিচ্যুত বা স্থান চ্যুত করে দেয় এবং এদের মাধ্যমেই সামাজিক জাতি বৈষম্যকে নীচে টেনে নামিয়ে আনা হয় এবং পরিশেষে শ্রমের জয় সূচিত হয়। এর ফলে সমস্ত সামাজিক ধ্যানধারণার পুর্ণগঠন হয় যেখানে শ্রমই হল সর্বপ্রথম এবং সব থেকে বিশিষ্ট শব্দ দৃশ্যমান ভাগ্য লিখনে যার ভুমিকা এবং মুল্য সবচেয়ে বেশী। বর্তমানে বৈশ্যগন যারা সারা বিশ্বে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে, এবং মানুষের জীবনে যা কিছু উৎপাদন ভিত্তিক বা উৎপাদন নির্ভর তাদের সবার উপরে ছাপ রয়েছে। এমন কী জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কবিতা, ধর্ম, জীবনের অর্থনৈতিক ধ্যানধারনা সবকিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিটি মানুষের মন সামাজিক বিবর্তনের স্তরটি হল, "জ্ঞান ক্রিয়া-ধারা" - অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্মকে এক যোগে তুলে ধরা। একমাত্র মুক্ত মনের মানুষই স্বাধীন ভাবে সত্যের এবং বিশ্ব কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারেন এঁরাই প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্মন। তাঁরা কখনও কোন কিছুর জন্য কারো প্রতি নির্ভরশীল নন। আধুনিক যুগে যাঁরা বুদ্ধিজীবি বিশেষ করে যাঁরা বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ তাদের বর্তমান কালের ব্রাহ্মন রূপে গন্য করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন প্রকৃত অর্থে মুক্ত বুদ্ধি, মুক্ত চিন্তা নিয়ে স্বাধীন ভাবে সত্য এবং বিশ্ব কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারেন -- এটি এক বিরাট প্রশ্ন। তাঁরা কী সব ব্যাপারে স্বনির্ভর নাকি তাঁরা অর্থ বা রাশভ যোগানকারি সংস্থার দ্বারা প্রতিমুহূর্তে প্রভাবিত এবং নির্দেশিত হচ্ছেন।

১.৬.২. আধুনিকতার বর্তমান প্রক্রিয়া ও ধারা (The Trends of Present Modernisation Process)

বর্তমান সময়ে চাহিদা এবং জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক সমাজ দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এটি আধুনিকীকরন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে, যার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

- নগরায়ন
- শিল্পায়ন
- চলমানতা (MOBILOZATION) গতিসঞ্চার
- গনতন্ত্রীকরণ
- প্রাতিষ্ঠানিকতা
- বিশ্বায়ন

নগরায়ন ঃ বিদ্যুৎ, যানবাহন, যোগাযোগ, পুর পরিসেবা এবং আরও নানাবিধ আরামদায়ক জীবনযাত্রার

ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধার ফলে শহর এবং সদর /মহকুমার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। উন্নতমানের জীবন যাত্রাকে উপভোগ করতে আজ আরো বেশী সংখ্যায় মানুষ গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে বসবাস আরম্ভ করেছে।

শহরায়ন (Urbanization) ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই শিল্প বিপ্লব ঘটে গেছে। দক্ষ এবং অদক্ষ উভয় শ্রেণীর কর্মীর জন্য শহরে বিভিন্ন কারিগরি শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ এসেছে। কারিগরি শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমের শ্রেণী বিন্যাস করার সুযোগ এসেছে ফলে প্রতিটি শ্রমিক কলকারখানায় তার দক্ষতা অনুযায়ী বিশেষ ধরনের কাজের সুযোগ পাচ্ছে। শ্রমিকেরা নিয়ম শৃঙ্খলাভাবে সুসংগঠিত জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছে। শ্রমিকরা আজ জীবনের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারছে।

চলমানতা (Mobilization) গতিসঞ্চার ঃ আজকের দিনে নানাবিধ যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ থাকার ফলে আধুনিক মানুষ ভৌগোলিক এবং সামাজিক বাধা দূর করে চলমানতার সুফলকে অনুভব করতে পারছে। সে আজ আর শুধুমাত্র অতীতের "একজন গৃহবন্দী" মানুষ নয়, আজ সে আধুনিক যুগের একজন চলমান ব্যক্তি।

গনতন্ত্রীকরণ (Democratization) ঃ প্রায় সমস্ত সভ্য রাষ্ট্র জনগনের স্বাধীনতা, সাম্য এবং ন্যায় নীতিতে গনতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের সংগঠিত করে নিয়েছে। তৎপর আধুনিক মানুষ একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে সমাজে তার কর্তব্য পালন করছে এবং একই সঙ্গে তার গনতান্ত্রিক অধিকারও প্রয়োগ করতে পারছে। সে আজ দেশের আইন তৈরীতে অংশ গ্রহণ করছে এবং তার পছন্দসই সরকারকে মনোনিত করছে। সরকার যদি ঠিক মত কাজ না করে একটি গনতান্ত্রিক দেশের মানুষের সেই সরকারকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতাও আছে। আজকের যুগে গনতন্ত্র হল আধুনিকতা এবং সভ্যতার মূল চাবি কাঠি।

প্রাতিষ্ঠানিকরণ (Institutionalization) ঃ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অগ্রগতি এবং কল্যাণের জন্য প্রতিটি সভ্য সমাজে অনেক সংগঠিত প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গির্জা, ব্যাঙ্ক,সরকার, সংগঠন, বণিকসভা প্রভৃতি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি উদাহরণ। আধুনিক মানুষ সভ্য জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার জীবনে শান্তি এসেছে, সে অগ্রগতি এবং উন্নতি করতে সফল হয়েছে।

বিশ্বায়ন (Globalization) ঃ আজ গোটা বিশ্বে আধুনিক সমাজ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনে যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যাবস্থার এত সুবিধা আছে যে কোন সমাজই আজ নিজেকে বিচ্ছিন্ন জাতি বা রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না। এরই পাশাপাশি বিশ্বপর্যায়ের সাধারণ সমস্যা সমাধানে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র আজ এক অপরের কাছে দায়বদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকৃত যুদ্ধ সারা বিশ্বের স্বীকৃতি এবং সমর্থন পেয়েছিল।

এই সব নানাবিধ কারণের ফলে ভবিষ্যতের সমাজ নিম্নলিখিত চাহিদাগুলি উপলব্ধি করবে

১) মানব জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলা।
২) বেঁচে থাকার জন্য মানবিক মূল্য বোধ।
৩) বিজ্ঞান মনস্কতা এবং নিরপেক্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গি।
৪) সহ-অস্তিত্ব এবং বিশ্বজনীন সহযোগিতা।
৫) পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রতিটি সমাজে বহু-জাতি বহুভাষা বহু সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন।

১.৬.৩ আধুনিকীকরণের উপাদান সমূহ (Components of Modernisation)

ভবিষ্যত সমাজে আধুনিকীকরণ একটি নির্দিষ্ট এবং আবহমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। এর অর্থ হল যে সময়ের নতুন নতুন চাহিদা এবং টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় সমাজের নিজেকে প্রতিনিয়ত পূর্ণবিন্যাস করতে হবে, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। প্রার্থিত ফল লাভের জন্য নতুন পরিবর্তন, নতুন লক্ষ্য এবং নতুন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানের কিছু বিশেষজ্ঞ আধুনিকীকরণের ধারনাকে বিশ্লেষণ করে এর প্রক্রিয়ার দশটি উপাদান স্থির করেছেন ঃ

১) স্বজনের প্রতি সহমর্মীতা (Empathy)
২) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গতিময়তা
৩) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশ গ্রহণ
৪) Interest Aggegation And Interest Articulation
৫) লক্ষ্য অর্জনের বিন্যাস
৬) Rational -cnds-means Calculation
৭) সম্পদের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, কর্ম ও সঞ্চয়
৮) ইচ্ছার ওপর আস্থা এবং সম্ভাব্য পরিবর্তন
৯) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলা
১০) ভবিষ্যতে উচ্চতর দীর্ঘ মেয়াদী লাভের জন্য তাৎক্ষণিক স্বল্প লাভকে ত্যাগ করার ক্ষমতা বা কৌশল।

অতএব আধুনিকীকরণ হ'ল পরম্পরাগত সমাজ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে সমসাময়িক সমাজে এক পরিপূর্ণ রূপান্তর যেখানে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুস্থিতি বিদ্যমান।

১.৬.৪. গ্রহণযোগ্য চাহিদা (Adaptive Demands)

আধুনিকীকরণের জন্য প্রতিটি পরম্পরাগত সমাজকে রূপান্তরের চাহিদাগুলি পূরন করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী আধুনিক বিজ্ঞান যুগের নূতন নূতন দাবীগুলিকে রপ্ত করে নিতে হয়। কিছু শিক্ষাবিদ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে কোন কোন জায়গায় দাবীগুলি পূরন করা প্রয়োজন নিম্নে সেগুলি বর্ণিত হল ঃ

১) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন রাজনৈতিক দল, জন সেবামূলক কাজ, প্রভৃতির সৃষ্টি করতে হবে এবং সর্বোপরি একটি নূতন নিয়ম সম্বলিত একটি প্রতিনিধি সরকার গঠন করতে হবে।
২) শিক্ষা ক্ষেত্রে নূতন গন শিক্ষা নিয়ম, শিক্ষার সমান সুযোগ এবং বৃত্তি মূলক দক্ষতা নির্ভর শিক্ষাক্রম এবং তার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
৩) সামাজিক ক্ষেত্রে, মুক্ত এবং সহনশীল বহুজাতিক সমাজ, বহুভাষা এবং বহুধা সংস্কৃতি সম্পন্ন মানব বর্গকে গ্রহণ করতে হবে।
৪) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণের জন্য পন্য উৎপাদন এবং তার বন্টনের জন্য নূতন নিয়ম গ্রহণ করতে হবে।

৫) ধর্মীয় ক্ষেত্রে, ধর্ম নিরপেক্ষ এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি তৎসহ বিভিন্ন বিশ্বাস এবং আস্থার প্রতি পারস্পরিক সহনশীলতা গড়ে তুলতে হবে।

এই প্রসঙ্গে THE CURVE OF RATIONAL AGE অংশটি দেখুন।

এটি হ'ল অগ্রগতির যুগ, এই অগ্রগতি দু-ধরনের ADAPTIVE, যেটি একরকম অপরিবর্তনীয় সামাজিক নীতির উপর ভিত্তি করে এবং সময়ে সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন নূতন ধারনা এবং চাহিদা ও তার প্রয়োগের উপর নির্ভর করে অপরদিকে আর এক রকম অগ্রগতি হল আমূল অগ্রগতি -- যেটি কোন দীর্ঘকালীন সুরক্ষিত নিয়ম কানুনের ওপর ভিত্তি করে হয়না পরিবর্তে বাস্তব ভিত্তিগুলিকে অনবরত প্রশ্নের সম্মুখীন প্রশ্ন তোলে। আধুনিক যুগ নিজেকে পর্যায় ক্রমের অনবরত আমূল অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলেছে।

আধুনিক কালের গতি প্রকৃতিতে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং সামাজিক পুনর্নির্মাণে প্রক্রিয়াগুলিকে যদি অনুধাবন করতে চাই এবং যদি ধরে নিই যে এই অগ্রগতি ছেদহীন নিবিঘ্ন হবে তবে এটি অবশম্ভাবী তিনটি ধারাবাহিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়েই যাবে - একথা একরকম বলা যায় পূর্বনির্দিষ্ট। প্রথমটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ক্রমশ গনতান্ত্রিক পথে এগোবে, যেখানে নীতি এবং ধ্যানধারনার মুক্ত প্রকাশ ঘটবে।

দ্বিতীয়টি সামাজিক বা সমাজভিত্তিক যার পরিশেষে হয়ত একটি বামপন্থী (Communism) সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে যেখানে সর্বজনের সমানাধিকার এবং সাম্যই হবে রাষ্ট্রের নীতি।

তৃতীয়টি আদৌ যদি তত্ত্বের বাইরে যাওয়া যায় তবে যদি অত্যন্ত কর্কশ ভাবে বলা যায় আন্দোলনকারী প্রতিবাদী কার্যকলাপ ইচ্ছাকৃতভাবে আলগা সহযোগিতা বা স্বাধীন সাম্প্রদায়িকতা এক সৌভ্রাতৃত্ব অথবা সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক এবং এটি কোন সরকারি নীতি নির্ভর নয়।

মানুষ ঃ যে কিনা একটি অর্ধনিয়ন্ত্রিত প্রাণী তার তৃপ্তির জন্য তিনটি বস্তু চায় ক্ষমতা যদি সে তা করায়ত্ত করতে পারে, তার বিচার বুদ্ধির স্বীকৃতি এবং ইচ্ছাপূরনের আনন্দ। প্রাচীন সমাজে বংশ মর্যাদা এবং সামাজিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে, কিছু মানুষ এই বস্তুগুলিকে অনেকাংশে উপভোগ করতে পারত। কোন যথাযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই যখন একাবারে এই ভিত্তিগুলি অপসারিত হয়ে যায় তখন এগুলিকে পূর্ণ অর্জন করার আর যে উপায় অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল অর্থের ক্ষমতা। **এমতানুসারে একটি ঐকবধ্য নিয়মশৃঙ্খলা ভিত্তিক সমাজের বদলে** অতি দ্রুত উন্মাদের মত এক পেশে প্রতিযোগিতা পূর্ণ উৎপাদনমুখী শিল্পভিত্তিক, আবহের সৃষ্টি হবে। গণতন্ত্রের থাবার নীচে এক ক্রমবর্ধমান PLUTOCRATIC ভাবভঙ্গি থেকে যা ব্যক্তিকেন্দ্রীক ব্যবস্থার অন্তিম ফল, যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীল যুগের সার্বিক বিপর্যয়ের প্রাথমিক স্তর।

বোধের বিষয়টি একটি অন্তরবর্তী স্তর ঃ এটি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জীবনকেও নিরীক্ষণ এবং বোঝার বিষয় এবং সেই সঙ্গে কী নিয়মে কোন পথে তার উন্নতি সেটিও অনুভব করা প্রয়োজন। এই কারণেই একটি খনস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গিকে রপ্ত করে নেওয়া জরুরী যার প্রতিটিই আংশিক ভাবে সত্য এবং এমন কোন নিয়ম প্রস্তুত করা উচিত নয় যা যে কোন বিষয়ের চিরন্তন সত্যের শেষ কথা বলে পরিগণিত হবে। যে কোন বিষয়ের অন্তবর্তী সত্যটি হল যুক্তির সত্যতা নয়।

(শ্রী অরবিন্দের মানব চক্রের অংশ বিশেষ)

The Curve of the Rational Age

It has been an age of progress; but progress is of two kinds, adaptive, with a secure basis in an unalterable social principle and constant change only in the circumstances

and machinery of its application to suit fresh ideas and fresh needs, or else radical, with no long-secure basis, but instead a constant root questioning of the practical foundations and even the central principle of the established society. The modern age has resolved itself into a constant series of radical progression.

If we may judge from the modern movement, the progress of the reason as a social renovator and creator, if not interrupted in its course, would be destined to pass through three successive stages, which are the very logic of its growth, the first individualistic and increasingly democratic with liberty for its principle, the second socialistic, in the end perhaps a governmental communism with equality and the Stage for its principle, the third - if that ever gets beyond the stage of theory - anarchistic in the higher sense of that much-abused word, either a loose voluntary cooperation or a free communalism with brotherhood or comradeship and not government for its principle.

Man, the half infra-rational being, demands three things for his satisfaction, power, if he can have it, but at any rate the use and reward of his faculties and the enjoyment of his desires. In the old societies the possibility of these could be secured by him to a certain extent according to his birth, his fixed status and the use of his capacity within the limits of his hereditary status. That basis once removed and no proper substitute provided, the same ends can only be secured by success in a scramble for the on power left, the power of wealth. Accordingly, instead of a harmoniously ordered society there has been developed a huge organised competitive system a frantically rapid and one-sided developemnt of industrialism and under the garb of democracy, an increasing plutocratic tendency that shocks by its ostentations grossness and the magnitudes of its gulfs and distances.

These have been the last results of the individualistic machinery, the intital bankruptcies of the rational age."

The business of the reason is intermediate : it is to observe and understand this life by the intelligence and discover for it the direction in which it is going and the lows of its self developemnt on the way. In order that it may do its office, it is oblised to adopt temporarily fixed view-points none of which is more than partially true and to create systems none of which can really stand as the final expression of the integral truth of things. ***The integral truth of things is truth not of the reason but of the spirit."***

(Extract from Sri Aurobindo's Work, The Human Cycle.)

৬) প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমাজে আরও বেশী উৎপাদনের প্রয়োজন শিল্পের প্রতিটি স্তরে শ্রমিকদের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক কলা কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

৭) পরিবারিক ক্ষেত্রে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বল্প সংখ্যক বা সীমিত সংখ্যক সন্তান এবং অনু পরিবারের ধারণাকে গ্রহণ করতে হবে।

৮) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, একটি স্বচ্ছ, সুন্দর, দায়িত্বশীল পরিচালন ব্যাবস্থা তৈরী করতে হবে।

৯) নৈতিক ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ গুলিকে জাগিয়ে তুলতে হবে বিশ্ব নাগরিকদের মধ্যে ভালবাসা এবং সৌহার্দ্য প্রচার করতে হবে।

১০) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত রাষ্ট্রের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ধারণা, ঐক্য এবং সহযোগিতার কথা প্রচার করতে হবে।

১.৬.৫ ভবিষ্যতের ভারতীয় সমাজ (Indian Society of Future)

ভারতবর্ষ – পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান প্রাচীনতম সভ্যতার একটি, আধুনিক পরিভাষায় একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্র। আজ সময় হয়েছে এই ভারতবর্ষের সমাজকে উপরিউল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে পুনর্নির্মাণ করার। একটি অগ্রগামী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশ শিক্ষাব্যবস্থা এবং নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সব রকমের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মানব সমাজ একটি বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। নিউটনের গাণিতিক সূত্র ধরে পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা, ডেসকারচেথ এর দর্শন, বেকন এর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা পৃথিবীর উন্নতির ইতিহাসকে সপ্তদশ অষ্টদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর পর্যন্ত শাসন করে এসেছে। বিংশ শতাব্দীতে চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক বৈপ্লবিক ধ্যানধারনার দেখা পাওয়া গেছে যার ফল স্বরূপ পদার্থবিদ্যা যান্ত্রিকতার যে সীমাবদ্ধতা তাকে অনেকখানিশে তুলে ধরেছে। এর ফলে একটি জৈবনিক, পরিবেশ ভিত্তিক পৃথিবীর দৃষ্টির গোচরে এসেছে যা বহু যুগ ধরে পরম্পরাগত ভাবে কুয়াশাচ্ছন্ন বা রহস্যাবৃত ছিল। দীর্ঘ দিন ধরে যাতে টিকে থাকতে পরে এমনই উন্নতির কথা ভেবে মানব সমাজ আজ সৌর যুগের সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।' একটি সমাজের বিবর্তন - তা সে পরিকাঠামোগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, পরিবেশগত যেটিই হোক না কেন মূল্যবোধের ধারাবাহিকতা, পরিবর্তন প্রভৃতির দ্বারা ভীষণ রকম প্রভাবিত। কিছু কিছু মূল্যবোধ আছে যা একান্তই অভ্যন্তরীণ এবং সেগুলি প্রকৃতি যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেন তার সাথে একই তানে বাঁধা এবং যার মাধ্যমে নির্দ্ধারিত হবে ভবিষ্যতের অগ্রগতি এবং উন্নতির ধারা।' ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর এই ধরনের উন্নতি এবং মনোজগতের পরিবর্তনের মধ্যে যে বিরোধ তাকে মাথায় রেখে চলতে হবে এবং তার নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়কারীর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দী ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য প্রতিযোগিতা এবং সুযোগ দুটিই খুলে দিয়েছে যাতে করে সে ২০২০ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রের পরিণত হয়। এটি তখনই সম্ভব যখন ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক এক নূতন ভারতবর্ষ নির্মাণে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করবে এবং সেই দিনই গান্ধিজীর স্বপ্নের নূতন ভারত জন্ম নেবে।

(এই বইয়ের তৃতীয় (৩য়) একক এবং SECP 01/Block-4-এর একবিংশ শতাব্দীতে অনুমোদন যোগ্য উন্নয়নের জন্য শিক্ষা দেখুন)

১.৬.৬. ভবিষ্যতের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা (Life Long Education for Future)

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল যারা ইউনেস্কো (UNESCO) মত সংগঠনের সুপারিশ করে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উপায়, সমাধানের মাধ্যম, সমাধানের পরিকল্পনা, এবং তদসম্বন্ধীয় নানা প্রচার চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে এই সংগঠন পরামর্শ দেবে। এই কমিশনের রিপোর্ট শুধু মাত্র আন্তর্জাতিক শিক্ষানুরাগী সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি নিয়েই কেবল নাড়াচাড়া করেনি বরং উন্নত এবং উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুস্তর ব্যবধান রয়েছে তার ওপরও বিশেষ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১.৭. একক-এর সারাংশ ঃ মনে রাখার বিষয় (UNIT SUMMARY : POINTS TO REMEMBER)

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- শিকার ও সংগ্রহ
- বনসৃজন
- কৃষিকার্য
- শিল্প স্থাপন
- তথ্য ও প্রযুক্তি

মানুষের সুসভ্য জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সমাজ আধুনিক সমাজে উন্নীত হয়েছে।

পরম্পরাগত ভাবে মানসিক বিবর্তনের শক্তির দ্বারাই মানব সমাজের বিবর্তন পরিচালিত হয়ে এসেছে। কয়েকটি নির্দিষ্ট মানসিক স্তরের বা ধাপের মধ্যে দিয়েই মানব সমাজের অগ্রগতি হয়ে এসেছে।

- প্রতীকী
- স্বভাসুলভ
- চিত্রচরিত
- ধারণাকেন্দ্রিক
- বিষয় ভিত্তিক
- মানুষ বর্বর স্তর থেকে ধীরে ধীরে সভ্য মানুষে উন্নীত হয়েছে।
- বর্বরতা হল সমাজের সেই অবস্থা যখন মানুষ তার নিজের জীবন, শরীর এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্বের বাইরে আর কিছু ভাবতে পারত না। প্রথমে সে এইগুলির যথোপযুক্ত রক্ষনাবেক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তার মানসিক উন্নতির বিষয়ে খুব সামান্যই আগ্রহী ছিল। অন্যদিকে সভ্যতা হ'ল সমাজের সেই অবস্থা যেখানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুসংগঠনের সাথে মানসিক উন্নতি বা বিকাশ ও একটি কার্যকরী ক্রিয়াকলাপ হিসাবে গৃহীত হয়। সমাজের প্রায় সমস্ত স্তরেই এটি দেখা না গেলেও বেশীর ভাগ স্তরেই এই কার্যকলাপগুলি পরিলক্ষিত হয় যদিও সমাজের কিছু কিছু অংশকে এই মানসিক উন্নতির বিষয়ে কিছুটা নিরুৎসাহী হতে দেখা যায়, তথাপি এই ধরনের গোটা সমাজকে সভ্য এমন কি অতি সভ্য সমাজ বলে অভিহিত করা যায়।

  জ্ঞান কে যদি স্থায়ী ভাবে টিকে থাকতে হয় তবে জ্ঞানকে আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানের চারপাশে যদি তীব্র অজ্ঞতা জড়িয়ে থাকে তার তা মানবতাকে নতুন করে বর্বরতার সম্মুখীন করে তোলে।

  ১৯ শতকের ইউরোপীয় সভ্যতা যা কিছু সাফল্য এবং উৎপাদনের পরিপূর্ণতা, বিজ্ঞানের বিশাল উন্নতি এবং বুদ্ধিজীবিদের অবদান যার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তার মধ্যেও এটি রয়েছে, কারণ এটি সমস্ত কিছুকেই বাণিজ্যভিত্তিক করেছে এবং রয়েছে বাহ্যিক সাফল্যের ব্যবহার। আমরা বলতে পারি এটি শুদ্ধতার পথ নয় যা মানুষের করা উচিত ছিল, এটি আবর্তিত হয়েছে।

  আমরা এটা সম্পর্কে বলতে পারি যে— এটি মুক্ত ছিল না যা মানবতার দিক থেকে গভীরভাবে চাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া ঐ ধারা পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের বিবর্তনের উচ্চ শিখরের দিকে নয়, এটি আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট বিচার/ব্যয়। এই যে প্রাচীন এথেন্সের সংস্কৃতির একেবারে গোড়ার দিক যা ইটালীর নবজাগরণ ও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির তুলনায় নগণ্য। ঐ সব ক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠনের একটি যতই বিশাল হোক না কেন এর বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের ব্যাপ্তি এক বাস্তবগত প্রাপ্তি

নগণ্য মানের খাদ্য সত্ত্বেও তারা ছিল উন্নত জীবন শৈলীর অধিকারী। এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা বা জ্ঞান ছিল এবং লক্ষ্য ছিল আদর্শবান নিখুঁত শক্তিশালী মানুষ হওয়া।

■ **আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল।**

- নগরায়ন
- চলমানতা
- গণতন্ত্রীকরণ
- প্রতিষ্ঠানিকতা
- বিশ্বায়ন

- আধুনিক সমাজকে নতুন নতুন চাহিদা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাই সময়ে সময়ে আধুনিক সমাজের পুর্নবিন্যাস প্রয়োজন।
- "The business of the reason is intermediate : it is to observe and understand this life by the intelligence and discover for it the direction in which it is going and the laws of its self development on the way. In order that it may do its office, it is oblised to adopt temporarily fixed view-points none of which is more than partially true and to create systems none of which can really stand as the final expression of the integral truth of things. The integral truth of things is truth not of the reason but of the spirit."

(Sri Aurobindo)

- ভারতীয় সমাজ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং নৈতিকতা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে সঙ্কটের সমাধান করতে হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে একটি অগ্রণী রাষ্ট্রে পরিণত হতে হবে। এই ভাবে ভারতবর্ষ নিজেকে সৌর যুগের পথিকৃত রূপে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নতির মধ্যে নিয়োজিত করবে।
- দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সমাজের টিকে থাকার একমাত্র উপায় হ'ল জীবনব্যাপী শিক্ষা। একমাত্র তাহলেই ভবিষ্যত সমাজ পরিপূর্ণ নারী এবং পুরুষকে পাবে যারা পৃথিবীতে শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি এনে দিতে পারবে।

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (CHECK YOUR PROGRESS)

১. সমাজের সংজ্ঞা দাও। সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।
২. সময়ের সঙ্গে মানুষের বিবর্তন এবং প্রযুক্তি বিদ্যাগত উন্নতিগুলি উল্লেখ করুন।
৩. আধুনিক মানব সমাজ এবং আদিম মানব সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।
৪. মানব সমাজের মানসিক অধ্যায়গুলি যার মাধ্যমে মানব সমাজ বিবর্তিত হয়েছে, সেগুলি কি কি?
৫. মানসিক অধ্যায়গুলি যার মাধ্যমে মানব সমাজ অতিবাহিত হয়েছে তার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।
৬. সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে মানব সভ্যতার বৃদ্ধি ঘটে।
৭. আধুনিকীকরণের পদ্ধতি কি?
৮. আধুনিকীকরণের প্রধান প্রধান উপাদানগুলি আলোচনা করুন।
৯. বর্তমান সময়ে ভবিষ্যৎ সমাজকে ঠিক রাখতে হলে অত্যাবশ্যকীয় কি কি কাজ করতে হয়?
১০. ভবিষ্যত সমাজের গ্রহণযোগ্য চাহিদার বিভিন্ন ধরনগুলি ব্যাখ্যা করুন।

১১. ভারতবর্ষে আমরা নতুন সমাজ কিভাবে গড়ে তুলব ?

১২. ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক কমিশন প্রদত্ত সারা জীবন শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

১.৯ বাড়ীর কাজ (ASSIGNMENTS/ACTIVITIES)

১. মানসিক অধ্যায় যার মাধ্যমে মানব সভ্যতা অতিবাহিত হয় তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

২. বিশ্ব ইতিহাসে প্রদত্ত বর্বরতা ও সভ্যতার উদাহরণগুলির পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৩. সময়ের সঙ্গে মানুষের বিবর্তনের জন্য যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

১.১০ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (POINTS FOR DISCUSSION/ CLARIFICATION)

অনুগ্রহ করে সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করুন। যেগুলি আপনি আলোচনা বা ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক।

১.১০.১ আলোচনার সূত্রাবলী

_____

_____

_____

১.১০.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী

_____

_____

_____

১.১১ উৎস (REFERENCES)

1. **BANTON, M.** : *Roles : An Introduction to the Study of Social Relations,* 1965 (Tavistock).
2. **CAPRA, FRITZOF (1982)** : *The Turning Point, Science, Society and the Rising Culture,* flamingo. Fontana Paperbacks, 1989.
3. **DAVIS, K.** : *Human Society,* 1948 (Macmillan, New York).
4. **EMMET, D.** : *Function, Purpose and powers,* 1958 (Macmillan and Co.)
5. **GURU, G. & SINGH, D.P.** (Ed. 1996) : *Environment and Development. A Text Book of Environmental Education and Rural Developemnt,* NCERT. New Delhi.
6. **FIRTH, R.,** *"Social Organisation and Social Change",* Journal of the Royal

Anthropological Institute, 84, 1954. *"Some Principles of Social Organisation"* Journal of the Royal Anthropological Institute, 85, 1955.

7. **JOHNSON, H.M.** : *Sociology : a systematic introduction,* 1961 (Routledge and Kegan Paul).
8. **MACIONIS, JOHN J. (4th Edn. 1998)** : *Society, the Basics,* Prentice Hall, New Jercy, USA.
9. **MERTAON, R.K.** : *Social Theory and Social Structure,* 1949, Rev. Ed. 1957 (Free Press). On Theoretical Sociology (1967). Paperback. "The Role-set Problems in Sociological Theory" British Journal of Sociology, VIII, 2, 1957.
10. **MITCHELL, G.D.** (Edit) : *A Dictionary of Sociology,* 1968 (Routledge and Kegan Paul).
11. **SRI AUROBINDO (1916-20),** *Human Cycle, War and Self Determination, Sri Aurobindo* Ashram, Pondicherry, 1962
12. **SRI AUROBINDO (1916-20),** *Foundation of Indian Culture,* Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1962.

একক ২ ❑ আদর্শ এবং অগ্রগতি (IDEALS AND PROGRESS)

(শ্রী অরবিন্দের আদর্শ এবং ভাবনা Ideals & Progress থেকে গৃহীত)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ আদর্শ

২.৪ যোগ এবং কর্মদক্ষতা

২.৫ সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি

২.৬ সংরক্ষনশীল মন এবং প্রাচ্যের অগ্রগতি

২.৭ আমাদের আদর্শ

২.৮ এককের সারাংশ

২.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.১০ বাড়ীর কাজ

২.১১ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১১ উৎস

২.১ ভূমিকা (INTRODUCTION)

এই এককটি শ্রী অরবিন্দের "I deals & Progress"রচনার সংক্ষিপ্তসার আদর্শ যোগ এবং কর্মদক্ষতা, সংরক্ষণ ও অগ্রগতি, সংরক্ষনশীল মন এবং প্রাচ্যের অগ্রগতি এবং আমাদের আদর্শ নামাঙ্কিত প্রবন্ধগুলি (যা এই এককের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ এবং ২৭) পরিচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে সেগুলি সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মানব সভ্যতার বিবর্তন এবং ভবিষ্যতে অগ্রগতিতে আমাদের কী আদর্শ হওয়া উচিত এবং কীভাবে তা উপলব্ধ হবে সেই বিষয়ে এই পরিচ্ছেদগুলি বিশেষভাবে আলোকপাত করে।

২.২ উদ্দেশ্য (OBJECTIVES)

এই এককটি পাঠ করার পর একজন শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবে।

- আদর্শ ও অগ্রগতির সংজ্ঞা নিরূপণ
- নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রভেদ
  - — আদর্শবাদ এবং বাস্তববাদ
  - — সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি
  - — রক্ষণশীল মন এবং প্রাচীয় অগ্রগতি
  - — প্রাচ্যের পাশ্চাত্যের প্রতি এবং পাশ্চাত্যের প্রাচ্যের প্রতি বাণী

- নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা
  - আমাদের আদর্শ কী হওয়া উচিত
  - যোগ (কর্মদক্ষতা) যা আদর্শকে উপলব্ধি করায়

২.৩ আদর্শ (ON IDEALS)

আদর্শ হল এক ধরনের সত্য। মানুষের জন্য যা কখনও প্রভাবিত হয়নি, এটি একটি অত্যন্ত উচ্চমার্গের বাস্তব অস্তিত্বের উপলব্ধি যা আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের চেয়ে অনেক আলাদা এক অনুভূতি। বাস্তববাদী বোধ বা বুদ্ধি যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে তা কখনই আদর্শকে সত্য বা বাস্তব বলে মানতে চায় না বরং এই বলে মানে যে ভবিষ্যতে বহির্জগতে কোন কার্য সম্পাদিত হ'লে বড়জোড় আদর্শকে সেই কার্য সম্পাদনের অন্তর্নিহিত সত্য বলে ধরলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যে মন সার্বজনীন জাগতিক বস্তুর শক্তিকে বুঝতে পারে তার চেতনাকে শুধু মাত্র কাজের জগতে বন্দি করে রাখে না, আত্মার মধ্যে যে চেতনাকে অনুভব করে একমাত্র সে-ই উপলব্ধি করতে পারে কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কে তাকে ব্যবহার করতে পারে। অন্তর্দৃষ্টিতে যে আদর্শের উপস্থিতি তা পরিবর্তনশীল বহির্জগতের তুলনায় অনেক অনেক বৃহত্তর সত্য। বাহ্যিক ঘটনার প্রতিফলনই কেবলমাত্র ধারণা নয় বরং বলা চলে ঘটনা হ'ল ধারণার একটি আংশিক প্রতিফলন।

একথা সত্য যে আদর্শ কখনই অবশম্ভাবী বাস্তব নয়। আদর্শকে বিশ্ব-সচেতনতার বিষয় হিসেবে মেলে ধরা হয়েছে যাতে জাগতিক কার্যক্ষমতা একটি ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই আদর্শগুলিই হ'ল মুখ্য, প্রকৃত কার্যাবলী হ'ল গৌণ। তারা বাস্তবের কাছাকাছি অতএব অনেক বেশী সত্য এবং প্রকৃত ঘটনার চেয়ে অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ। বাস্তবের প্রতিফলন আমাদের কাজের অস্তিত্বের মধ্যে আরো বেশী করে প্রতিফলিত হয়। মানুষের বোধ আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে নিজেকে অনেকটা সীমাবদ্ধ করে ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বাহ্যিক ভাবে কোন কিছু ঘটতে দেখে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিশীল ধারণাকে বিশেষ আমল দেয়না যদিও এটা বিশ্বজনীন আত্মসচেতনতার পরিপন্থি। জগৎ সৃষ্টির বহু আগে থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় যে বোধটি প্রথমেই কাজ করে তা হল সুখ চেতনার বিচারে আমরা বলি যে আগে বোধ হয় বিশ্ব জগতে সৃষ্টি এবং তারপর ঈশ্বর তার থেকে বিকশিত হন। এই ধারণা এত বেশী দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে এর থেকে বহু দেব-দেবীর ধারণা জন্মায় কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এর চেয়ে অনেক উচ্চতর দিব্য অস্তিত্বের ধারণা, যা আমাদের কাছে শেষ অবধি সত্য বা বাস্তবের প্রাথমিক স্তর হিসেবে ফুটে ওঠে। তাই একান্তভাবেই ধারণা-যা ঘটনার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে তার আসল উৎস হল যে ঘটনাটি ঘটেছে তার মূল তথ্য। আদর্শ এবং বাস্তবের মধ্যে যে কদর্য উজ্জ্বল প্রভেদ আমরা করে থাকি তা অমার্জনীয় ত্রুটি যার জন্য বাস্তবকে আমরা শুধু মাত্র একটি ঘটনা প্রবাহ বলে ধরে নিই যদিও এর পেছনে তার চেয়েও উচ্চতর, উন্নততর কিছু একটা থাকে। বাস্তব, ধারণা, ঘটনা এটিই হল সৃষ্টিশীল বিশ্বজগতের ক্রমানুসার।

বাস্তবধর্মী বোধ একমাত্র তাকে বিশ্বাস করে যার মধ্যে ক্ষমতার আভাস পায়। অতএব আদর্শ সম্বন্ধে এটির একটি পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা থাকে কারণ এটি সবসময় জাগতিক বা বস্তু নির্ভর ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ক্ষমতাই একমাত্র ঐহিকতার সংজ্ঞা নয়; ক্ষমতার অগ্রবর্তী হল জ্ঞান। শক্তি এবং সচেতনতা হল কোন বিষয়ের সমজ সত্তা আবিশ্বের যাবতীয় বস্তুর এবং তাদের বিবর্তনের উপলব্ধির আর ঘটনা হ'ল তাকে উপলব্ধি

করার ক্ষমতা, উভয়েই অপরিহার্য উভয়েই নিজেদের মধ্যে এবং একক ভাবে একে অপরের প্রতি যুক্তিযুক্ত এবং যথার্থ। আদর্শবাদী এবং দার্শনিক যেমন বাস্তববাদীকে অবজ্ঞা করতে পারেন না তেমনি বাস্তববাদীরও পূর্বোক্তদের খারিজ করার কোন অধিকার নেই আর যদি এমনটা হয় তবে তার নিদারুণ ফল স্বরূপ আমাদের বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা এবং পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি প্রকট হয়ে উঠবে এবং এই ধরনের ঔদ্ধত্য পূর্ণ অসম্পূর্ণ মানসিকতা সব সময়েই পূর্ণাঙ্গতা বা পরিপূর্ণতার পথ বন্ধ করে দেবে। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বরই হলেন সকল কাজের প্রভু সব প্রেরণার উৎস তিনিই হলেন সমস্ত ঘটনা বা কার্যকলাপের মালিক, তিনি অনেক কিছু ক্ষমা করে দেন, তিনি অনেক কিছুর মধ্যে দিব্যভাব জাগিয়ে তোলেন, অনেক কিছুকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনিই সৃষ্টির আদি। কিন্তু এদুটিই এক কিন্তু এসব চিন্তা নিয়ে আমাদের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা আছে মানবজাতিকে সেই সীমাবদ্ধতাকে জয় করতে হবে।

মানুষ কোন কিছু করে ওঠার আগে যত বেশী করে সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় সেই অনুপাতে তার অগ্রগতি হয়। এটি যথার্থই বিবর্তনের নিয়ম। এটি শুরু হয় জাগতিক-কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে যেখানে প্রকৃতি যে কিনা কার্যনিবাহী ক্ষমতা সে তার কর্মের দ্বারা আবৃত থাকে, উৎসারিত ঘটনা এবং নিজের চেতনাকেও আবৃত করে রাখে কিন্তু জীবন শক্তিকে বিকশিত করে কাজের প্রতিটি স্তরে এই শক্তি স্পন্দিত হয় এবং মনের গভীরে অন্তর্লীন চেতনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই মানুষ কখনই তার মানসিকতা এবং বোধের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারে না কারণ প্রথমত মানুষ হচ্ছে নিজের মানসিকতাকে বয়ে দায়বদ্ধ। তাই শুধু তার গ্রহণশীল মনের ওপর এর ছায়া মাত্র পড়ে। মনুষ্যেতর প্রাণী শুধু মাত্রই একটি কার্যনিবাহী জীব সে সৃষ্টিশীল নয় সে শুধু জীবন এবং বস্তুজগতের একটি যন্ত্রমাত্র তার কোন চিন্তা ভাবনা নেই এবং কোন ভাবনার ওপর নির্ভর করে তার কোন প্রতিক্রিয়াও হয়না অনুন্নত স্তরে মানুষও প্রায় এই রকমই ছিল। তার দৃষ্টি সীমায়িত ছিল বর্তমান ও সাম্প্রতিক পরিবেশে, সে প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু কাজই করত কী পেতে পারে বা কোথায় সে পৌঁছুতে পারে এসব না ভেবে জীবনে স্বাভাবিক নিয়মে যা আসত তাকেই গ্রহণ করত তার জীবনে কোন আদর্শ ছিল না। এর অনুপাতে সে যখন কোন ঘটনার পশ্চাৎপট কর্মের ব্যাখ্যা করতে শিখল প্রকৃতিতে অনুমান করতে শুরু করল তার কর্মের পিছনে কী ধারণা এবং নীতি কাজ করছে এবং শেষ পর্যন্ত যে ধারণা যা অদ্যাবধি অনুভূত হয়নি এসব যখন সে বুঝতে পারল তখন তার কাজের সে তার কাজের প্রকৃত অধিকর্তা হয়ে বসল এবং তখন থেকে তার মধ্যে স্বকীয়তা সৃষ্টিশীলতা এসব প্রকাশ পেতে লাগল। এতদিনে জগৎ সংসারে সামান্য একজন আজ্ঞাবহ থেকে কোন বিষয়ে কর্তৃত্বের পথে তার যাত্রা শুরু হল।

এই ধরনের অগ্রগতিতে মানবতা কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল হল বাস্তববাদী আর একদল আদর্শবাদী এবং এই দুই চরমপন্থীদের মধ্যে অসংখ্য আপোস হতে লাগল। যদিও বাস্তবে এই বিভাজন অনেকটাই কৃত্রিম। কেননা এজগতে প্রতিটি মানুষ যা কাজ করে তা কোন না কোন একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে বা তাকে ভিত্তি করেই করে এবং সে এই কাজ করার শক্তি পায় আদর্শ থেকে। হয় সেটা তার নিজের আদর্শ অথবা অন্য কারো আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করে আর এটা সে হয়ত বা বুঝতে পারে কিংবা পারেনা কিন্তু এটির অভাবে বা অনুপস্থিতিতে সে এক পা এগোতেও অক্ষম।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে সাফল্যের জন্য এই দুটির মধ্যে কোনগুলি বিপরীত বা একে অন্যের পরিপূরক। বৃহত্তর পরিবর্তনকে বাস্তবে উপলব্ধি করার জন্য আদর্শবাদী এবং চিন্তাবিদদের শুধু মাত্র

সাধারণ সচেতনতার ক্ষেত্রকে উর্বর করলেই চলবে না, উপরন্তু একজন আদর্শবাদীর উপলব্ধিতে আপোষহীনতা হবে একটি মুখ্য এবং অপরিহার্য বিষয়। কোন একটি সংগ্রামের কথাও কী উল্লেখ করা যায় যা আপোষহীন আদর্শের শক্তি ছাড়া হয়েছে আর যেখানে আদর্শহীন সংগ্রাম হয়েছে তা হয় মাঝপথে থেমে গেছে অথবা পুরোপুরি নিষ্ফলা হয়েছে। যে দেশ বা রাষ্ট্র মানবিকতার অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে নিষ্কলুশ দিব্য ধারায় ন্যস্ত না হয়ে শুধুমাত্র বড় বড় দেশ নেতা, দেশকর্মী, যারা অহরহ আপোষ করে চলে সেই ধরনের মানুষে সমৃদ্ধ সে দেশ বা রাষ্ট্র কোনদিনও বড় হতে পারবে না। প্রকৃত আদর্শবাদী এবং কোন ধারনার প্রতি গোঁয়ার বা একরোখা বিশ্বাসীর মধ্যে সব সময় তফাৎ থেকে যায়। এর মধ্যে দ্বিতীয় যিনি (একরোখা) তিনি শুধুই বস্তুবাদী, একজন কার্যনিবহী মানুষ যে সম্পূর্ণ অন্যের ধারণা দ্বারা চালিত বা অন্যের ধারনার বশবর্তী হয়ে চলে তার নিজস্ব কোন বোধ কাজ করে না এবং ধারনার থেকে বর্ষিত আলোর ধারায় সে আলোকিত হয়না। সে যেমন খারাপ করে তেমনি ভালও করে কারণ তার প্রধান কাজই হয় আপোষী মনোভাবাপন্ন মানুষকে নিরস্ত করা যাতে করে কোন অর্ধসমাপ্ত কাজ যেন থেমে না যায়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত এমন মনোভাব আবার বিরাট রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেহেতু সে আদর্শের স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারে না তাই যে কোন একটি বিষয়ের ওপর যাবতীয় মনোযোগ দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে চলে এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো বিষয়টি স্থূল নূতন ভাবে সাড়া না দিতে পারার মত অনুত্তেজক অবস্থায় পৌঁছায়। কিন্তু প্রকৃত আদর্শবাদী কখনই কোন একটি বিশেষ ধারার দাস নয়, সে সব সময় ধারণাকে ভালবেসে সেই ধারণার পিছনে যে প্রেরণা আছে তাই নিয়ে সে কাজ করে চলে।

মানুষ যখন তার নিজের মধ্যে আদর্শবাদী এবং বাস্তববাদী এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারে তখনই পরিপূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছায়। একটি বিরাট কার্যনিবহী ব্যক্তিত্ব একজন যথেষ্ট পরিমাণে আদর্শবান মানুষ। কিন্তু যে সকল মানুষ মহোত্তম কর্মবীর তারা প্রকৃতির নিধারিত অপরিসীম শক্তির দ্বারা বলীয়ান। তাঁদের মধ্যে সক্রিয় ক্ষমতা এবং অগাধ বাস্তব অনুভূতির সমন্বয় দেখা যায়। তারাই হলেন মহৎ কার্য-সম্পাদক, চিন্তাবিদ এবং প্রকৃত দূরদৃষ্টির অধিকারী। এমনই দুজন হলেন নেপোলিয়ন এবং আলেকজান্ডার। নেপোলিয়ন নিজেই ছিলেন বিশাল মাপের স্বপ্ন বিলাসী একজন অবচেতন মতাদর্শবাদী তার মস্তিষ্ক ছিল এক বিপুল শক্তির আধার। যদি ধরে নেওয়া যায় যে আলেকজান্ডারে তীব্র নিরাকার ধারণা তাদের শুধু রাজ্য জয় করতেই শিখিয়েছে তাহলেও একথা মানতেই হবে যে এই ধরনের ক্রিয়াকান্ডের ফলে গ্রীসের সভ্যতা সংস্কৃতি এশিয়ার অনেক সংস্কার এবং মানসিক সীমাবদ্ধতাকে দূর করে, এক নতুন সভ্যতার সূচনা এবং মানসিক আদানপ্রদানের সুযোগ করে দিয়েছে।

কিন্তু এই সব বিশাল ব্যক্তিত্ব মানবিকতার চাহিদা অনুযায়ী যা প্রয়োজন তারা নিজেদের মধ্যে কোন সমন্বয় ঘটায় নি। মানবিকতা এমন মানুষ চায় না যে শুধু ধারণা দ্বারা চালিত হবে, বা একটাই বাস্তববাদী হবে যে অর্ধ চেতন হয়ে আদর্শবাদীর চেয়ে কিছুটা আলাদা হয়ে তার চরিত্রের এক কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট দিকটিকে তুলে ধরবে। কিন্তু যিনি তার অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগাতে পারেন তিনি অনেক বেশী জ্ঞান এবং ক্ষমতা লাভ করেন। একজন মানুষ যিনি পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর তার কাছে সেই প্রকৃতিই হল কার্যকরী শক্তি যা তাতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে এবং অপরকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মানুষের অপর দিকটি হল পুরুষকার এই বৈশিষ্ট্যটি সমস্ত প্রকার চালিকা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষমতা ব্যবহারের উপর তার অধিকার বিস্তার করে। সে ক্রমশ দিব্য ইচ্ছা শক্তির অধিকার হয়ে ওঠে এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যেন সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী

করে তোলে। কিন্তু এই ধরনের সংমিশ্রণ মানুষের মধ্যে পাওয়া খুব কঠিন কারণ আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে মানব আত্মাকে সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জাগতিক ঘটনা এসবকে অস্বীকার করে জীবনের সারবত্তাটুকু ভালভাবে উপলব্ধি করতে হয়। একটি আদর্শবাদী মনের পক্ষে এই ধরনের অবস্থার ওপর সম্পূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে।

এই অসুবিধা যতক্ষণ পর্যন্ত না কাটিয়ে ওঠা যাবে ততক্ষণ ইচ্ছাশক্তি মানুষের মধ্যে সাধারণ ইচ্ছার মতই বসবাস করবে এবং সাধারণ জীবন, আদর্শ জীবনের কাজ অনিচ্ছুক পৃথিবীর নিঃশব্দ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নানা অসুবিধায় পড়বে। এর ফলে ভাল কিছু অতি সামান্য পরিমাণেই হবে। এইভাবে কোন কোন সময়ে যা যুগে প্রভূত প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ নেওয়ার পরেও যেন মনে হয় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন নি কারণ চারিদিকে দেখা যায়। হৃদ্ছাড়া কাজ, ক্রমভঙ্গুর আদর্শ প্রতিনিয়ত বাস্তব জগতের প্রাচীরে প্রতিনিয়ত ধাক্কা খেয়ে যেন আরো ভেঙ্গে যেতে থাকে, অপরিমিত শক্তি, অসংখ্য ধারণা একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এমন সময় যেন নিরবচ্ছিন্ন জগৎ জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন ঝড় বয়ে চলে ঠিক তখনই বিক্ষুব্ধ মন বিক্ষুব্ধ জ্ঞান ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ জয়ী আদর্শের জেগে ওঠার সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করে। এবং একই সঙ্গে আশা করে কোন 'মসিহা' (Messian) বা কোন "অবতারের' সম্বন্ধে ধারণা বা চিন্তা মানুষের মনকে অধিকার করে ফেলে। মনে হয় পৃথিবীতে এমনই এক সময় আগত প্রায় কিন্তু সেই আশা বা সম্ভাবনা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নির্ভর করছে মানুষের আত্মা পরিচ্ছন্ন, খাঁটি আদর্শকে আঁকড়ে ধরার জন্য যে বিশ্বাস, যে চিন্তা, যে জীবন বোধের প্রয়োজন তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ভাবে সৎপ্রচেষ্টা হয়েছে কিনা তার ওপর। "মসিহা" বা "অবতার" আর কেউ নন মানুষের যে দিব্য চিন্তা মানুষের চেতনার মধ্যে তার অর্থ খোঁজার যে চেষ্টা এবং মানুষে অন্তর্দৃষ্টির যা আদর্শে শক্তিকে কার্যকরী করে তোলে তারই একটি রূপ।

২.৪ যোগ এবং কর্মদক্ষতা (YOGA AND SKILL IN WORKS)

গীতায় বলে যোগ হচ্ছে কর্মের দক্ষতা। প্রাচীন শ্লোকে এই প্রবচনটি যে অর্থ বহন করে তা হ'ল যোগ হচ্ছে মানুষের মনের একধরনের এবং মনের একটি যথাযথ অবস্থা যেখান থেকে কর্মের জন্য সঠিক নীতি, সার্থক কাজের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক এবং দিব্যভাবের প্রকাশ হয় ঠিক যেমন স্বাভাবিক নিয়মে একটি বীজ পরবর্তীকালে একটি বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে একজন চতুর রাজনীতিবিদ বা ব্যবহারজীবি অথবা একজন কর্মকারকে যোগী পুরুষ বলে অভিহিত করা হবে। এর অর্থ এও নয় যে; যে কোন বিষয়ে কর্মদক্ষ মানেই যোগ। কিন্তু যোগ হ'ল এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সমতা এবং ঈশ্বরের সমন্বয় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। একজন কর্মযোগী আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির দিব্য ছন্দকে দম্ভের শিকল ছিঁড়ে মনের অনুভূতির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে যথাযথ ভাবে মেলাতে পারেন।

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে যোগ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থাকে ঝেড়ে ফেলে চেতনাকে এক নতুন, উন্নততর এবং বিস্মৃত অবস্থায় তুলে নিয়ে যেতে পারি যা আমাদের জীবজগতে অন্য সাধারণ প্রাণী বা সাধারণ বুদ্ধিজীবিদের থেকে আলাদা করতে শেখায় এর ফলে সে সার্বজনীন সৃষ্টি তত্ত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই নিরাকার অনাদ্যী অথচ সকল বস্তুর উৎসকে অনুভব করতে শেখে। সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ চিন্তাভাবনা থেকে ঈশ্বর সচেতনায় উন্নীত হওয়ার পথ হলে যোগ। এই উন্নতির পথে আমরা অনেক

পর্যায় এবং স্তর দেখতে পাই; পাহাড়ী উপত্যকার পর উপত্যকা পার হয়ে তারাই যেন তার শিখর সত্যের ছোঁয়া পায়। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ের মাত্রা আরো কঠিন এবং উন্নত থেকে উন্নততর এ কথা গীতায় বলা আছে। এই নিয়মের সামান্য কিছু এবং এর অন্তর্নিহিত ক্রমবিন্যাস আত্মাকে বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে, এমনই বিপদ যা জাগতিক অবরোহনের ফল অজ্ঞতার বিপদ যা মানুষের বোধ শক্তিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে চিরকাল সীমাবদ্ধতার মধ্যে বেঁধে রাখে। অপরিষ্কার মন থেকে উদ্ভূত পাপ এবং বেদনা, এমন কী যখন সে উচ্চাশার রাজবেশ পরিধান করে আছে তখনও তার মনে চির দৈনতার ক্ষত বেদনা জমে থাকে। যোগের উপকারিতা বা কার্যকারিতা হ'ল এটি আমাদের সামনে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের ভ্রমাত্মক আবর্ত থেকে মুক্ত হওয়ার পথ খুলে দেয়।

গীতার ভাবনায় কর্মের সম্বন্ধে ধারণা হ'ল এটি একটি বিস্তৃততম সম্ভাব্যতা। মানুষের মধ্য প্রকৃতির প্রতিটি আচরণ ধরা থাকে সে অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক যেমনই হোক না কেন, মনের সঞ্চালন বা দৈহিক ব্যবহার, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র যা কিছু হতে পারে। নায়কোচিত পরিশ্রম থেকে সামান্য চর্মকারের কঠোর পরিশ্রম, একজন মহাজ্ঞানীর শ্রমসাধ্য সাধনা থেকে সাধারণ অতি সরল খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া সবই এই কর্মের অন্তর্গত। চিন্তার মধ্য দিয়ে আত্মানুসন্ধান হৃদয়ের আবেগ দিয়ে চির উন্নতের পূজা করা নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রীর আহরণ করে ঈশ্বরের এবং মানুষের সেবায় সে সব ব্যবহার করা এক্ষেত্রে দুটিই সমমানের ক্রিয়া কলাপ। বোধবৃক্ষের নীচে বসে বুদ্ধদেব আলোক জ্যোতি অধিকার করলেন তাঁর গুহায় বসে স্থবিরতা এবং নিঃশব্দ সৌন্দর্যবোধ উপলব্ধি করেন। শঙ্করাচার্য সারা ভারতব্যাপী প্রতিটি মানুষের কাছে বহু বিতর্কিত নিঃশব্দের বাণী প্রচার করেন এ সবই মহৎ কর্মের এক একটি রূপ। একজন সাধারণ মানুষ এবং একজন যোগীর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ হয়ত আপাত দৃষ্টিতে একই রকম মনে হলেও অভ্যন্তরে উভয়ের মধ্যে বিরাট তফাৎ থাকে। এই তফাৎ তাদের সত্তার অবস্থায়, এ তফাৎ তাদের ক্ষমতায় এবং মৌলিকতায়, তফাৎ তাদের ইচ্ছা শক্তি এবং মানসিক গঠনগত প্রকৃতিতে আমাদের কর্মই আমাদের পরিচয় সে জীবিত, যে বর্তমান সে নিজের সম্পর্কে সচেতন এই সচেতনতা নিজেকে জ্ঞান এবং ক্ষমতার নির্দিষ্ট রূপদান করে। কর্ম হচ্ছে এই দুই ক্রিয়াশীল শক্তির ফল। মানুষের মন, জীবন এবং শরীর তার মধ্যে যতটুকু নিহিত আছে সেই অনুযায়ী কাজ করে। আমরা যখন বলি যে সকল বস্তু তার স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে তখন আসলে আমরা এই কথাগুলিই বোঝাতে চাই। দিব্য অস্তিত্বই হ'ল একমাত্র খাঁটি এবং অসীম এটি সবকিছু নিয়ে সত্তার নিজস্ব আবিষ্ট রূপ - এটিই 'সৎ' আত্ম জাগরণের বা আত্ম অবগতির জন্য যে সীমাহীন অনাবিল প্রচেষ্টা তাই 'সত্য'। দিব্য জ্ঞান হ'ল সত্যের জ্ঞান, দিব্য ইচ্ছা হল সত্যের ক্ষমতা দিব্য কর্ম হল সত্যের ধারণ যা বহু রূপে বহু ধারায় বিভিন্ন স্তরে নিজেদের অনুভব করায়। কিন্তু ঈশ্বর কোন বিশেষ কর্মের বিশেষ মুহূর্তের, বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ সম্পর্কের বা বিশেষ কোন নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি বিশ্বজনীন, সার্বজনীন এবং অনন্ত। তিনি মহাবিশ্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন তাঁর অন্তহীনতা বিশ্ব নিখিলের বিশালতার চেয়েও অনেক বড় মহাজাগতিক।

কিন্তু ব্যক্তি সত্তা বা অস্তিত্বের ক্রিয়াকলাপ এমনই যে তা যেন একটি বিশেষ চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ কারণ সে তার বিধিবদ্ধ কাজ কাজের ক্ষেত্র তার সময় এবং কাজের শর্ত এবং অবস্থার দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এরই মধ্যে সে তার স্ব-অস্তিত্ব, এবং বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। সে নিজে, তার জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, এবং তার জগত ও সমগোত্রীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তার চাহিদা এবং অপরের কাছ থেকে তার আকাঙ্ক্ষা।

এ সবকেই সে যথেষ্ট পরিমাণে সত্য এবং বাস্তব বলে বিবেচনা করে। এগুলোকেই সে কেন্দ্রীয় সত্য এবং বিশ্বজনীন বলে ধরে নেয়। আর এই ধরনের অহংবাদী ভুল থেকে যাবতীয় ভ্রমের উৎপত্তি হয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে সমস্ত সত্তা, সকল জ্ঞান, সকল ইচ্ছা নিজের মধ্যে আত্মোপলব্ধি এবং অপার আনন্দ খুঁজে পায়, একমাত্র এ ছাড়া ব্যক্তির কোন স্ব-অস্তিত্ব, কোন সত্যতা, কোন কার্যকরী শক্তি নেই। অতএব ব্যক্তির গুরুতর অমঙ্গলাদির থেকে রক্ষার উপায় হ'ল নিজেকে বিশ্বজনীন করে তোলা এবং জীবন তাকে সবসময় এই শিক্ষাই দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের একগুঁয়ে দম্ভ তাকে সবসময়ই শিক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছুক করে রাখে, সার্বজনীন ভাবে এই সুদূর প্রসারী দম্ভ কোন গোষ্ঠী, কোন পরিবার কোন সম্প্রদায় রাষ্ট্র এমনকি সকল মানবজাতীতেই আবদ্ধ নয় এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকে অতিক্রম করে মানুষকে দম্ভ ভুলে গিয়ে আরও সুদূর অনন্তের দিকে যেতে হবে। মুক্তির জন্য নিজেকে বিশ্বজনীন করাই যথেষ্ট নয়, যদিও এর এটি তাকে অনেকটা মুক্ত এবং সত্যিকারের স্বাধীনতার অনেকটা কাছে নিয়ে যায়। নিজেকে বিশ্বজনীন করা একটি পদক্ষেপ কিন্তু বিশ্বজনীন হওয়ার বাইরেও যে দিক নির্দেশ এবং সঙ্কল্প আছে তা হ'ল মহাজাগতিক অনন্ত যার কোন স্ব-অস্তিত্ব নেই, সত্যতা নেই, অকাট্যতা নেই, যা আছে তা হ'ল দিব্য সত্তা, দিব্যজ্ঞান, দিব্য ইচ্ছা, এবং ক্ষমতা। যে মহাবিশ্বকে অতিক্রম করতে পারে তার এত আনন্দ হয় যে বলা যেতে পারে তার সত্তার সামান্য একটু অংশ, তার চেতনার একটি মাত্র রশ্মি থেকেই সে মহাপৃথিবী সৃষ্টি করতে পারে। অতএব বিশ্বজনীন মনের অতি অবশ্যই সৃষ্টি সংক্রান্ত চেতনা বোধ থেকে সমস্ত সত্তার বোধ দিয়ে এ জগতের ক্রিয়া কলাপ এবং গতিপ্রকৃতিকে দেখা উচিত। এই মৌলিক সত্য থেকেই যৌগিক চেতনাবোধের শুরু; এটি ব্যক্তিকে বিশ্বজনীন হতে সাহায্য করে এবং তারপর সৃষ্টির সূত্রকে ছাপিয়ে যেতে সাহায্য করে। তার এই রূপান্তর শুধুমাত্র তার সত্তার অবস্থানের উপরেই কাজ করে না তার কাজের মধ্যে সদা সচেতন থাকে।

গীতা আমাদের বলে যে আত্মা এবং মনের সমতাই হচ্ছে যোগ এবং এই সমতাই হল ব্রাহ্মণত্বের ভিত্তি। যোগীরা উচ্চ অনন্ত চেতনার জন্য আকুল হয়ে থাকেন। এখন মনের সমতার অর্থ-হ'ল সার্বজনীনতা, আত্মার সার্বজনীনতা ব্যতীত একধরনের উদাসীন অবস্থা বা পক্ষপাতশূন্য স্ব-নিয়ন্ত্রণ বা সুপরিচালিত মনের গঠনও হতে পারে, কিন্তু আবার সার্বজনীনতা বলতে যা বোঝায় এগুলি ঠিক তা নয়। সমতা বলতে যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তা উদাসীনতা বা নিরপেক্ষতা নয় বরং প্রতিটি মানুষের প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত ঘটনার প্রতি একাগ্রচিত্ত থাকার কথা বলা হয়েছে কারণ এটাই হচ্ছে একেশ্বরেবাদিতার ধারনার ভিত্তি। মানুষ ভুলবশত ভাবে যে এই ধরনের সমতা দৈনন্দিন কর্মের সাথে বেমানান। যে কোন অবস্থাতেই এটি এক বিরাট ভুল ধারণা যারা বুদ্ধিজীবী মানুষ তারা মনে করেন যে তাঁদের আশা, আশঙ্কা, কামনা এবং স্ব-নির্ধারিত ইচ্ছে আবেগের দ্বারাই সকল কর্ম সাধিত হয় এবং তাঁদের বুদ্ধিমত্ত নিজেদের কাছে নিজেদের মত করে এর যাথার্থতা প্রমাণ করেন। এটি সত্য হলেও হতে পারত যদি সেই ব্যক্তি জগদীশ্বরের হাতে গড়া সামান্য এক কুশীলব না হতেন কিন্তু আমরা সকলেই ভাল করে জানি যে বিজ্ঞান ও দর্শন আমাদের এই সত্য বলে আমাদের মধ্যে দিয়েই সার্বজনীনতা কাজ করে আমরা হলাম তারই প্রতিমূর্তি। ব্যক্তি মন নিজের মত করে বিশ্বজনীনতা প্রতি যে অজ্ঞতা এবং অশ্রদ্ধা পোষণ করে তা পুরোপুরি একটি ভ্রমের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে এবং এই ভুলের জন্য কখনই সে জ্ঞান এবং সত্যকে পায় না। এই রকম মন কখনই কোন কাজে প্রকৃত দক্ষতা অর্জন করতে পরে না, মিথ্যা বা অর্ধ-সত্য দিয়ে শুরু করে ভুলে ভরা কাজ তাকে আরো একটি মিথ্যা বা অর্ধসত্যে উপনীত করে যা আমাদের তৎক্ষণাৎ বদলে ফেলা উচিত এবং এ না হলে সারা জীবন কেঁদে কেটে কষ্ট এবং দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাবে

কোথাও একটু থিতোনোর জায়গা পাওয়া যাবেনা। কর্ম দক্ষতা তো হবেই না। কিন্তু মহাবিশ্ব তো সকলের জন্যই এক আর তাই এর অঙ্গীকার শুধু স্ব-ইচ্ছার অগ্রাধিকারের কাছে নয় বরং দিব্যজ্ঞান, দিব্য চেতনার চির সত্যের দ্বারা পরিচালিত যা অসীম এবং ত্রুটি মুক্ত।

অতএব যে সত্তা একজন যোগীকে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে তা হল প্রকৃত সমতার ভিত্তি থেকে তার জাগরণ সকলের মধ্যে এক এবং অভেদ এর অস্তিত্বকে অনুভব করা, দেহের অভ্যন্তরে যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে তাকে আলিঙ্গন করা ইত্যাদি। একজন যোগীর কাছে মন, জীবন, শরীর এসব অতি তুচ্ছ বস্তু। অধিকন্তু সে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজের মধ্যে অনুভব করে এই অনুভূতির জন্য ক্ষুদ্র দম্ভ বা সঙ্কীর্ণতাময় নয় এর জন্য চাই আত্মার অসীম, বিশাল ব্যাপ্তি যার সাথে সে প্রতিনিয়ত পরিচিত হতে থাকে। দিব্য জ্ঞান, দিব্য চিন্ত এবং দিব্য ক্ষমতা বলে জগতের সকল ঘটনাই সে তার সত্তার মাঝে দেখতে পায়। সে সচেতন ভাবে সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করে এবং দিব্য আলোকে সব কিছু দেখতে পায় এমনকি তার কর্মধারা যদি অন্যের চেয়ে আলাদা পথেও চলে তবুও সে নিজের পছন্দ এবং আকাঙ্খার জন্য সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না। এটি প্রমাণিত যে এই ধরনের ব্যাপ্তি এক সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে এই রকম ক্রমবর্দ্ধমান অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপ্তি আসলে জ্ঞানেরই ব্যাপ্তি। যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈদিক আকৃতি বা অবয়বের অনুশীলনের ফলে আমাদের মধ্যে "বরুণ" এর জন্ম হয়। বরুণ -- আধ্যাত্মিক জীবনের এক বিশাল আকাশ। ব্যাপ্ত অস্তিত্বে যা দিব্য এবং অসীম সত্য। এই ব্যাপ্তির মধ্যে "মিত্র"র জন্ম। আলোকময় ঈশ্বর তার অসীম করুণা দিয়ে আমাদের সকল ভাবনা চিন্তা ইচ্ছা, এবং কার্যকলাপকে গ্রহণ করে এক দিব্য ঐকতানে বেঁধে ফেলেন তিনিই আমাদের যাত্রা পথের সারথী এবং সকল কর্মের নির্দেশক। এই ব্যাপ্তি এবং ঐকতানের ডাকে আমাদের মধ্যে "আর্যমান" ফুটে ওঠে। এর ফলে আলোকিত এক দিব্য ক্ষমতার উদ্রেক হয় একটি উদ্গত শক্তি এবং সমস্ত কিছু বোঝার মত কার্যকরী ইচ্ছার জন্ম হয় এবং এই তিন থেকে অন্তরে বসবাসকারী "ভগ" সৃষ্টি হয়; এক ঐশ্বরিক, স্বর্গীয় পরমসুখ এবং এক সর্বাধিকার আনন্দ যা সমস্ত বেসুরো, কর্কশ দুঃস্বপ্নকে আড়াল করে এবং সমস্ত অস্তিত্ব এবং সকল বস্তুর অধিকারকে আর্থমানের ক্ষমতার গৌরবের আলোয় ভাগ করে নেয়। মিত্র'র ভালবাসা আলোয় বরুণের ঐক্য। এই দিব্য জন্ম হতে পারে আমাদের কর্মের জাতক -- এমন সৃষ্টির চেয়ে আরও বড় দক্ষতা আর কি-ই বা হতে পারে, এর থেকে আরো বেশী বাস্তব এবং সার্বভৌম কী থাকবে পারে?

২.৫ সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি (CONSERVATION AND PROGRESS)

কোন কাজ বা কোন কিছু সম্বন্ধে মানুষ সাধারণত সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা করে অথবা কোনভাবে জোড়াতালি দিয়ে আপোস করে নেয়। এ বিষয়ে হয় সে অযৌক্তিক ভাবে মাত্রা বজায় রাখার চেষ্টা করে অথবা একটি মাত্র ধারণার উদ্দীপনার কাছে আত্মসমর্পন করে এইভাবে মানব সত্তা থেকে সর্বদাই সত্যের আলো হারিয়ে যায় এবং সঠিক কর্মের ক্ষেত্রটি হারিয়ে যায় কারণ তার প্রকৃতিগত অন্যান্যরা যেমন দর্শন এবং অনুভূতির মাধ্যমে বিশ্ব প্রকৃতির বাধা হয়ে থাকে, সে তার পরিবর্তে সর্বদাই সমস্ত বস্তুর মান সে তার বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী যেমন স্থির করেছে সেই অনুযায়ী মাপতে সচেষ্ট থাকে। মানব মন কোন কিছুর বিচার বিশ্লেষণে যথেষ্ট দৃঢ় এবং তৎপর। এটি মনের সঙ্গে শ্রমের সংশ্লেষ ঘটায়। এটি বিভাজন করে বিরোধিতা করে এবং এই বিরোধিতার মাঝেই বহু কিছুর সৃষ্টি হয় এরই মধ্যে কেউ একজন কোন বিশেষ ধরনার অনুগামী ব্যক্তিতে পরিণত হন কিন্তু

পক্ষপাতহীন এবং সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে এটি স্বাভাবিক মানব সত্তার প্রতি বিরক্তিকর এবং নিদারুণ বিরক্তিকর ব্যাপার। সমস্ত মানব কর্ম এবং ভাবনা এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতার দ্বারা আক্রান্ত। মানব মনের এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং অগ্রগতির পরিপন্থী। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছু স্থির অঞ্চল হয়ে থাকতে পারে না কারণ সেখানে যা কিছু আছে তা সবই সময়ের ছাঁচে ঢালা আর সময়ের প্রধান বৈশিষ্টই হল চলমানতা এবং এগিয়ে চলা। তাই নিশ্চল হয়ে থাকা অসম্ভব এক কাল্পনিক ভ্রম আত্মাই একমাত্র স্থির, স্থিতিশীল অন্তর এবং দেহ সদাই গতিময়। এই গতিময়তার তিনটি নির্ণায়ক ক্ষমতা হল অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান।

অগ্রগতির অতীত নানাবিধ টানাপোড়েনে ভরা। এসবের মধ্যে থেকেই বর্তমানের সৃষ্টি এবং এই শক্তির একটি বিরাট অংশ ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করছে। অতীত মানেই মৃত নয়, আসলে এটির আকৃতি বা রূপ পিছনে চলে গেছে, তাই যার কারণ সেটাই নিয়ম। অতীত যদি পিছনে চলে না যায় তবে বর্তমান সামনে আসবে কী করে কিন্তু তার অন্তর তার ক্ষমতা, তার সৌরভ বর্তমানের গভীরে চির ঘনীভূত, বর্ধিত এবং প্রোথিত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকে। প্রত্যেক মানুষের পিছনে তার স্ব-জাতির অতীত, তার মানবিকতা এবং নিজস্বতা লুকিয়ে থাকে, এই তিনটি বস্তু তার জীবনের সূচনা চিহ্ন এবং সারাজীবন ব্যাপী তার অগ্রগতি স্থির করে দেয়। এটি তার অতীতের শক্তি যার জোরে যে অদেখা অনিশ্চিত, অনালোকিত ভবিষ্যতের মোকাবিলা করার সাহস পায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অচেনা অনন্তের দিকে এগিয়ে যায়। যদিও আংশিক ভাবে এও এক ধরনের জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া কারণ অজানা, অচেনা প্রতি মানুষ সর্বদাই ভীত, তার চেয়ে সে তার অতীতকে অনেক বেশী আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় কারণ যেহেতু অতীত তার জানা তাই অতীত সম্বন্ধে সে অনেক বেশী নিশ্চিত। অতীত কে সে সবসময় পায়ে নীচের শক্ত এবং নিশ্চিন্ত ভিত্ বলে মনে করে। পুরোনো অবলম্বন যাকে ঘিরে তার বহু সংযুক্তি এবং অনুষঙ্গ সেই সব শক্ত করে জড়িয়ে থাকা আকর্ষগুলি ঝরে যেতে পারে, আবার অংশত অতীতের কিছু শক্তি, কিছু টান তাকে সদাজাগ্রত ভাবে ধরে রাখে যাতে সে অনিশ্চিত স্রোতেও ভেসে না যায় এবং অগ্রগতিকে থিতিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে। ভবিষ্যৎ আমাদের মধ্যে একধরনের কম্পন জাগায় এমনকি আমাদের অপ্রতিরোধ্য ভাবে আকর্ষণ করে। ভবিষ্যৎ যেন সেই প্রাচীন স্ফিংস যার দুটি মন এক ধরনের শক্তি যা একই সাথে নিজেদের দেয় আবার অস্বীকার করে, নিজেকে নিয়োজিত করে আবার প্রতিহত করে। আমাদের মসনদে বসাতে চায় আবার হত্যাও করতে চায়। কিন্তু তাই বলে ভয় করার চেষ্টা থেকে সরে এলে চলবে না। জীবনের ওপর বাজি ধরতেই হবে। ভবিষ্যতের দ্বারা অর্পিত মৃত্যুর মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে, ঠিক যেমন আমরা জীবনের মুখোমুখি হই। এবং তার জন্য ভীত হওয়া চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতি নিয়তই আমাদের যা কিছু পুরনো তার মৃত্যু হয়ে চলেছে কারণ আমরা নবরূপে, বৃহত্তর ভাবে আরও কার্যকরী ভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের এগিয়ে চলতেই হবে আর তা যদি না হয় তার সময় আমাদের শত বিলাসী অনড় হয় থাকার ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য করবে এগিয়ে যেতে। তারাই হলেন মাহাত্ম যারা ভবিষ্যৎকে ভয় পান না; তার ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতার আহ্বানকে গ্রহণ করেন তার উপর বাজি ধরতে ভীত নন; কারণ তাঁদের ঈশ্বর বা সেই বিশেষ ব্যক্তির উপর পূর্ণ আস্থা আছে যা জগত কে পরিচালিত করছে, অসীমের সঙ্গে যুঝবার মত মানসিক ঔদ্ধত্য এবং অসম্ভবকে অনুভব করার ক্ষমতা এসবই তার মধ্যে একজন প্রকৃত যোদ্ধার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে এই লক্ষণগুলি একজন অবতার এবং ধর্মগুরুর মধ্যে ফুটে ওঠে আবার এই একই গুণ আমরা একজন মহান আবিষ্কারক এবং শোধনবাদীর মধ্যেও দেখতে পাই।

আমরা যদি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা করি তা হলে অবশ্যই দেখব যে অতীত হল সংরক্ষণের

এক বিরাট শক্তি কিন্তু সংরক্ষণের জন্য তা কখনই নিশ্চল নয় বরং উল্টো করে বলা যায় যে এটি নিজেকে পরিবর্তন এবং নূতন কিছু ধারণা যেমন-বর্তমান প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং কিছু প্রকৃত নূতন উপলব্ধি যা অতীত আমাদের কাছে দাবী করে তার ভবিষ্যৎ হ'ল নূতন ধারণার সেই শক্তি যা হয়ত এখুনি দেখা যাচ্ছে না অথচ অতীত জীবনের স্বার্থে সেই অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকেই এগিয়ে চলে এমন ধারণার উদ্রেক করে। তাহলে আমরা ধারণা করতে পারি যে এই তিনের মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধ নেই; আমরা দেখি এবং বুঝতে পারি যে এই তিনটি আসলে একটি বা একই বিচলনের বিভিন্ন অংশ অনেকটা যেন ঈশ্বরের তিনরূপ ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেবোত্তের প্রতীক রূপে একই কর্মের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান। তা সত্ত্বেও বিভাজন এবং বিরোধ দোষে দুষ্ট মানব মন মনুষ্যত্ব বা মানবিকতাকে আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভাজিত করে- - অতীত অনুগামী ব্যক্তি, বর্তমানের অনুগামী ব্যক্তি এবং ভবিষ্যৎ অনুগামী ব্যক্তি।

ভবিষ্যৎ অনুগামী নিজেদের প্রগতিশীল গোষ্ঠী বলে অভিহিত করেন। তাঁরা আলোর সন্তান এবং অতীতকে অজ্ঞতা, অপবিত্র এবং নানা দোষে দোষী সম্পূর্ণ ভুলে ভরা বলে ভৎর্সনা করেন। বর্তমানের অনুগামীরা ভয়ার্ত হয়ে সমস্ত অগ্রগতি এক অধার্মিক জঘন্য ভুলের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া বলে ধরে নেয়। সবই যেন অবক্ষয় এবং ধ্বংসের পথে চলেছে, বর্তমানে মানবতা তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। অতীত অনুগামীরা আবার দুই-প্রকার। প্রথম দল বর্তমানের খুঁতগুলিকে স্বীকার করে নেয় কিন্তু বর্তমানের উচ্চ নীতিগুলিকে সমর্থন করে তাদের নিখুঁত, নির্ভুল সমীহ করার মত অতীত যাকে বলা যেতে পারে মানব জাতির স্বর্ণযুগ। দ্বিতীয় দল বর্তমানকে অবক্ষয় বিভৎসতা, অভিশপ্ত, ভুলে ভরা বলে মনে করে তারা অতীতকে মনুষ্যত্বের সমস্ত আশার এবং তাদের পূর্বপুরুষের জ্ঞানের গরিমায় গর্বিত বলে ভাবে। এই ধরনের শিশু সুলভ বিতন্ডার ফলে বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তানায়কগণ তাঁদের ক্ষমতা হঠাৎ প্রতারিত হতে হয় ভুল করে এমন কাউকে দিয়ে বসেন, তাদের নজরকাড়া ধারণা আবেগের উত্তাপ বা তীব্র ধর্মীয় আকুলতা যেগুলিকে তাঁরা তাঁদের আত্মোদঘাটনের ভাষা, আলো এবং সত্যের শক্তি বলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে এসেছেন সে সবই অপাত্রে দান হয়ে যায়।

একজন প্রকৃত চিন্তাবিদ নিজেকে বিভিন্ন মতের অনুগামীদের সাথে সুন্দর ভাবে মিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি সার্বিকভাবে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল দেখার জন্য যে দিব্য স্বর্গীয় আন্দোলন তার জন্য ব্যাকুলভাবে বেঁচে থাকেন শুধু এটুকু জানার জন্য যে বৃহদার্থে স্বর্গীয় উদ্দেশ্য কী অভীষ্ট লাভ হ'ল; তিনি এর মধ্যে কোন আনুমানিক অনুপুঙ্খ বিচার করতে চান না। নিজেকে বিযুক্ত রেখে তিনি অতীতের গরিমাকে এবং তার গুঢ় অর্থকে বুঝতে চান কারণ তিনি জানেন যে যুগে যুগে অনেক কিছুই গঠন বা আকার আকৃতি বদলায়। একমাত্র নিরাকারের কোন বদল হয় না এবং অতীতের কখনও পুনরাবৃত্তি হয়না। কিন্তু শুধুমাত্র তার সৌরভ বা নির্যাসটুকু থেকে যায় তার ক্ষমতা তার শুভ আত্মা এবং মহৎ এবং আত্মতৃপ্তির জন্য যে পুঞ্জীভূত প্রনোদনা তা কাজ করে যায়। সে বর্তমানের প্রকৃত বোধটিকে একটি মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করে এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। অনেক আন্তরিকভাবে এর খুঁতগুলিকে বিশ্লেষণ করে আত্মতুষ্টির ভুল আগে থেকে তৈরী করা কিছু ভান এবং ভনিতা সে সবেরও খেয়াল রাখে কারণ এগুলি অগ্রগতির প্রধান শত্রু। কিন্তু বর্তমানের কাছ থেকে যতটুকু সত্য এবং ভাল সে পেয়েছে তাকে কখনই অস্বীকার করে না কারণ সেই যে ভবিষ্যৎকে বলবে উপলব্ধির মধ্যে কী স্বর্গীয় আনন্দ আছে তাকে বুঝতে হবে আর তা শুধু বর্তমানে মূহুর্তের জন্যে নয়। শুধু পরবর্তী প্রজন্মে নয় বরং আরও বহু পরের প্রজন্মকে জানাবে, আর এই জন্য তাকে বলতে হবে, বুঝতে হবে প্রয়োজনে লড়াই করতে হবে যেহেতু লড়াই হ'ল একমাত্র পন্থা যা প্রকৃতি আজও মানুষের মধ্যে জিইয়ে রেখেছে তাই মানুষ কোন একটি বিশ্বাস, একটি উপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠিত

করতে আজও লড়াই করে চলে একথা জানা সত্ত্বেও যে আজ সে যা জানে তার বাইরেও অনেক কিছু থাকতে পারে একদিন হয়ত যা আলোর নীচে উদ্ভাসিত হবে, এমনও হতে পারে যে আজ সে যতটুকু জানে বলে দাবী করছে তা হয়ত ত্রুটিপূর্ণ এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞান তবু সে নিজের বিশ্বাসের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। অতএব সে কোন আগাম ধারণা এবং দম্ভ ছাড়াই কাজ করবে কারণ সে জানে যে তার নিজস্ব ত্রুটি এবং যার জন্য সে লড়াই করছে তারা একই রকমের তবু এই লড়াই না করলে সত্যের জন্য মানব জীবনের যে আন্দোলন ঢাকা পড়ে যাবে এবং দিব্য আদর্শ থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে যাবে

২.৬ রক্ষণশীল মন এবং প্রাচ্যের অগ্রগতি (THE CONSERVATIVE MIND AND EASTERN PROGRESS)

মানুষের মনে আমূল পরিবর্তিত ধারণার উদয় মানব জীবনে এবং সমাজে বিরাট এক আসন্ন পরিবর্তনের সঙ্কেত বহন করে এটির হয়ত মোকাবিলা করা সম্ভব। পুরাতন ধারণার প্রতিক্রিয়া হয়ত কিছু সময়ের জন্য দায়ী হয় কিন্তু সংগ্রাম কখনও থেমে থাকে না, মানুষের চিন্তা, মানসিক আবেগ অথবা অভ্যাস এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার শুরুর দিনও যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। জেনে কিংবা না জেনে যেভাবেই হোক একথা সত্য যে মানব সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে রক্ষণশীল মন এই নিয়মকে মেনে নিতে চায় না, সমগ্র মানব ইতিহাস জুড়ে এই জিনিস দেখা গেছে। চাইলে প্রতিটি যুগে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে যে গুলি এক বড়যন্ত্রময় দিক চিহ্ন রেখে গেছে। বিবর্তন এবং আন্তনীয় গণতন্ত্রের শেষে, রোমান প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে রূপান্তর, রোমের ধ্বংসাবশেষ থেকে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উত্থান, ইউরোপের খৃষ্টীয়করণ, সংশোধন এবং নবজাগরণের ফলে এক নূতন সমাজের সৃষ্টি, ফরাসী বিপ্লব আধুনিক সময়ের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দ্রুত আন্দোলন এবং সংগঠিত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা দূরীকরণ এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ধরনের কিছু না কিছু দেখা যাবে কারণ ইউরোপীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত রাজনৈতিক কিন্তু আমরা কখনই একই মনোযোগ সহকারে সমাজ ও ভাবনার মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা পরিবর্তনগুলিকে লক্ষ্য করি না। যদিও আমরা প্রধান দুটি পরিবর্তনের চক্রকে চিনতে পারি এর মধ্যে একটি হল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রাচীন জাতি সমূহের সুশিক্ষিত সমাজে পরিণত হওয়া যাকে আমরা গ্রীসিও রোমান সভ্যতা বলে থাকি এবং অন্যটি আধা বর্বর খৃষ্টীয় সামন্ত যুগের আধুনিক কালের উপযোগী বুদ্ধিজীবি, বস্তুবাদী এবং সুসভ্য সমাজে পরিণত হয়ে ওঠা।

এর বিপরীতে প্রাচ্যে যে বিপ্লব হয়েছিল তা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক। যদিও রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন যতটুকু হয়েছিল তাও সত্য এবং স্বাভাবিক এবং মনে রাখার মত, ইউরোপের তুলনায় হতে পারে তা হয়ত কিছুটা ম্রিয়মান, অগভীর, তাই ভারতীয় সমাজ বিপ্লব হয়ত কিছুটা ইউরোপীয় নবজাগরণের ছায়ায় ঢাকা, কিছুটা উপেক্ষিত, এর পাশাপাশি এই অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছুকে জোর দেখানোর প্রবৃত্তি শুধুমাত্র নিজেদের আশ্বস্ত হওয়ার জন্য। এমনও দেখা গেছে যে পুরানো ধ্যানধারণা, কিছু নিয়মকানুন ইত্যাদি যত্ন সহকারে রেখে দেওয়া হয়েছে অথচ যে বিষয়ে ভিত্তি করে এই সব ধারণ ইত্যাদি সেই বিষয় বস্তুই নিজেই অনেক পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হয়েছে একমাত্র তার মূল অর্থটুকু কাল্পনিক আখ্যানের মত রয়ে গেছে। তাই জাপান অত্যন্ত বিচক্ষনতার সঙ্গে নিজেকে ধর্মাশ্রিত রাজতন্ত্রের আড়ালে রেখে একটি ঐতিহ্যশালী সামন্ততান্ত্রিক সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং একই সঙ্গে নিজেকে আধুনিক যুগোপযোগী করে এগিয়ে এনেছে এবং

এধরনের মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার থেকে আধুনিকতার রূপান্তরের জন্য তাকে খুব বেশী গুরুতর বেগ পেতে হয়নি। ভারতবর্ষে সামাজিক ব্যবস্থায় যে প্রাচীন এবং কাল্পনিক চতুরাশ্রম প্রথা যার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ, সামাজিক ধরন, নৈতিকতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তা আজও বজায় আছে এবং এমনভাবে চলে আসছে যে জাতি এবং বর্ণভেদের জটিল প্রথা আজও বিদ্যমান যা মানুষে মানুষে বিভেদ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না, এটি এখনও কিছু বিভ্রান্তিকর প্রাচীন ধারণার অবশিষ্টাংশ নিয়ে চলেছে যা পুরোপুরি একটি মানুষের তার অগ্রাধিকার স্থানীয় রীতিনীতি, এবং ধর্মসারের উপর জন্মসূত্র ভিত্তি করে ছড়িয়ে আছে। মনুষ্য সমাজের ইতিহাসে সবচেয়ে কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা হল এক অবস্থা থেকে যখন অন্য আর এক অবস্থায় সামাজিক রূপান্তর ঘটে তখন মানসিকতার যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তার বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে আজও এটির বুদ্ধিদীপ্ত অনুধাবনের প্রয়োজন আছে।

সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে কোন ধারণা যেভাবে কাজ করে চলে তার মূল্যায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়। এখন আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে ১৬শ (ষোড়শ) লুই এর ভুল ভ্রান্তি বা রুশো ইত্যাদির কীর্তিকলাপের বিচার না করে আমাদের ফরাসী বিপ্লবের সূচনা কীভাবে হয়েছিল সেটি জানা অনেক বেশী জরুরী, এবং তার জন্য আরো অতীতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং সে সব ঘটনার প্রচন্ড বহিঃপ্রকাশ এবং জয়, ফ্রান্সের ক্যালভিনিয়ের মতের পুনর্গঠনে পরাজয় সুনিশ্চিত করে এবং ত্রয়োদশ এবং চর্তুদশ লুইয়ের শাসনকালে কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তির জায়গায় মহত্ব এবং আভিজাত্য শর্তহীন ভাবে ফ্রান্সের ইতিহাসে জয়লাভ করে। এই সময় গির্জা তথা ধর্ম সমিতির অধঃপতন, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে নেতাদের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে নেতৃত্ব দানের অভাব এবং আভিজাত্যের লোপ ইত্যাদি হতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতির কার্যকলাপের মধ্যে মানব জাতির জন্য আরো অনেক আন্দোলন সুপ্ত হয়েছিল, এবং যে আন্দোলনের মাধ্যমে মানবজাতির সম্পূর্ণ অজান্তে তার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছিল এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের মানসিকতা এতটাই রক্ষণশীল যে প্রকৃতি যে তাকে পাল্টে দিচ্ছে সেই পরিবর্তনটুকু ও সে ধরতে পারে নি। প্রাচ্যের মানসিকতা তাই সবসময় এই বিভ্রম পোষণ করত যে তার মধ্যে কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটেনি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের ধারণার প্রতি পূর্ণ আস্থা, নিজেদের ধর্ম, পরম্পরা প্রতিষ্ঠান সামাজিক আদর্শ এসবই তাদের মধ্যে একটি দিব্য এবং অনড় স্থবিরত্ব প্রদান করেছে তাদের চিন্তা এবং দৈনন্দিন জীবন চর্চা উভয় ক্ষেত্রে এমন প্রভাব পড়েছে যে মানব জীবনে যে স্বাভাবিক পরিবর্তন আসে যার দরুণ মানুষ নিজে এবং তার সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সময়ের ধাক্কায় কোন ভাবেই অপরিবর্তিত থাকতে পারে না, হয় সেগুলির অগ্রগতি হবে নয়ত বা ক্ষয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এই বাস্তব সত্যটিকেও সে স্বীকার করতে চায় না। বৌদ্ধধর্ম এল আবার তা লুপ্ত প্রায় হয়ে গেল অবশ্য হিন্দুরা বৈদিক ধর্মকে আঁকড়ে এখনও রয়ে গেছে নিজেকে আর্য চিরায়ত ধর্মের অনুসারী বলছে। একান্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে তবেই আমরা এই বিভ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। বুদ্ধ আজ ভারতবর্ষের বাইরে চলে গেছে একথা ঠিক তবে তার বৌদ্ধধর্ম রয়ে গেছে। জাতীয় ধর্মের আত্মায় এর বিরাট ছাপ রয়ে গেছে, বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির মাঝ পথে এটি কোথাও যেন তান্ত্রিক আচার ধর্মের সঙ্গে মেল বন্ধন ঘটিয়েছে।

এটি যা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে কোন মানুষের পক্ষে তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয় আবার এটি যা রেখে গেছে কোন মানুষের পক্ষে তাকে নষ্ট করাও সম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থে ঘটনা এই যে ভারতবর্ষে যে দ্বৈত চক্রের বর্ণনা

করেছে যার একটি বৈদিক যুগের সূচনা থেকে বুদ্ধ এবং অন্যান্য দার্শনিকগণ এবং অপরটি বুদ্ধের সময়কাল থেকে ইউরোপীয় উত্থান এই সময়গুলির তখনকার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সকল স্তরে নিজেদের মত করে ব্যাপ্তি পেয়েছিল, ঠিক যেমনটি ইউরোপের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। কিন্তু যেহেতু এই পরিবর্তনগুলি ছিল অধিকতর অভ্যন্তরীণ এবং প্রায় সবক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নূতন বস্তুগুলিকে তাদের পুরনো পরিচয়েই চিহ্নিত করা হত তাই আমাদের পক্ষে প্রাচ্যের কাল্পনিক অপরিবর্তনশীলতার ধারণাটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। ইউরোপীয় রক্ষণশীলতা মানবসমাজে পরিবর্তনের নিয়মগুলি বুঝতে শিখেছিল এও বুঝেছিল যে প্রগতিশীলদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতেই এই পরিবর্তন সঠিক জায়গায়, সঠিক দিকে এগোবে, কিন্তু প্রাচ্যের বা বরং বলা ভাল ভারতীয় রক্ষণশীলতা তখনও কল্পনা করে চলেছিল যে মরণশীল সত্তার ক্ষেত্রে স্থায়িত্বই হবে সঠিক, সত্য নিয়ম কালের গতিতে সে যৌগিক ধ্যানাসনেই ছিল মগ্ন কারণ সে কখনই নিজেকে নাড়াচাড়া করতে চায়নি কখনও নতুন করে কিছু চিন্তা করা পরিবর্তে নিজের মানসচক্ষুকে মুদ্রিত রেখেছে কালস্রোতের দু-কূলের দিকে কখনও চেয়ে দেখার অভ্যাস করেনি। কখনই বিশ্বাস করে নি যে প্রয়োজনে সে এই কালস্রোতের গতি রোধ করতে পারে।

এই ধরনের রক্ষণশীল নীতির কিছু সুবিধাও আছে ঠিক যেমন দ্রুত প্রগতির কিছু দোষ ত্রুটি আছে এটি ধারাবাহিকতার মৌলিক বিষয়গুলিকে রক্ষা করে যার ফলে সভ্যতা আরও দীর্ঘজীবি হয় এবং অতীতের মানবিকতার মূল্যবান বিষয়গুলিকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। তাই ভারতবর্ষে ধর্ম যদি দারুনভাবে তার রূপ এবং মানসিকতা পরিবর্তন করে থাকে তবে বুঝতে হবে যে সেই ধর্মীয় আত্মা চিরন্তন আধ্যাত্মিক চেতনতার গভীরে। নিয়ম নীতি সেই প্রাচীনকালে, অতীতে যেমন ছিল ঠিক তেমটিই আছে আর যদি পরিবর্তনগুলিকে খুঁজতে খুঁজতে বেদ এর অঙ্কুর বা আদিতে চলে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে মৌলিক আধ্যাত্মিক সত্যগুলি একই ভাবে সুরক্ষিত আছে বরং সেগুলি আরও ঐশ্বর্য মন্ডিত হয়েছে। অপরদিকে এই ধরনের মানসিকতার ফলে প্রচুর পরিমাণে উপলেপ পুঞ্জিভূত হতে থাকে যা হয়ত কোন এক সময়ে মূল্যবান ছিল কিন্তু এখন আর তার কোন গুণ নেই এবং এই স্তূপীকৃত নিষ্প্রাণ বাগবৈশিষ্ট্য যার আজ আর কোন প্রাসঙ্গিক সত্যতা নেই এবং যার কোন গুরুত্ব নেই। তা সত্ত্বেও অতীতের এই সব বর্জ্য বস্তুগুলিকে অপবিত্র বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয় এবং কোন অপবিত্র স্পর্শে এগুলি যেন না আসে এবং এত কিছু করেও দেখা যায় যে জাতীয় জীবনের ধারা বা স্রোতটি কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। এত কিছুর পরেও যদি এগুলিকে পরিশ্রুতনের কোন সফল প্রক্রিয়া গ্রহণ করা না হয় তবে এর থেকে সমাজ জীবনে এক অসুস্থতার সৃষ্টি হবে, যার ফলে সংরক্ষণের মূল নীতিটিই বিগঠনের কারণ হয়ে উঠবে।

বর্তমান যুগটি হল পৃথিবীর অপরিমেয় রূপান্তরের যুগ বা সময়। আজ শুধু মাত্র একটি নয় বহু মূলগত বা মৌলিক ধারণা মানুষের মনে কাজ করে চলেছে এবং অহরহ মানব মনকে আন্দোলিত করছে, মানব মনকে প্রবলভাবে তাড়িত করে চলেছে কিছু খোঁজার জন্য কিছু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। যদিও এই আন্দোলনের উৎস কেন্দ্র হ'ল প্রগতিশীল ইউরোপ তথাপি প্রাচ্যও অতিদ্রুত চিন্তা-ভাবনার বিপুল সমুদ্র মন্থনের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে এর ফলে প্রাচীন ধারণা ও পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে। আজ আর কোন রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের পক্ষে আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীর মত মানসিক ভাবে এই আধুনিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। এমনকি আজ এ কথাও বলা হচ্ছে যে মনুষ্যত্ব মানবতা মানবিকতা এসবের ভবিষ্যত নির্ভর করছে এসব সম্বন্ধে প্রাচ্য বিশেষ করে ভারতবর্ষ কী উত্তর দেবে তার ওপর সেই ভারতবর্ষ যে এশিয় ধ্যানধারণা এবং আধ্যাত্মিক গোপন সূত্রের

ভিত্তিমূল; সমগ্র এশিয়ার পলিতকেশ অভিভাবক। এই যুগের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ'ল যে মানবজাতির অগ্রগতির ভবিষ্যতটি কে ঠিক করবে, এটি কী আধুনিক অর্থনীতি এবং বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের দ্বারা পরিচালিত হবে নাকি মহৎ বাস্তব জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হবে, যার মূলে থাকবে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের আলো। এটা দেখা গেছে যে পাশ্চাত্য পৃথিবী কখনও আধ্যাত্মিকতায় সাফল্য লাভ করেনি এবং পরিমাণে বহির্জগতের কর্মকাণ্ড যা মূলত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আদর্শ এবং চাহিদার দ্বারা পরিচালিত তার সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় মনোভাবের পুনর্জাগরণ এবং এর বিস্তৃতি এবং ব্যাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও (যদিও তা আধ্যাত্মিক এবং মানসিক কৌতূহলের আলোয় আলোকিত নয়) এটিকে সম্পূর্ণ একক ভাবে পার্থিব বস্তুর ওপর কাজ করতে হবে এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হয় সেইভাবে অন্যান্য বিষয়গুলর সমস্যার সমাধান করতে হবে কারণ এছাড়া এর আর কোন উপায় নেই।

অপরদিকে প্রাচ্য যদিও তার আধ্যাত্মিকতাকে মৃতপ্রায়, আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে রেখেছে তবুও এটি সব সময় প্রগাঢ়, গভীর জ্ঞানপূর্ণ কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত হবার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত রেখেছে এবং তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করে রেখে এমন কী যখন এটি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয় এবং সৃষ্টিশীল নয় তখনও। সেই কারণে সমগ্র বিশ্বের আশা ভরসা নির্ভর করে আছে প্রাচ্যের প্রাচীন পুরাতন আধ্যাত্মিক বাস্তবতার পুনর্জাগরণ এবং তার বিশাল ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং পশ্চিমের সঙ্গে সনির্বন্ধ যোগাযোগের মধ্যমে গড়ে ওঠা সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং এশিয়া হতে উদ্ভূত আলো যা পাশ্চাত্য জগৎকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ওপর এবং তা কখনই এখনকার মত অচল সংযোজনে অক্ষম ধরনের হবে না, তা হবে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গতিময় এবং কার্যকরী।

ভারতবর্ষ যা নাকি প্রাচ্যের হৃদয় বা হৃৎপিন্ড তাকেও কিন্তু পরিবর্তিত হতে হয় যেহেতু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় জগৎই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই ভারতবর্ষ কখনও এই পরিবর্তনকে এড়িয়ে যেতে পারে না বিশেষত সেই অর্থে ইউরোপ যখন একের পর সমস্যা ভারতবর্ষের ওপর জোর করে চাপিয়ে চলেছে। নূতন প্রাচ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই হয় প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল আদর্শের ঐকান্তিক সংগ্রাম অথবা এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণের ফসল হয়ে দেখা দেবে। অতএব রক্ষণশীল মন যদি রূপান্তরের প্রয়োজনে নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্মুক্ত করতে পারে তবে তার ফলে পুনরুত্থিত ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতির জন্ম হবে তা প্রগাঢ় ভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সভ্যতাকে পুনর্নির্মাণ করবে।

২.৭ আমাদের আদর্শ (OUR IDEAL)

আমরা মানবতার চির অগ্রগতিতে বিশ্বাস করি এবং আমরা মনে করি যে এই অগ্রগতি আসলে হচ্ছে জীবনে ভাবনার কার্যকরী রূপ যা কখনও হয়ত দৃশ্যত উপরে ভেসে ওঠে তখন তাকে দেখা যায় আবার কখনও হয়ত বা বর্হিশক্তি এবং স্বার্থের গভীরে ডুবে গিয়ে কাজ করে। যখন এর মধ্যে কোন থামতি থেকে যায় তখনই মনুষ্যত্বের অধঃপতন বা বিবর্তন বিলম্বিত হয়, শুরু হয় এক নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের আর ঠিক এই সময়ে কোন গভীর লক্ষ্য ছাড়াই ব্যক্তিস্বার্থ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপের ফলে জীবনের যে ভাবনাগুলি গোপনে থেকে সমস্ত সৎকার্য করছিল তারা যেন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যখন ঐ সদভাবনাগুলি আবার উপরিভাগে ফিরে আসে মনুষ্যত্ব তখন আবার তার আলোকোজ্জ্বল সময় ফিরে পায় তার যেন দ্রুত,

অতিক্রান্ত প্রস্ফুটন হতে তাকে। দিগন্ত যেন উষালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, চমৎকার বসন্ত বাতাস বইতে থাকে এবং গভীরতা, প্রাণশক্তি সত্য এবং স্বীয়কার্যকরী শক্তির নিরিখে স্বীয় ভাবনা তার নিজস্ব রূপ এবং গুরুত্ব নিয়ে বিকশিত হতে থাকে এবং সামনের দিকে লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। এই-ক্ষণ মহাজাগতিক বিস্তারে পুরোপুরি ঐশ্বরিক সময়।

একজন বাস্তববাদী মানুষ যদি ভাবেন যে ভাবনা হ'ল একটি শৌখিন ফুল এবং জীবনের অলঙ্কার আর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিস্বার্থ এর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপের কার্যকরী চালক যন্ত্র তবে এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। আমরা স্বীকার করি যে এ জগৎ জীবন এবং কর্মের সমন্বয় এবং জীব বুদ্ধির ক্ষেত্র কিন্তু যে জীবন শুধুই বস্তু কেন্দ্রিক শক্তিকে মূল হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয় তা ধীরে ধীরে অন্ধকারময় এবং ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি মানুষের জৈব এবং উদ্ভিজ্জ সত্তার অস্তিত্বের প্রতি একটি প্রচেষ্টা মাত্র। জীবন এবং বস্তু দিয়ে গড়া এই পৃথিবী কিন্তু মানুষ না উদ্ভিদ না সাধারণ প্রাণী সে আসলে একটি আধ্যাত্মিক এবং চিন্তাশীল সত্তা যে তার জৈব প্রাণীজ অবয়বটি আরও মহত্তর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে যার পিছনে থাকে এক উচ্চতর দিব্য প্রেরণা।

আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান যুগের সূচনা হয়েছে তা মূলত এশিয়া এবং ইউরোপকেন্দ্রিক। এই যুগটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায়শই দেখা গেছে যে এশিয়া মহাদেশ যখন এক আলোকোজ্জ্বলতার মধ্যে দিয়ে চলেছে সেই সময় ইউরোপ মহাদেশ হয়ত কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছে, আবার অন্যদিকে এশিয়া যখন তমশাচ্ছন্ন বিশ্রাম রত অবস্থায় একধরনের আবশ্যতার অজ্ঞিতার মধ্যে নিমজ্জিত ঠিক তখনই ইউরোপ তার মানসিক শক্তির উন্মেষে অতিপ্রয়োজনীয় কর্মকান্ডগুলি করে চলেছে।

তবে মৌলিক প্রভেদ হিসেবে বলা যায় যে এশিয়া কর্তৃত্বপূর্ণ ভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং প্রগতি নিয়ে কাজ করেছে অপরদিকে ইউরোপ যেন মানসিক এবং অত্যাবশ্যক ক্রিয়া কলাপের কর্মশালা। এই চক্র যেমন যেমন ভাবে অগ্রসব হয়েছে প্রাচ্যের মহাদেশটি নিজেকে আরো বেশী করে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চয় কক্ষ হিসেবে পরিগণিত করেছে। কখনও ভীষণ রকম সক্রিয় হয়ে নূতন উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে, আবার কখনও রক্ষনশীল এবং শান্ত সক্রিয় থেকেছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার ধারাস্রোত ইউরোপের ওপর অন্তত তিন থেকে চার বার বর্ষিত হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই ইউরোপ তাকে হয় পুরোপুরি নয়ত বা আংশিক ভাবে এই আধ্যাত্মিক সারবস্তুকে বর্জন করেছে বা কখনও হয়ত বড়জোর নূতন বুদ্ধিমত্তা এবং বস্তু কেন্দ্রিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রগতির প্রেরণা স্বরূপ ব্যবহার করেছে।

এর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইজিপসীয়, ক্যালডিয়ন, এবং ভারতীয় জ্ঞানকে গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস থেকে প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে পরিশ্রুত করে তারপর তাকে দেখা হয়েছে। এর ফলে প্রখর মেধা সম্পন্ন, উচ্চবুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ অনাধ্যাত্মিক গ্রীসিয় এবং রোমান সভ্যতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু এটি দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পথ তৈরী করে দিয়েছে যখন বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম পবিত্র বাইবেলোক্ত শেম্ থেকে উৎপন্ন জাতির লোক (Semitic) আসীরিয় মানসিকতার দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে খৃষ্টধর্মরূপে ইউরোপে প্রবেশ করে। খৃষ্টধর্ম ইউরোপের কঠোর তপশ্চর্য মানসিকতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার তুরুপের তাস হিসাবে প্রবেশ করে। এই সময়ে ইউরোপে এক অদ্ভুত অবস্থা চলছিল, সেখানকার গির্জায় গ্রীক ধর্ম যাজকদের মন পরাবাস্তব ও তার বিকৃতি ইত্যাদি ধারণা নিয়ে হতভম্ব ওদিকে জার্মান বর্বরতা হঠাৎই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে যাদের ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা খৃষ্টীয়

চেতনা এবং গ্রীসিয় রোমান বুদ্ধিমত্তা উভয়ের বিপরীত ধর্মী ছিল।

এই সময় ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তটদেশ এবং স্পেন দেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ সে সব অঞ্চলে এশিয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগায়। শান্তিপূর্ণ ভাবে ধারণার অনুপ্রবেশের বিপরীতে ইউরোপে বস্তুগত এবং রাজনৈতিক উত্থান ভিত্তিক পথ অবলম্বন করে এই অনুপ্রবেশ ঘটে - এটিকে তাই বলা যেতে পারে তৃতীয় প্রচেষ্টা। গ্রীসিয় খৃষ্টত্বের সঙ্গে এই মিলনের ফলে ইউরোপে আধুনিক চিন্তা বিজ্ঞান ইত্যাদি আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে শুরু করে এবং ইউরোপীয় মনে সামন্ততন্ত্র, পৌত্তলিকতা ইত্যাদির পুনর্জাগরণ শুরু হয়।

চতুর্থ এবং শেষ প্রচেষ্টাটি সবে মাত্র শুরু হয়েছে এটি অতিধীরে তার প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলা চলে, এটি আসলে প্রাচ্যের প্রধানত ভারতীয় ভাবনার জার্মান অধিবিদ্যার আবরণকে ভেদ করে ইউরোপে প্রবেশ করাকে বোঝায় অপেক্ষাকৃত আরো পরবর্তী পর্যায়ে এটি আসলে সেলটিক স্ক্যান্ডিনেভিয় এবং স্লোভাক আদর্শবাদের নমনীয় প্রভাবকে ইউরোপে পূর্নজাগরিত করছে, অতীন্দ্রিয়বাদ, ধর্মমত এবং বৌদ্ধধর্ম, পরাবাস্তবশাস্ত্র, বৈদান্তিক জ্ঞান এবং অন্যান্য প্রাচ্যীয় প্রভাব ইউরোপ এবং আমেরিকার সরাসরি প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে এশিয়ার প্রতি ইউরোপের দু ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, প্রথমটি পশ্চিম এশিয়ায় আলেকজান্ডারের আগ্রাসী অনুপ্রবেশ যার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হয় এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ওপর ইসলামিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে, দ্বিতীয়টি আধুনিক ইউরোপীয় বাণিজ্য রাজনীতি এবং বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ইত্যাদি প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

বুদ্ধিজীবি এবং বস্তুবাদী ইউরোপ ভারতবর্ষকে এশিয়া সেরা হিসেবে খুঁজে পায় ভারতবর্ষ যেন সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রস্থল রূপে আর্বিভূত হয়, একটি বিপুল পরীক্ষার দ্বারা নূতন কিছু সৃষ্টির প্রাক্কালে যে বেদনার সৃষ্টি হয় তার সম্মুখীন হয় তা হ'ল বহু শতাব্দী জুড়ে এমন একটি রাষ্ট্রের ভাবনা যেখানে বাস্তব এবং মানসিক জীবনের অগ্রগতিকে ছাপিয়ে নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব জেগে উঠবে। প্রাচ্যের ভাবনার প্রথম যে স্রোতধারা ইউরোপে প্রবেশ করে সেটি দেখে যে ইউরোপে এমন একটি যুগের সূচনা হয়েছে ধর্ম, দর্শন, এবং মনস্তত্ত্ব এসবের বিসর্জন হতে বসেছে ধর্মকে দেখা হচ্ছিল এক আবেগ মথিত প্রবঞ্চনা হিসেবে, দর্শনকে ভাবা হত মনের নির্যাস, একটি নিষ্ফলা ভাবনার বুনোট, তাই এসবের চিন্তা না করে সমগ্র বুদ্ধিজীবি মানুষকে বস্তুর নিয়ম গতি প্রকৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্তিত্ব অনুধাবন করার নির্দেশ দেয় যাতে করে আরও উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলা যায়।

এই বিপুল প্রচেষ্টার অবসান হয়েছে যদিও এটি এখনও পর্যন্ত খোলাখুলি ভাবে এর দেউলিয়াপনা ঘোষণা করেনি কিন্তু এটি দেউলিয়া হয়ে গেছে একথা সত্য। ঠিক যেমন ভাবে একটি অতিকায় অবাস্তব, অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার থেকে এর জন্ম হয়েছিল ঠিক তেমনই একটি মহাপ্লাবনে এটি ক্রমশ নিমজ্জিত হচ্ছে অপরদিকে অতিরঞ্জিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা সমস্ত প্রচেষ্টাই দেউলিয়া রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে; আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে এই আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রয় করে ব্যক্তি বিশেষে কত উন্নীত হতে পারেন আবার এত দেখেছি যে মানবতার প্রতি প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে এড়িয়ে গিয়ে ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরকে খুঁজতে গিয়ে একটি সমগ্র জাতির কেমন ভাবে অবনমন হয়। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় প্রচেষ্টাই শ্রদ্ধা করার মত ভারতীয়দের চরম আধ্যাত্মিক সততা, আন্তরিকতা অন্যদিকে ইউরোপীয়দের কঠোর, নিদারুণ বুদ্ধিজীবি সততা এবং সত্যের জন্য তীব্র আকুলতা উভয়েই বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করেছে কিন্তু পরিশেষে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি বিশালাকার মানবত্মা এবং বিশাল মানব বুদ্ধিমত্তার তুলনায় অনেক বেশী শক্তি ও পরাক্রমশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ব্যক্তি ও সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে যত বেশী করে বিভিন্ন সম্ভাবনার সুচিন্তিত এবং উন্নত সংযুক্তি ঘটাবে তার ওপরেই সমগ্র মানবজাতির উদ্ধার পাওয়া নির্ভর করছে। এটি কোন বিশেষ রূপ বা কাঠামো নয়, এর জন্য যা প্রয়োজন তা হ'ল প্রেরণার পুনর্জাগরণ এবং তার আদান প্রদান এবং একটি সফল সংমিশ্রন ও ঐকতান।

মানবজাতির ইতিহাসে এক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে মানব প্রচেষ্টার এমন মহৎ দুটি স্রোত এবং তাদের পারস্পরিক অন্তঃযোগ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংযুক্তির মধ্যে মানবজাতির, মানবিকতার সকল ভবিষ্যৎ আশা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। একটি সঙ্গে একটি কিন্তু অনেকখানি বিপদের সম্ভাবনাময়। এই আশার থেকে নূতন এবং উন্নততর মানব জীবনের বিকাশ হওয়া সম্ভব আর সেটি সম্ভব বৃহত্তরজ্ঞান, নূতন কর্মদক্ষতা মৌলিক শক্তি এবং সম্ভাবনার যা আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে চলেছে তার ভিত্তিতে এবং কিছু কিছু সমস্যা যেগুলির সমাধান ব্যক্তি, সমাজ এবং সমগ্র জাতি করবে তার ওপর। মানবজাতি বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে একত্রিত হয়েছে অতএব এই সাধনার ফলে তার যদি ঈশ্বরলাভ হয় তাও যেমন সকলের ক্ষেত্রে সমান আবার যদি অশুভ কিছু ঘটে সে ক্ষেত্রেও তা সকলের প্রতি প্রযোজ্য। এটির ভিন্ন ভিন্ন অংশ আলাদাভাবে প্রস্তুত হয় না। এটি এমন এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় যেখানে বিজ্ঞান ও জীবনের চর্চা একই সঙ্গে চলে একধরনের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের মধ্যে দিয়ে যার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

যে ধারণা ইউরোপের আলোক প্রাপ্তির মূল ভিত্তি তা বরাবর পরিচালিত হয়েছে এক চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা, ব্যগ্রতা বা আকুলতার দ্বারা। এই আকাঙ্ক্ষা হল সত্যের সত্য এবং ন্যায় যার মিলিত প্রক্রিয়া জগৎ অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষের জীবন এবং মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে অপার সম্ভাবনা তার আদর্শ, এবং সত্য ও নীতি থেকে লব্ধ জ্ঞান এ সবের পর্যাপ্ত বিকাশের ফলে যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয় সেটিই উন্নতি অগ্রসর।

এই ধারণাটি চূড়ান্ত সত্য এবং আমরা সামগ্রিক ভাবে সেটিকে গ্রহণ করেও থাকি কিন্তু এর প্রয়োগ হয়েছে ত্রুটিপূর্ণ ভাবে। যে সত্য এবং ন্যায় কে অবিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে তা জাগতিক নয় যদিও এক্ষত্রে বস্তু জগতেরও প্রয়োজন আছে। এমনকি এটি মানসিক এবং দৈহিকও নয় যদিও এগুলিও অপরিহার্য আসল যেটির প্রয়োজন তা হ'ল আত্মার সত্য এবং ন্যায় যার ওপর অন্য সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে। এটিই আত্মশক্তি যা নিজেকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচ্যের যে বার্তা তা অতি সত্য; "একমাত্র আত্মানুসন্ধানই মানুষকে নিরাপত্তা যোগাতে পারে বা মানুষকে রক্ষা করতে পারে এবং মানুষ যদি সারা বিশ্বকেও লাভ করে বা জয় করে তাতেই বা কী যদি সে তার আত্মাকেই হারিয়ে ফেলে" পাশ্চাত্য এই বার্তাটি শুনেছে এবং অনুধাবন করতে চেয়েছে। আর সেই কারণেই নিরন্তর সেই আত্মা থেকে উৎসারিত সত্য ন্যায় ইত্যাদিকে খুঁজে চলেছে এবং কোন কিছুর অন্তর্নিহিত যে বাস্তবতা তা যে বস্তুজগতের চেয়ে অনেক বড় একথা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু বিপদের কথা হ'ল এই যে চূড়ান্ত যান্ত্রিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থাকার ফলে পাশ্চাত্য জগৎ নিজকে একপ্রকার বাহ্যিক ভাবে কুয়াশায় ঢেকে রেখেছে যেটিকে আজ আমরা ইংল্যন্ড এবং আমেরিকার মত যান্ত্রিকতা এবং বুদ্ধিজীবীতে ভরা দেশে উদিত হতে দেখেছি, যে দেশগুলি আধ্যাত্মিকতার ধার ধারে না ফলে চরম সত্য বা পরম প্রাপ্তি বলতে কী বোঝায়, সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ধারণার জালে আবদ্ধ। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের কাছে যে বার্তাটি নিয়ে আসে সেটিও সত্য। এটি বলছে যে মানুষই ভগবান তাই মানুষের উন্নতির মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিব্য জীবন ও তার প্রগতিশীল বৃদ্ধি হ'ল ব্রহ্মার স্ব-ভঙ্গিমা, তাই জীবনকে অস্বীকার করার মানেই হ'ল আত্মনিহিত ঈশ্বরকেও অস্বীকার করা। এটিই হ'ল সেই সত্য যে প্রাচ্যকে পাশ্চাত্য দর্শন থেকে আবার প্রাচ্যের দিকেই ফিরিয়ে

আনে, পাশ্চাত্য জগতে যে কথা আরও ভালভাবে তর্যমা করে বলা হয়েছে প্রাচ্য তার প্রাচীন জ্ঞানের মাধ্যমে সেই উন্নতর সত্যকে বহু আগেই অধিকার করে আছে। তবে প্রচ্যও এই বার্তার মধ্যে দিয়ে জাগরিত হচ্ছে। কিন্তু বিপদ একটাই -- তা হলে যে এশিয়া হয়ত তার নিজস্বতা ভুলে গিয়ে ইউরোপের রীতি নীতি ধরন ধারণকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে ফেলবে অথবা হয়ত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এক সর্বনাশা মেলবন্ধন ঘটিয়ে ফেলবে।

এই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন সত্যের অনুসন্ধান যার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে বিশ্বভুবনে আত্মপ্রকাশের মূল নিয়মগুলি, দার্শনিক এবং ধর্মীয় চিন্তাভাবনা, নিয়মনীতি অনুসরণের এক মনস্তাত্ত্বিক উপায় যার মাধ্যমে ছন্দবদ্ধভাবে মানুষ নিজেকে আরও পরিশ্রুত এবং নিখুঁত করে গড়ে তুলতে পারে। তবে এই মনস্তত্ত্ব বলে ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা নয় এটি আরও গভীর ভাবে প্রকৃত মনস্তত্ত্বের অনুধাবন ভারতবর্ষে যাকে "যোগ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে এই "যোগ" এবং তার সঙ্গে সামাজিক এবং সার্বিক জীবনের নানা সমস্যার সমাধানে আমাদের ধারণার প্রয়োগ।

আদর্শ তবে কী হবে? সেটি হবে এমন যা বাইরের আগ্রহের দ্বারা সংগঠিত হওয়ার পরিবর্তে অন্তরের একতা বোধ থেকে উৎসারিত সমগ্র মানব জাতির ঐক্য। নিছক জৈবিক এবং অর্থনৈতিক জীবন থেকে মানুষের উত্তরণ অথবা নিছক বুদ্ধিমত্তা বা নান্দনিকতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি, বরং এটি হবে আত্মশক্তির সিঞ্চনের মাধ্যমে তার মনুষ্যত্বকে এক অতিমানবীয় স্তরে নিয়ে যেতে পারে যা আমাদের বর্তমান অবস্থাকে ছাড়িয়ে যেতে বা অতিক্রম করতে সক্ষম ঠিক যেভাবে বিজ্ঞান আমাদের নিম্নতর প্রাণী থেকে আজকের মানুষে উন্নীত হওয়ার কথা জানায়। এই তিনটি বিষয়ই আসলে এক, মানুষের এবং মানুষের আত্মোপলব্ধি একমাত্র আত্মজীবনের ঐক্যের মধ্যে দিয়েই আসতে পারে।

২.৮ এককের সারাংশ (UNIT SUMMARY)

- আদর্শ একধরনের সত্য যা মানুষের জন্য নিজেকে effected করে না। আদর্শ কখনই চূড়ান্ত বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের খুব কাছাকাছি। ঘটনার চেয়ে আদর্শ অনেক বেশী সম্পূর্ণ, forcible এবং আসল বা খাঁটি।
- নিখাদ, ধারণা, ঘটনা, দিব্য সৃষ্টির এইটিই ক্রমপর্যায় হওয়া উচিত।
- বাস্তববাদী বুদ্ধিমত্তা কোন বিষয়ে তখনই সন্দিহান হয় যখন সে তার মধ্যে ক্ষমতা উপলব্ধি করে।
- ক্ষমতা মানে শুধু ঐশ্বরিক ক্ষমতা নয়, জ্ঞানের স্থান ক্ষমতারও আগে: শক্তি এবং সচেতনতা হ'ল অস্তিত্বের দুটি সমঅবস্থা কোন কিছুর প্রাথমিক ভিত্তি এবং তার বিবর্তনীয় উপলব্ধি উভয় ক্ষেত্রেই এক কথা সত্য।
- প্রকৃতিই হ'ল প্রধান চালিকা শক্তি তাই প্রকৃতির উপর যে আস্থাশীল সে অনেক পবিত্রভাবে নিজেকে চালনা করতে পারে এমনকি সে অত্যন্ত সফলভাবে অন্যকেও চালিত করতে সক্ষম হয়। আর একদল পুরুষ এ বিশ্বাসী - যিনি জ্ঞানী -যিনি প্রধান চালিকা শক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি সেই ক্ষমতার অধিকারী যা তিনি প্রয়োগ করেন। তিনি ক্রমশ পবিত্রতার কাছাকাছি চলে যান। তাঁর সদিচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং তারই হাতে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ।
- যোগ হল কর্মের দক্ষতা।

- একজন যোগী পুরুষ এবং একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অনেক তফাৎ থাকে—সেই তফাৎ উভয়েরই অস্তিত্বের তফাৎ।
- অন্তরের শক্তি বা আত্মশক্তি মানুষ কে বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে।
- ত্রুটিপূর্ণ নাস্তিকতা কদর্য্য বিষাক্ত মিথ্যার জন্ম দেয়।
- মুক্তির জন্য ব্যক্তি সত্তার বিশ্বজনীন হওয়াই যথেষ্ট নয়; নিজেকে সার্বজনীন করে তোলা একটি পদক্ষেপ ঠিকই কিন্তু এরপরেও স্থিতধী এবং সঙ্কল্পে স্থির থাকলে তবেই মানুষ মহাজাগতিক অনন্তের সন্ধান পায়।
- সমতা বা সাম্যভাব হ'ল ব্যক্তির ও বস্তুর attiutde এর মূল ভিত্তি কারণ মূল কথাই হল আমরা চারপাশে যে বহুধা জগৎ দেখি তার ভিত্তি আসলে এক।
- ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই প্রকৃত অর্থে স্থির নয় কারণ যেহেতু সময় চিরপরিবর্তনশীল তাই সবকিছুই সময়ে ছুঁচে পড়ে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সম্মুখ ভাগে প্রবাহিত হয়।
- অতীত হ'ল অগ্রগতির এক টানা পোড়েন। এটি সংরক্ষণের এক বিপুল ব্যক্তি, কিন্তু এটি নিজেকে পরিবর্তন এবং নূতন উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। আসলে বর্তমানও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনময়, বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্ত এত দ্রুত পরিববর্তিত হতে থাকে সে বর্তমান মুহূর্তগুলিকে মনে হয় স্থির বা একটানা। তাই বর্তমান হচ্ছে এমন এক উপলব্ধি থাকে অতীত বাধ্য করে অনুভব করতে।
- ভবিষ্যত হ'ল নূতন উপলব্ধির প্রবাহ যা হয়ত আপাত সঠিক নয় যে দিকে অতীত এগোচ্ছিল। তবে এই তিনের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ নেই।
- পৃথিবীর বর্তমান সময়টি হ'ল তীব্র রূপান্তরের যুগ।
- প্রাচ্য বিশেষত ভারতবর্ষ আধুনিক যুগের যাঁধার কী উত্তর দেবে তার ওরপই মানবতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আর এটি একটি মাত্র বিষেয়ের ওপরই নির্ভর করছে তা হ'ল মানবিকতার ভবিষ্যৎ অগ্রগতি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে -- পাশ্চাত্যের আধুনিক অর্থনীতি এবং বস্তুনির্ভর মানসিকতার দ্বারা না কি কোন মহোত্তর বুদ্ধি মত্তার দ্বারা নির্দেশিত উন্নীত এবং আলোকিত হবে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ও জ্ঞানের মাধ্যমে।
- এই প্রচেষ্টা সত্যকে খোঁজার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিজের অস্তিত্বকে জানার ভিত্তি, সৃষ্টি তত্ত্বের দর্শন এবং ধর্মীয় ভাবনাকে খোঁজার প্রচেষ্টা। এ এমন এক ঐকতান যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরিশ্রুত, পরিমার্জিত করে আরও নিখুঁত করে তোলে, এই মনস্তাত্ত্বিক কাজ ইউরোপীয় অর্থে নয় এটি আরও গভীর মনস্তত্ত্ব ভারতবর্ষে যা "যোগ" বলে পরিচিত।

২.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (CHECK YOUR PROGRESS)

১. **সংজ্ঞা লেখ বা ব্যাখ্যা করুন**

ক) আদর্শ

খ) অগ্রগতি

গ) বাস্তবধর্মীতা

ঘ) সমতা বা সাম্যভাব

২. **নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে পার্থক্য করুন**

ক) আদর্শবাদ এবং বাস্তবধর্মীতা

খ) সংরক্ষণ বা রক্ষনশীলতা এবং অগ্রগতি

গ) রক্ষণশীল মানসিকতা এবং প্রাচ্যের অগ্রগতি

ঘ) সাধারণ মানুষের কর্ম এবং একজন যোগীর কর্ম

৩. **নিম্নলিখিত উক্তিগুলির যাথার্থতা নিরুপন করুন,**

ক) যোগ হ'ল কর্মের দক্ষতা

খ) অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

গ) ত্রুটিময় দাম্ভিকতা কদর্য মিথ্যার জন্ম দেয়

৪. পাশ্চাত্যের প্রতি প্রাচ্যের বাণী কী? এর ফলশ্রুতি বা কী?

৫. প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের বাণী কে? এর ফলশ্রুতিই বা কী?

৬. মনব সমাজ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধানের জন্য কী প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত

৭. আমাদের আদর্শ কী হওয়া উচিত?

২.১০ বাড়ীর কাজ (ASSIGNMENTS / ACTIVITIES)

১. ব্যাখ্যা করুন "পৃথিবীর বর্তমান সময়টি হ'ল তীব্র রূপান্তরের যুগ"

২. ভারতবর্ষ কী ভাবে নূতন পৃথিবী গড়তে সাহায্য করতে পারে।

২.১১ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (POINTS FOR DISCUSSION AND CLARIFICATION)

এই এককটি পঠনের পর কোন কোন বিষয়গুলি তোমার আরো বিশদভাবে জানা প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ কর।

২.১১.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussions)

_____

_____

_____

_____

২.১১.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

_____

_____

_____

_____

_____

২.১২ উৎস (REFERENCE)

1. Shri Aurobindo (1920). Ideals and Progress, Shri Aurobindo Ashram Trust, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.
2. Shri Aurobindo (1909-10). The Ideal of Karmayogin, Sri Aurobindo Ashram Trust Sri Aurobindo Ashram Pondicherry.

একক ৩ ❑ ভারতীয় সমাজের অনুধাবন (UNDERSTANDING INDIAN SOCIETY)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি

- ৩.৩.১ মানব সংস্কৃতির সংক্ষিপ্তসার
- ৩.৩.২ ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারক
- ৩.৩.৩ জাতিগত উপাদান
  - বিজ্ঞান, মানুষ, এবং জাতির ধারনা
  - জাতিতত্ত্বগত শ্রেণীবিন্যাস এবং বিভিন্ন মনের ওপর ভিত্তি করে বর্গগঠন
  - ভারতীয় নাগরিক ঃ ইন্দো-দ্রাবিড়ীয় যৌগিক জাতিতত্ত্বগত বর্গ
  - জাতি বিষয়ে ইউনেস্কোর (UNESCO) মতামত
- ৩.৩.৪ ভাষাগত উপাদান
- ৩.৩.৫ বর্ণগত উপাদান
- ৩.৩.৬ ভারতীয় উত্তরাধিকারের ঐতিহ্য সম্বন্ধে ভ্রান্তত্থ্য
- ৩.৩.৭ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ঃ এক মহৎ সংশ্লেষে
- ৩.৩.৮ সামাজিক, জৈবনিক নিয়মঃ বৈদিক প্রতীকতা
- ৩.৩.৯ রূপদায়ক সঞ্জীবনী উপাদান
- ৩.৩.১০ শ্রী অরবিন্দের ভাষায় ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি।
- ৩.৩.১১ ভারতীয় সমাজে সমাজ-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনের উপজাতীয় শবরদের ভূমিকা

৩.৪ বিকাশশীল ভারতীয় সমাজ

- ৩.৪.১ মানুষের বিবর্ধনমূলক বা অবধাতী নিয়তি
- ৩.৪.২ মানুষের বিবর্ধন মূলক লক্ষ্য এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার ঐতিহ্যের মূল উপাদান
- ৩.৪.৩ সময়ের প্রবল চাপে পরিবর্তন এবং চিরন্তন মূল্যবোধ আবহমানতা বা প্রবাহ।

৩.৫ ভারতীয় সমাজের উদ্দেশ্য এবং অভিলাষ

৩.৬ এককের সারসংক্ষেপ

৩.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৩.৮ বাড়ীর কাজ

৩.৯ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.১০ উৎস

৩.১ ভূমিকা (INTRODUCTION)

"এক সহনশীল ঐতিহ্য" ঃ লুসিল স্কালবার্গ তাঁর হিস্টোরিক ইন্ডিয়া (Historic India a Life-Time publication) গ্রন্থটির প্রথম পরিচ্ছেদটির নাম দিয়েছেন "এক সহনশীল ঐতিহ্য" অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তিনি অধ্যায়টি এইভাবে আরম্ভ করেছেন "ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একটি দেশ নয়। এটি পৃথিবীর বুকে অত্যন্ত দৃঢ় এবং প্রাচীনতম একটি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি প্রায় যে কোন সভ্যতার সমসাময়িক। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মিশর রাজত্বে যখন প্রথম সূর্যোদয় হচ্ছে তখনও এটি জন্মমান অবস্থায় ছিল আবার খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এটি জায়গায় অবস্থায় ছিল আবার খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সুর্যকরোজ্জল গ্রুপদী গ্রীসের সময়ও এটি অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় বর্তমান ছিল এবং বিংশ শতাব্দীতে যখন বৃটিশ রাজত্ব চলেছে তখনও এটি বিদ্যমান।" এইটুকু নিরীক্ষণ করলে ভারতীয় সমাজের ভাবধারাটিকে বোঝা যায় - যেখানে রাজনৈতিক জীবন সবসময়েই প্রগাঢ় সংস্কৃতি জীবনের অধীনে থেকেছে যা মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকে একটি উজ্জ্বল সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। শ্রী অরবিন্দ'র ভাষায় রাষ্ট্র প্রকৃতির কর্মশালা থেকে বেরিয়ে আসা কোন কাঁচা উপাদান নয় বা আধুনিক অবস্থার থেকে সৃষ্ট, উদ্ভূত নতুন কিছু নয়। এটি প্রাচীনতম জাতির মধ্যে একটি এবং পৃথিবীর বুকে মহোত্তম সভ্যতা। *'This nation is not a new race raw from the workshop of Nature or created by modern circumstances. One of the oldest races and greatest civilizations on this earth, the most indomitable in vitality, the most fecund in greatness, the deepest in life, the most wonderful in potentiality, after taking into itself numerous sources of strength from foreign strains of blood and other types of human civilization, is now seeking to lift itself for good into an organized national unity'.*

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে রাষ্ট্রের আগে সমাজ। সমাজ যা হ'ল মনুষ্যত্বের একত্রিভূত জৈবনিক সত্তা যার আত্মা মন এবং দেহ এক। জন্ম, বৃদ্ধি, যৌবন, পরিপক্কতা প্রৌঢ়ত্ব অবক্ষয় অবসান এবং অবলুপ্তি এইভাবে চক্রাকারে সমাজজীবন আবর্তিত হয়ে চলে। এটি এমন এক চির বহমান ক্ষমতা যা নিজেকে পুনর্নবীকরণ, নূতন করে ফিরে পাওয়া এবং নূতন ভাবে শুরু করার মধ্যে দিয়ে চক্রাকারে চলতেই থাকে। একমাত্র ভারতবর্ষ এবং চীন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন জনজাতি ক্রমে বিনষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটি সাম্প্রদায়িক মন আসলে আরো উন্নত চিরন্তন শাশ্বত আত্মার প্রকাশের মাধ্যমে যা নিজেকে সময়ের সাথে প্রকাশিত করে এবং মানবতার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পূর্ণতা খুঁজে নেয়। মহাযোগী শ্রী অরবিন্দ আরো বলছেন "একজন মানুষ যে সচেতন ভাবে বাঁচতে শেখে, সে বাঁচা শুধুমাত্র তার দৈহিক এবং বাহ্যিক জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা নয় এমনকি কেবলমাত্র জীবনের ধারণা মানসিক চিন্তাধারা যা তার পরিবর্তন এবং উন্নতিকে পরিচালিত করে এবং যা তার মনস্তত্ত্ব এবং মানসিকতার প্রধান চাবিকাঠি শুধু সেইটুকুই নয় বরং এর পেছনে আছে সেই মন, সেই আত্মা যা অবিনশ্বর যা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও শেষ হয় না, যা অমরত্বের পথ বেয়ে বহু জাগর'ণের মধ্যে দিয়ে সমাজে নতুন নতুন জনজাতির মধ্যে সংশ্লেষিত হতে থাকে। এ এমনই এক শক্তি যা কখনও চূড়ান্ত ভাবে নিঃশেষিত হওয়ার মুখে এসেও আবার আত্মার পুনর্গতি প্রাপ্ত হয়ে আরও একটি নূতন হয়ত বা আরো গৌরবময় চক্রের শুরু করে। ভারতবর্ষের ইতিহাস এই ধরনের জীবন এ মানুষের এক সমন্বয়।" *"which learn to live consciously not solely in its physical and outward life, not even only in that and in the power of the life idea*

or soul idea that governs the changes of its development and is the key to its psychology and its temperament, but in the soul and the spirit behind may not at all exhaust itself, may not end by disappearance or a dissolution or a fusion into others or have to give place to new race or people, but having itself fused into its life many orginal societies and attained to its maximum natural growth pass without death through many renaissances, and even if at any time it appears to be on the point of absolute exhaustion and dissolution, it may recover by the force of the spirit and begin another and perhaps a more glorious cycle. The history of India has been that of the life of such a people."

ভারতবর্ষ এমনই এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে।

৩.২ উদ্দেশ্য (OBJECTS)

এটি অনুশীলনের পর একজন পাঠক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবেন ঃ

- ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি
- বিবর্তন সাপেক্ষে প্রকৃতি
- বিববর্তন সাপেক্ষে মানুষের নিয়তি
- বিকাশশীল ভারতীয় সমাজ
- ভারতীয় সমাজের উদ্দেশ্য এবং অভিলাষ

৩.৩ ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি (NATURE OF INDIAN SOCIETY)

৩.৩.১ মানবসংস্কৃতির সংক্ষিপ্তসার (The Epitome of Human Culture)

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এটিই হ'ল ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যাবস্থায় প্রত্যেক মানুষের জন্য স্থান আছে। এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য অভিভাসী গোষ্ঠীর প্রতি ভারতবর্ষ চিরকাল অতিথি বৎসল থেকেছে এবং ভারতে এসে এই অভিভাসী গোষ্ঠী নিজেদের পরিচয়, স্বাতন্ত্র, নিজস্ব জীবন ধারা ইত্যাদি অত্যন্ত স্বাধীনভাবে বজায় রাখতে পেরেছে। খৃষ্টধর্মের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা তাদের নিজস্ব বাসস্থান ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি গোষ্ঠী ভারতবর্ষে আসে এবং তাদের স্বজাতির অন্যেরা পৃথিবীর অন্য যে অঞ্চলে চলে গেছে তার তুলনায় ভারতবর্ষ যে বসবাসের পক্ষে অনেক বেশী সমমানের অনেক বেশী আদর্শ স্থান, একথা বুঝতে পারে। সীরিয় খৃষ্টানেরা খৃষ্টধর্ম প্রচলনের প্রথম অবস্থা এদেশে আসে এবং সাদরে গৃহীত হয়। পারসিকরা তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে ইরান থেকে বেড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় এবং ভারতবর্ষকে এক নিরাপদ স্থান রূপে লাভ করে এবং এদেশেই বসবাস করতে থাকে। পারশীরা যদিও সংখ্যায় খুবই কম তবুও এদেশে তারা যথেষ্ট সম্মান এবং গৌরবের স্থান নিয়ে বসবাস করছে। ইসলাম ধর্মের ঢেউ এবং আগ্রাসন এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং বসবাস করতে থাকে। প্রত্যেক জাতি এবং সংস্কৃতির মানুষ ভারতবর্ষে এসে নিজেদের জন্য স্থান পেয়েছে। তাই ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ভৌগোলিক পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার শুধু নয় এটি মানব সংস্কৃতির সংক্ষিপ্তসারও ঘটে।

৩.৩.২ ভৌগোলিক সীমা নির্দেশক (The Geographical Determinants)

বর্তমানে ভারতবর্ষের ভূমাঞ্চলের কয়েক লক্ষ বছর আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না। মধ্য ইয়োসিন (Mid - Eocene) সময়ের পর অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ বছর আগে এই ভূমাঞ্চলের সূচনা হয়। আরাবল্লী পর্বতের দক্ষিণ ভাগটি গন্ডোয়ানা অঞ্চলের অংশ ছিল যেটি নাকি আবার পশ্চিমে মরিশাস এবং পূর্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

টেথিস সমুদ্র গন্ডোয়ানাকে ইউরেসিয় ভূমাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। ভূতাত্ত্বিক কারণে এই দুই ভূমাঞ্চলের পরস্পরের প্রতি চলনের ফলে হিমালয় পর্বতের উত্থান হয়। তিনটি ক্রমপর্যায়ে এই উত্থান সম্পূর্ণ হয় যথাক্রমে মধ্য ইয়োসিন ৫লক্ষ্য মধ্য মিয়োসিন (৫লক্ষ) এবং প্লিয়সিন পরবর্ত্তী অধ্যায় শেষোক্ত পর্যায়টি প্লেইস্টোসিন এর শেষার্ধ অবধি চলে। টেথিস সমুদ্রের জলরাশি বিভাজিত হয়ে বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের সৃষ্টি করে। গন্ডোয়ানা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পর ভারতীয় উপদ্বীপটি ধীরে ধীরে তার বর্তমান ত্রিভুজাকৃতি আকারটি ধারন করতে থাকে। আশ্চর্যের কথা যে হিমালয় পর্বতের অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ, সেই হিমালয় পর্বত কিন্তু পর্বত হিসেবে শিশু। তথাপি এটি জৈব-ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করছে। কারণ এটি তিনটি বৃহৎ জৈব ভৌগোলিক অঞ্চলের বিকিরণ কেন্দ্র সেগুলি হ'ল ইন্দো-মালয়ান, ইউরেসিয়ান এবং আফ্রো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। ভারতবর্ষে ধ্রুপদী কবি কালিদাসের কথায় শৈলরাজ হিমালয় (হিম = বরফ + আলয়) হ'ল ঈশ্বরের আত্মা যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমুদ্র দ্বারা ধৌত হয়ে উত্তর দিকে পৃথিবীর সন্তুলন দন্ডের মত দাড়িয়ে আছে। এই ভাবেই আজকে ভারতবর্ষের শুরু যে দেশের মধ্যে রয়েছে চৌদ্দটি নদীর উপত্যকা। হিমালয় ভারতবর্ষকে উর্বর করেছে এবং বাকি পৃথিবীর থেকে আলাদা করে রেখেছে এই ভৌগোলিক ভিত্তি বা কারণগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনকে রূপ দিয়েছে।

৩.৩.৩ জাতিগত উপাদান (The Racial Elements)

মানবজাতিকে বুঝতে হলে আমাদের মানব বিবর্তনের উত্থান এবং বিবিধতা সম্পর্কে জানতে হবে যে কোথায় এবং কীভাবে মানুষ এল কোথা থেকে?

বিজ্ঞান, মানুষ এবং জাতির ধারণা (Science, Man and the Concept of Race)

পৃথিবীর ধূলিকনার তেজষ্ক্রিয় খনিজ পদার্থের অনুসধান, অনুধাবন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানা গেছে :

- প্রায় ৪.৫ কোটী বছর আগে : পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে
- প্রায় ৩.৫ কোটী বছর আগে : এই গ্রহে প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটে
- ৭ কোটি বছর আগে : প্রথম Primate এর উদ্ভব হয়
- ৩০ লক্ষ বছর আগে : মানুষের পূর্বসূরী প্রথমদিককার হোমিনিডদের আবির্ভাব হয়
- ৭ লক্ষ থেকে ২.৫ লক্ষ বছর আগে : হোমো সেপিয়েন্স, মানব জাতির উৎপত্তি হয়
- ৫০,০০০ বছর আগে : হোমো সেপিয়েন্স, আজকের মানব জাতির আবির্ভাব হয়।

প্রথম যে প্রাণীকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তারা হ'ল জাভা মানুষ (হোমো, ইরেকটাস ইরেকটাস) এবং

পেকিং মানুষ (হোমো ইরেকটাস পেকিনেনসিস) হোমো ইরেকটাসদের ব্যাপ্তি বোধহয় শুধুমাত্র চিন এবং পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। সম্ভবত এটি এমন কী আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। যেমন হোমো ইরেকটাস ছড়িয়ে পড়ছিল তেমন তেমন ভাবে এরা বহু জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল। এদেরই মধ্যে একটি জাতি হোমো সেপিয়্যান এ পরিণত হয়। হোমো সেপিয়েন্স আবার বহু সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর থেকেও আবার বহু জাতি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় যেমন রোডোশিয়ান মানুষ (হোমো সেপিয়েন্স রোডেসিয়ানসিস) এদের রোডোশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া যায়। সেলোম্যান (হোমো সেপিয়েন্স সোলোযেনসিস) এদের জাভা অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং নিয়ান্ডারথাল মানুষ (হোমো সেপিয়েন্স নিয়োন্ডারথালেনসিস) সারা ইউরোপ জুড়ে এবং পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এদের পাওয়া যায়। ক্রো-ম্যাগনন ম্যান বা বলা ভাল আধুনিক মানুষ (হোমো সেপিয়েন্স) এর জিনগত উপাদানগুলি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জিন সমষ্টির কাছ থেকে পেয়েছে। তাই Polytypic এবং Polymorphic উভয় শ্রেণীর মানুষ এবং মানব বিবর্তনের ইতিহাস হ'ল anagenetic বা সোজা সরল এবং কখনই Cladogenetic বা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত নয়। বর্তমান পৃথিবীতে সকল জীবিত মানুষ এসেছে হোমো সেপিয়ান্স থেকে।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে ২০,০০০ থেকে ১০০,০০ বিভিন্ন পকরা জিন আছে আবার প্রত্যেকটি জিনের অ্যালিন বা পরিবর্তিত /পরিবর্ত প্রকাশ রূপ আছে। মানব দেহের এক তৃতীয়াংশ জিনের দুই বা ততোধিক অ্যালিল বা বৈচিত্র রূপ থাকে। তাই মানুষের জিনমানচিত্রটি বিপুল রকমের জটিল কিন্তু বাহ্যিক বা ফেনোটাইপ জিনের মধ্যে যুব সামান্য বৈচিত্র থাকে এবং এই বৈচিত্র আপেক্ষিকভাবে তেমন গভীর নয় - ভাসা-ভাসা। আজকের মানব প্রজাতির মধ্যে যে বিশাল বৈচিত্র বা বহুধা বিভক্তি দেখা যায় তার কারণ আজকে মনুষ্য প্রজাতির পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্তি ভৌগোলিক বিভাজন এবং প্রজননগত অন্তরন পৃথিকীকরন। এটি বিবর্তনের এক বাহুবিভক্ত প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর অপসার'ণ হয়েছে নাকি অন্তঃপ্রজননের ফলে নূতন জাতির সৃষ্টি হয়েছে তা তর্কের বিষয়। ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন এবং প্রজননগতভাবে পৃথকীকৃত জনগোষ্ঠী কিন্তু কোটি সাধারণ জৈবিক উত্তরাধিকারের অধিকারী হয় এবং পৃথকভাবে কিছু অননা, জিনগতভাবে সম্প্রসারিত গুনাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একত্রীকরণ হয় যার ফলে একটি জনগোষ্ঠীকে অপর জনগোষ্ঠীর থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

হোমো সেপিয়ান্সদের মধ্যে বহু উপপ্রজাতি ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে শুধু মাত্র যেটি টিকে আছে তারা হ'ল হোমো সেপিয়েন্স।

পৃথিবীব্যাপী সমগ্র মনুষ্য সমাজ ৫০,০০০ বছর ধরে এই উপপ্রজাতির অর্ন্তগত। সেই তখন থেকে শারীরিক ভাবে এই উপপ্রজাতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। অতএব সারা পৃথিবীর সমস্ত মানব গোষ্ঠীর একটি জাতি তা হল মানব জাতি। তাই জাতি শব্দটি সমগ্র মনুষ্যকুলকে বোঝাতেই ব্যাবহৃত হওয়া উচিত। হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স জাতি বা উপপ্রজাতি হিসেবে অভিহিত করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটিপূর্ণ এদেরকে বড়জোর জাতিতত্ত্বমূল বা জাতিগত গোষ্ঠী রূপ বলা যেতে পারে এই বিষয়ে অধ্যায়ে 'The UNESCO Statements on Race' পরিচ্ছেদটি অনুধাবন করা যেতে পারে।

জর্জ বফুন (১৭৪৯) তাঁর ন্যাচারাল হিস্ট্রি (Natural History) বইটিতে একাধিক জনগোষ্ঠীকে জাতি হিসেবে বর্ণিত করেছেন। সেই তখন মানবজাতির বিবিধতা, ও বিভিন্ন বিচারের মান বা নীতির উপর ভিত্তি করে মানব জাতির নানারকম শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে নৃতত্ত্ব বিদ্যা এবং সামাজিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে বিগত আড়াই শতক

ধরে এই শ্রেণীবিন্যাস চলে আসছে। নীচে কোন একটি জাতিকে তার জাতিতত্ত্বমূলক গোষ্ঠী বা প্রকারভেদে রূপ গণ্য করতে হবে।

জাতিগত শ্রেণীবিন্যাস এবং বিভিন্ন বিচারের মানের ওপর ভিত্তি করে গোষ্ঠী

সারনী ১ ঃ বিভিন্ন জাতি (জাতিতত্ত্বমূলক গোষ্ঠী) বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে

পাঁচটি জাতি	তিনটি জাতি	ভৌগোলিক জাতি
ককেসিয় (শ্বেতকায়)	কয়েসিয়ড (শ্বেতকায়)	ইউরোপীয়
মঙ্গোলিয় (পীতবর্ণ)	মঙ্গোলয়েড (পীত)	আফ্রিকান
ইথিওপিয়ান (কৃষ্ণকায়)	নিগ্রয়েড (কৃষ্ণকায়)	এশিয়
আমেরিকান ভারতীয় (লোহিত বর্ণ)		ভারতীয়
মালয়ান (খয়েরী)		অস্ট্রেলীয়
		মালয়েশীয়
		পলিনেশিয়
		আরমেডিয়

সূত্র ঃ স্ট্যানলি মর্টন গার্ন (১৯৬৩) The Race of Mankind. The Book of popular Science Vol 8 1963. Grolier Incorporated New York.

সারণী ২ ঃ আধুনিক মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য

Note : Migrations and intermingling in the Passage of time have resulted in Primary Races Primary Sub Races Composite Sub-Races with in the different Stocks of Primary Race Composite Races and Secondary Races.

প্রাথমিক জাতি			যৌগিক জাতি	
প্রাথমিক জাতি	প্রাথমিক উপজাতি	যৌগিক উপজাতি	যৌগিক	গৌন জাতি
নিগ্রয়েড	১.আফ্রিকান নিগ্রো ২.নিলটিক নিগ্রো ৩.নেগরিটো		মালয়েশিয়া পাপুয়ান (ওশেনিক নিগ্রয়েড)	১.মালয়েশীয় ২.পাপুয়ান
ককেসিয় (শ্বেতকায় ইউরো আফ্রিকান ইউরোপীয়)	১.ভূমধ্যসাগরীয় ২.আইনু ৩.কেল্টিক ৪.নর্ডিক ৫.অ্যালপাইন ৬.পূর্ব বাল্টিক	৭.আর্মেনিয়ড ৮.ডাইনরিক অবশিষ্ট মিশ্ররূপ ৯.নর্ডিক আলপাইন ১০.নর্ডিক ভূমধ্য সাগরীয়	১. অস্ট্রেলিয় (আর্কেয়িক শ্বেতকায় তাসমনিয় + মেলানীয় পাপুয়ান) ২.ইন্দো-দ্রাবীড়িয় (প্রকটভাবে শ্বেতকায়: দ্রুপদী ভূমধ্যসাগরীয়	

প্রাথমিক জাতি			যৌগিক জাতি	
প্রাথমিক জাতি	প্রাথমিক উপজাতি	যৌগিক উপজাতি	যৌগিক	গৌন জাতি
			+ অস্ট্রেলিয় +নিগ্রিটো + ইরানীদের সামান্য ভগ্নাংশ, অ্যারমেনির নির্ভক, মোঙ্গোলয়েড Morphological ধ্রুপদী দ্রাবীড়িয় আর্মেনিয় ইরানী ইন্দো-নর্তিক (ভেদ্দোদ) (নগ্রিটয়েড) ৩. পলিনেশীয়	
মঙ্গোলয়েড	১.ধ্রুপদী মঙ্গোলিয় ২.আর্কটিক মঙ্গোলিয়		১.ইন্দোনেশীয় মঙ্গয়েড (ইন্দোনেশীয়ান মালয়) (মঙ্গলয়েড + ভূমধ্য সাগরীয় + আইনু + নেগ্রিটো ২.অ্যামেরিকান ভারতীয় (মঙ্গোলয়েড + ইরানী + অস্ট্রেলিয় + নেগ্রিটয়েড	১.মালয়- মঙ্গোল ২.ইন্দোনেশীয়

সূত্র ঃ আর্নেস্টে অ্যালবার্ট হুটন (নৃতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়): up from the Age

সারণী ৩ ঃ মানবজাতির (জাতিগতভাবে) একটি পরিবর্ত শ্রেণীবিন্যাস

I ক্যাপিয়ড	II কনগয়েড	III ককেশিয়	IV অস্ট্রেলিয়	V মঙ্গোলিয়
ক) খয়েড	ক) মধ্য আফ্রিকান	ভূমধ্যসাগরীয় • পশ্চিম • ভূমধ্যসাগরীয় • পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় • ডিনারিসিয়	ক) ভেদয়েড • অস্ট্রেলিয় অবশিষ্টাংশ জনগোষ্ঠী যারা মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী	ক) উত্তরপূর্ব এশীয়

I ক্যাপিয়ড	II কনগয়েড	III ককেশিয়	IV অস্ট্রেলিয়	V মঙ্গোলিয়
		• দক্ষিণ • আরাবিড		
খ) সানিড	খ) বাম্বুটিড	খ) ভিনারিক	খ) নেগ্রিটোস	খ) দক্ষিণ পূর্বএশীয়
	গ) হটেণ্টপিড	গ) অ্যালপাইন	গ) মেলানেসিয়ান	গ) মাইক্রোনেশিয়ান পলিনেশিয়া
		ঘ) ল্যাডোগান	ঘ) অস্ট্রেলিয় তাসমানীয়	ঘ) আইনুড
		ঙ) নর্ডিস		
		চ) আর্মেনিড		
		ছ) তুরানিড		
		জ) ইরানো আফগান		
		ঞ) ইন্ডিক বা নর্ডিড্রিন্ডিড		
		ত) দ্রাবিড়িক		

সূত্র ঃ রিচার্ড ম্যাক্কুলোখ ঃ The Races of Humanity.

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক আর্নেস্ট্র অ্যালবর্ট হুটোন এর মতে ভারতবর্ষে "শত সহস্র কোটী বসবাসকারীগণ কেউই শারীরিক ভাবে একজাতীয় নয় এখানে বহুধারার জাতিগত মিশ্রণের ফলে একটি বিশেষ ধরনের যৌগিক জাতির উৎপত্তি হয়েছে যাদের গাত্রবর্ণের মূল সূত্র ছিল প্রবল ভাবে শ্বেতকায়। এই জাতি গোষ্ঠীর জন্য অতীতের দ্রাবীড়িয় শব্দটির পরিবর্তে ইন্দো-দ্রাবীড়িয় শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। 'দ্রাবীড়িয় হ'ল একটি ভাষাতাত্ত্বিক নাম' যেটি বহু আদি যুগে ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপতটে অঞ্চলে যে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মানব গোষ্ঠীকে দেখা যেত তাদের ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যবহৃত হত।

প্রাক - শব্দ ইন্দো কথাটি যৌগিক জাতিকে গুরুত্ব প্রদান করে। যে সমস্ত সভ্য মানুষ ইন্দো-আর্য ভাষায় কথা বলত তারা এবং একই সঙ্গে যারা মুণ্ডা ভাষায় কথা বলত এরা সকলেই এই যৌথ জাতির অন্তর্গত ছিল। যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি বর্গ ইন্দো-দ্রাবীড়িয়র সংমিশ্রণ অবদান রয়েছে, নৃতত্ত্ববিদগণ তাদের বহু আগে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু ডঃ বি.এস গুহ কতৃক সম্পাদিত ৫১টি জাতি গোষ্ঠী নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান ভারতবর্ষের জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের বিষয়টিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভারতীয় জনগন ঃ ইন্দো-দ্রাবিড়ীয় যৌথ জাতিগত গোষ্ঠী বা বর্গ সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে নৃতত্ত্বগত ভাবে প্রবলভাবে একটি শ্বেতকায় যৌথ জাতি - যাদের ইন্দো-দ্রাবীড়িয় বলা যেতে পারে। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে জাতিগত মূল উপাদানগুলির সংমিশ্রণ ঘটেছে সেটি হল ইন্দো-দ্রাবিড়ীয়, জাতি, যেটি ধ্রুপদী ভূমধ্যসাগরীয় + অস্ট্রোলয়েড (ভেদয়েদ) + নেগ্রিটো + ইরানীয় উপতটের সামান্য ভগ্নাংশ বা আর্মেনয়েড, নর্ডিক, মঙ্গোলয়েড এর সংমিশ্রণ।

- ধ্রুপদী ইন্দো-দ্রাবীড়য়, একটি অপমিশ্রিত ভূমধ্যসাগরীয় নমুনা লম্বাটে মুখ, খর্বকার, বাদামী চামড়া এই উপাদানগুলি বেশী সংখ্যায় উত্তর ভারত এবং কিছু পরিমাণে পঞ্জাবের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

- অস্ট্রোলয়েড ভেদ্দিয়দ ঃ খর্বকায়, কুঞ্চিত কেশ, খয়েরী গাত্রবর্ণ, ডাইলেসেফাল, সুস্পষ্ট ভ্রু সংযোগ রেখা, অবদমিত নাসিকা মূল, চাওড়া নাক, এদের মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়।
- নেগ্রিটিয়েড ঃ পশমের মত কেশরাশি সমৃদ্ধ এবং নেগ্রিটিয়েডদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দক্ষিণ ভারত এবং আন্দামানের প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।
- আর্মেনয়েড ইরানীয় উপতট ঃ শ্মশ্রু গুম্ফ যুক্ত, লোমশ শরীর উন্নত নাসিকা, মসৃণ কলাপ যুক্ত এই ধরনের মানুষদের পশ্চিম ভারত এবং বঙ্গদেশে দেখা যায়।
- ইন্দো-নর্তিক ঃ উত্তর পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে এ ধরনের মিশ্র নর্তিক জাতীয় মানব গোষ্ঠীকে দেখা যায়।
- মঙ্গোলয়েড ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয়ের সীমানা বরাবর এদের দেখা যায়।

হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স এবং প্রধান জনজাতি গোষ্ঠীর উৎস কোথা থেকে? ভূতাত্ত্বিক সময়ের মাপকাঠি অনুযায়ী মধ্য মিয়োসিন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পেন্সিডস্ এবং হোমিনিডস্ এর বিবর্তন হয়ে চলেছে। এটি একটি মনে রাখার মতো ঘটনা যে কাকতালীয় ভাবে হিমালয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবর্তনও ঠিক এই মধ্য মিয়োস্তিন যুগেই ঘটে। তাই এটি পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ ঘটনার ত্রিবেনী সঙ্গম এবং বিকিরণ বিন্দু বলে ধরে নেওয়া যায়। বিবর্তনের স্তরে হিমালয় কী একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল? হিমালয়ের পাদদেশে যে শিবালিক জীবাশ্মের স্তর পাওয়া গেছে তা প্রচুর পরিমানে ড্রাইয়োপথিকাস বানর জাতীয় প্রাণীর ড্রাই য়োপথিকাস, ব্রমাপিথিকাস, রামাপিথিকাস, সিভাপিথিকাস, এরা বানর শ্রেণীর প্রাণীর বিবর্তনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোথাও কোনো হোমিনিড জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। ভারতবর্ষে পেলিওথিলিক যুগ এমনকী নিওলিথিক যুগের প্রধান বস্তু বিশেষ কিছু নেই। যদিও পোলিওথিলিক যুগের বেশ কিছু প্রয়োগগত চিহ্ন ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে কিন্তু সে যুগের কোন মানব কঙ্কাল বা করোটি পাওয়া যায় নি যা থেকে নিরাপদ ভাবে অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে নিওলিথিকা সময় বা যুগটিকে অভিহিত করা যায়। এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য হিসাবে ধরা উচিত।

আর্যদের আসল বাসস্থান সম্বন্ধে নানারকম মতামত আছে।

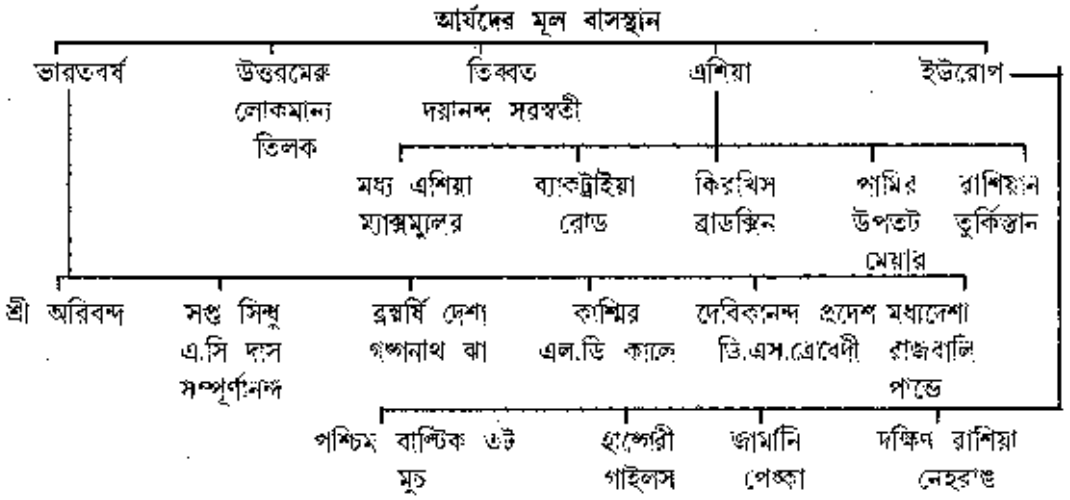

Source : *GUTTOR FRANCOIC (1996) : *Rewriting Indian History*, Vikas Publication House Pvt. Jungpura. New Delhi - 110014

1. MITTAL, A.K. (1994) : *Political and Cultural History of India*, Satya Bhawan, Agra.

জাতি বিষয়ে ইউনেস্কোর মতামত (UNESCO) (The UNESCO Statement on Race)

ইউনেস্কো (UNESCO) 'র পৃষ্ঠপোষকতায় দুইটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয় বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং জাতিগত প্রশ্নে ব্যাপক গনহত্যা। এই সম্মেলনের নির্যাস হিসাবে জাতি বিষয়ে দুটি বিবৃতি বেরিয়ে আসে ঃ প্রথমটি সমাজ বিজ্ঞানীদের উক্তি এবং দ্বিতীয়টি নৃতত্ত্ববিদ এবং জিনতত্ত্ববিদদের বিবৃতি।

- প্রথম বিবৃতিটি ছিল সমাজ বিজ্ঞানীদের। (এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ই. ফ্র্যাঙ্কলিন ফ্রেজিয়ার, ক্লদ-লেভি স্ট্রাস্ এবং অ্যাসলে মন্টেগু প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ)। এই বিবৃতিটি ১৯৫০ সালে ২৮শে জুলাই প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় মানুষের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই অনেক বেশী। মনুষ্য জাতির কথা বলতে গেলে 'জাতি' শব্দটি বাদ দিয়ে বরং জাতিতত্ত্বমুলক গোষ্ঠী বলাটাই শ্রেয়। এই মুহূর্তে যে সব বৈজ্ঞানিক সারবত্ত আমাদের হাতে আছে তা থেকে কখনই এই সিধান্তে উপনীত হওয়া যায়না যে জিনগত প্রভেদই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতির তফাৎ গড়ে তোলার মূল কারণ। বিবর্তনের মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন শিক্ষাগত পরিবেশ এগুলিই বরং অনেক বেশী প্রণিধানযোগ্য বলে ধরা উচিত। এই গুণগুলি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই বিরাজ করে। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অসবর্ণ বিবাহ এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আন্ত বিবাহে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। এর কোন ভিত্তি নেই। বাস্তব নির্ভর সামাজিক উদ্দেশ্য জাতি বিষয় যত না গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দাবী করে এক অলীক সামাজিক ধারণা। প্রায় সব জনজাতি গোষ্ঠীর মানসিক ক্ষমতা প্রায় কাছাকাছি।
- দ্বিতীয় বিবৃতিটি ছিল নৃতত্ত্ববিদ এবং জিনতত্ত্ববিদদের (যাঁদের মধ্যে জে.বি.এস হালডেন, টমাস ডোবঝানস্কি এবং জুলিয়ান হাক্সলির মত স্বতন্ত্র ব্যক্তিরাও ছিলেন) এই বিবৃতিটি ১৯৫২ সালের ১৫ই জুলাই প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতি অনুসারে আজকের পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ একই প্রজাতির হোমো সেপিয়েন্স। দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে একটি বড় গোষ্ঠীকে অপর একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর তুলনায় যে ভাবে স্বতন্ত্র করা যায় তার মধ্যে কিন্তু উন্নত ভাব বা হীন ভাবের কোন স্থান নেই যদিও প্রায়শই দুটি জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে এই বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হয়। তথাকথিত খাঁটি বা নিখাদ জাতির কোন প্রমাণ বা অস্তিত্ব সেই অর্থে তেমন ভাবে আজও পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক যে প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায় সে ক্ষেত্রে জিন ঘটিত তফাৎ বিষয়টি খুব সামান্য ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

৩.৩.৪ ভাষার উপাদান (The Language Elements)

ভারতীয় জনগণের ভাষাকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- অষ্ট্রিক বা অন্যভাবে বলা যায় কোল, মুন্ডা প্রভৃতি যারা মূলত পাহাড়ি উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ
- তিব্বতী চৈনিক বা সাইনো তিব্বতী পূর্ব উপকূলে সীমাবদ্ধ
- দ্রাবিড়ীয় এবং
- আর্য বা ইন্দো ইউরোপীয়

গোদাবরী নদীর দক্ষিণ অঞ্চলে যে বৈদিক আর্যগণ প্রথমভাবে বিরাজ করত তাদের এবং প্রাথমিক অবস্থার দ্রাবিড়দের ভাষার সংমিশ্রণের ফলে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি উদ্ভূত হয়।

তামিল ভাষার শব্দ ভান্ডার পরীক্ষা করতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ এটিকে সংস্কৃত ভাষার রূপ এবং বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক আলাদা বলে লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন যে সংস্কৃত এবং ল্যাটিন ভাষার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা বা কখনও কখনও সংস্কৃত এবং গ্রীক ভাষার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখার জন্য তিনি ক্রমান্বয়ে খাঁটি তামিল ভাষা নিয়ে চর্চ্চা করেন। এতে করে তাঁর মনে হয়েছিল যে তামিল ভাষায় সঙ্গে ঐ সব ভাষার যোগসূত্র আছে তবে মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও যেন সূত্রটি হারিয়েও গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি দ্রাবিড়ীয় ভাষার মধ্যে দিয়েই প্রকৃত ন্যায়, নীতি এবং সত্যকে উপলব্ধি করেন এই ভাবে যে এটি হল আসলে আর্যভাষার আদিরূপ। এর থেকে এমন একটি সম্ভাবনার উদ্রেক হয় যা থেকে মনে হয় কখনও বোধ হয় এরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল বা আদিভাষার থেকে দুইটি ভিন্ন ভাষা হিসাবে উৎসারিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে মেহেরগড় থেকে পাওয়া প্রমাণাদির থেকে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হয় যে সিন্ধু সভ্যতা মিশরীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার সমকালীন আরও একটি অতিপ্রাচীন সভ্যতা।

৩.৩.৫ বর্ণের বিভিন্ন উপাদান (The Elements of Castes)

ভারতীয় সমাজের অন্যতম প্রবল বিষয় হ'ল বর্ণ প্রথা। এক একটি বর্ণ এক একটি জীবনধারার কথা বলে যে জীবনধারা তার নিজস্ব নিয়ম নীতি এবং রীতি রেওয়াজ মেনে চলে। বিবাহ, খাদ্যাভ্যাস, নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই সব রীতি রেওয়াজগুলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই রীতি রেওয়াজগুলির যোগসূত্রের দ্বারাই কুল পরম্পরা জাতি পরম্পরা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে যা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ জীবন এবং বিস্তৃত সাংস্কৃতিক জীবনে ভীষণভাবে সম্মানিত এবং সমাদৃত হয়ে এসেছে। সৃষ্টি ও দর্শন সম্বন্ধীয় জ্ঞান হতে উদ্ভূত গনতান্ত্রিকতাই হচ্ছে ভারতীয় স্বভাবসিদ্ধ। ভারতীয় মনন এবং সংস্কৃতি, গণতন্ত্রের বোধ, স্বাধীনতা এবং সমতা এইগুলি ভারতবর্ষের মানসিকতায় চিরায়ত এবং এই বোধগুলি যেন ভারতবর্ষের প্রতিটি ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। কোন রকম বহিঃশক্তির দ্বারা এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়।

বর্ণাশ্রম প্রথা যা বলা ভাল জাতি প্রথা ভারতবর্ষে ভীষণভাবে প্রকট। এটি শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই প্রবলভাবে প্রতীয়মান নয় এমনকি মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যেও এর প্রভাব দেখা যায়।

হিন্দু : হিন্দু জনগোষ্ঠী বর্ণ দ্বারা সংগঠিত। মানুষ এমন সহস্র বর্ণের মধ্যে কোন একটি গোষ্ঠীর আওতায় জন্ম গ্রহণ করে। যে বর্ণের অধীনে কোটি মানুষের জন্ম, সেই বর্ণ মানুষটির জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে চলে

- কোন বিশেষ বর্ণের অধীন একটি পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে একই ধরনে কাজ করে চলে।
- গ্রামীন সমাজে কিছু কিছু বৃত্তি যেমন চাষাবাদ ইত্যাদি হয়ত সকলের জন্যেই উন্মুক্ত থাকতে পারে কিন্তু সাধারণত কাজের ভিত্তিতেই বর্ণ নির্ধারিত হয় যেমন (নাপিত, কামার কর্মকার, ছুতার, মুচি, কুমোর, ধোপা, পুরোহিত ইত্যাদি)
- মানুষ সাধারণত নিজ বর্ণেই বিবাহ করে।
- মানুষ বিশ্বাস করে যে স্বাভাবিক এবং স্বতস্ফূর্ত ভাবে তারা যে ধরনের কাজের সুযোগ পাচ্ছে তা যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় তাহলেই তাদের জীবনের ইচ্ছা এবং চাহিদাগুলির পূরন হবে।
- মানুষ যাতে নিজ নিজ বর্ণের জন্য গর্ব অনুভব করে এবং এক একটি বর্ণের সঙ্গে যে সমস্ত মুনি ঋষি জড়িত পূর্বপুরুষ হিসেবে তাঁদের কৃত কর্মের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চায় যে কারণ একদা তাঁরা খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

- শত সহস্র বর্ণ আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল চারটি বর্ণের দ্বারা বর্ণাশ্রমে ব্যাবস্থাটি গঠিত - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র।
- মানুষ বিশ্বাস করে যে জন্ম সূত্রে পাওয়া বর্ণ কখনই চারটি পুরুষার্থ যথা ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রভৃতিকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে কখনই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।
- মানুষ বিশ্বাস করে যে কোন একজন ব্যক্তি তিনি যত নিম্ন থেকে নিম্নতম বর্ণ বা উচ্চ থেকে উচ্চতম বর্ণের হন না কেন সেই তিনি নিজেকে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীতে রূপান্তরিত করে এই সামাজিক বর্ণাশ্রম প্রথা থেকে মুক্ত করতে পারে এবং সকলের সম্মানীয় রূপে গণ্য হতে পারেন।
- বর্ণপ্রথা কর্ম এবং সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাথে তার অর্থও হারিয়েছে ঃ
  - — পরিবহন এবং চলমানতা
  - — নূতনতর অর্থনৈতিক সুযোগ
  - — নূতন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ
  - — জীবিকার সন্ধানে নগরমুখী অভিবাসন

মুসলিম ঃ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বর্ণ ভেদ আছে যেমন -- 'আসরাফ' যারা সম্মানীয় এবং বাকিরা 'আইলাফ' বা সাধারণ। উত্তর প্রদেশে এটা অনেকটা হিন্দু ধর্মের 'দ্বিজ' এবং অন্য সাধারণ বর্ণের মানুষদের মত এইভাবে তুলনা করা যায়।

আসরফদের বিদেশ থেকে আগত অ ভারতীয় উত্তরসুরী হিসেবে গণ্য করা হয়। এঁরা বংশ পরম্পরায় ভূসম্পত্তির অধিকারী ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী এবং অপেক্ষাকৃত ঐশ্বর্য্যবান। উত্তরপ্রদেশে চার শ্রেণীর আসরফ এর দেখা মেলে সৈয়দ, শেখ, মুঘল এবং পাঠান। সৈয়দরা হ'লেন ইসলামের চতুর্থ খলিফার কন্যা এবং জামাতার বংশধর। সৈয়দদের মধ্যে আবার প্রায় কুড়িটি বিভাগ আছে। এক একটি বিভাগের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহের প্রচলন থাকলেও তা কখনই বাধ্যতামূলক নয়। আরব দেশীয়দের উত্তররসুরী হিসাবে শেখদের ধরা হয়। শেখদের বিবাহ নিজ গোষ্ঠী বা সৈয়দদের সঙ্গে হতে পারে কিন্তু মুঘল এবং পাঠানদের সঙ্গে বিবাহের ঘটনা অতি বিরল। মুঘল এবং পাঠানদের যথাক্রমে মঙ্গোল এবং আফগানদের বংশধর রূপে ধরা হয়। আসরফ গোষ্ঠীর কোন সদস্য কখনই কোন অনা-সরফ গোষ্ঠীর সদস্যকে বিবাহ করতে পারেনা এমন কী তাদের কাছ থেকে অন্ন গ্রহণও করে না।

মুসলিম সংবিধান অনুসারে তাদের ধর্মে এর পরেই যাদের স্থান তারা "নিষ্কলুষ বৃত্তিধারী বর্ণ" এঁদের পুবপুরুষ ছিলেন হিন্দু রাজপুতগণ যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানে পরিণত হয়।

মুসলিমদের মধ্যে নিম্নতম বর্ণ হল যারা পরিচারক, মেথর প্রভৃতি নিচু ধরনের কাজ করে এরাও আসলে এক ধরনের ধর্মান্তরিত শ্রেণী যারা নিজেদের পূর্বেকার জাতিগত পেশাকে নাম এবং অক্ষমতাকে বজায় রেখেছিল। উচ্চবর্গীয় মুসলমানেরা সাধারণত এদের ছোঁয়া পান না। গ্রামাঞ্চলে এদের মসজিদে প্রবেশ করে প্রার্থনা করতে দেওয়া হয়না, তারা মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে।

শহরাঞ্চলে অবশ্য বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে একই পঙক্তিতে বসে আহার গ্রহণ ক্রমশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজেও সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। হিন্দুদের মত মুসলিমদের মধ্যে নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। সুন্নি এবং সিয়া নামে ইসলামের দুই প্রধান সম্প্রদায় ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে

প্রবেশ করে। ভারতে প্রবেশের পর উভয় সম্প্রদায় আবারও বিভক্ত হয়। সিয়াদের একটি শাখা ইসমাইল নামে পরিচিত, আগা খাঁকে এই শাখার প্রধান ধরা হয়। ইসমাইলিদের আরও দুটি প্রধান গোষ্ঠী হ'ল গুজরাটের বো'রা এবং খোজা। একজন সিরীয় যিনি আদিতে ইহুদী ছিলেন তিনি মুসলিমদের মধ্যে একটি Cult স্থাপনা করেন যারা হিন্দু, খৃষ্টান এবং ইহুদী আচার আচরনের সংমিশ্রন। মুসলমান ধর্মের বহু বর্গ হিন্দু আচার ব্যবহারকে সম্মান করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলাম ধর্মে আহমদিয়া বলে একটি আধুনিক বর্গের উৎপত্তি হয়। এটী আধুনিক প্রতিষ্ঠান এবং Fundamentalist theology 'র সংমিশ্রণ।

ইহুদী, খৃষ্টান এবং পার্শীগন ভারতবর্ষে সহস্র বছরেরও বেশী সময় ধরে ভারতের আঞ্চলিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আলাদা জাতির সদস্য হিসাবে বসবাস করছে।

ইহুদী ঃ ভারতবর্ষে কেরালা, কোচী এবং মহারাষ্ট্রে ইহুদীদের প্রাচীনতম বসতি দেখা যায়। ইহুদীদের দু'টি গোষ্ঠী শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় শ্বেতকায় ইহুদীরা কখনই কৃষ্ণকায় ইহুদীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বা পান ভোজনের সম্পর্ক স্থাপন করে না। শ্বেতকায় ইহুদীদের দাস যারা তারা ধর্মান্তরিত হয়ে আবার একটি তৃতীয় জাতি গঠন করেছিল।

খৃষ্টান ঃ ভারতীয় খৃষ্টানদের দুইটি নির্দিষ্ট পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; প্রাচীন এবং আধুনিক। প্রাচীন খৃষ্টানরা সিরিয় খৃষ্টানরূপে সমধিক পরিচিত। এরা সহস্র বছর আগে ভারতবর্ষে এসে কেরালার উপকূলে বসতি স্থাপন করে এবং কিছু আদি ভারতীয় অধিবাসিদের ধর্মান্তরিত করে কেরালার স্থায়ী খৃষ্টান গোষ্ঠীর স্থাপনা করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিদেশী উপনিবেশকারীদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইউরোপিয়ান মিশনারি বা ধর্ম যাজকদের হাত ধরে ভারতবর্ষে আধুনিক খৃষ্টানদের সূচনা হয় ক্রমে তারা ভারতে রাজনৈতিক দখল এবং নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এই ধর্মযাজকেরা পেশাদারি ভাবে স্থানীয় জনগণকে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করে। তাদের এই কাজ ইউরোপীয় শাসকদের সর্বত্র সমর্থন পায়। খৃষ্টান সমাজ নানাবিধ অধিকার রীতি নীতি সবকিছু গির্জার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। পরবর্তীকালে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল তারা তাদের পূর্ব ধর্মের কিছু কিছু নিয়ম কানুন সামাজিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যা হিন্দুধর্মের আওতায় থাকাকালীন তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল সেগুলিকে খৃষ্টধর্মে সংমিশ্রিত করে।

পারসিক ঃ অষ্টম শতকে পারসিক বা পার্শীরা ভারতবর্ষে এসেছিল। তারা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে একটি সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করতে থাকে। সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক উভয় দিক থেকে তারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত সম্মানের আসনে আসীন হয়ে আছে।

৩.৩.৬ ভারতীয় উত্তরাধিকারের ঐতিহ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত তথ্য (The Disinformation on Indian Heritage)

ফ্রাঙ্কো গতিয়ের তাঁর সাম্প্রতি প্রকাশিত (১৯৯৬) গ্রন্থ পুনর্লিখিত ভারতের ইতিহাস (Rewriting Indian History) এ ভারতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের তিনটি ভ্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিকরা অন্ধের মত অনুসরণ করে এসেছেন এমন কী ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও এর বাইরে নন। ইতিহাসের প্রকৃত সত্য নিরুপণ না করে এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা হয়েছে এবং পৃথিবী জুড়ে এগুলি পুস্তকেও স্থান পেয়েছে ভারতও এর থেকে বাদ যায়নি। তিনি তাঁর গ্রন্থ "The Tainted Glass : A look an Western Civilization"

তিনটি বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ঃ

- প্রথম বিকৃতি ঃ আর্য বনাম দ্রাবীড়িয়
- দ্বিতীয় বিকৃতি ঃ বেদ সম্পর্কিত
- তৃতীয় বিকৃতি ঃ বর্ণাশ্রম প্রথা

প্রথম বিকৃতি ঃ আর্য বনাম দ্রাবীড়িয়

প্যালস্টাইনে খৃষ্ট-পূর্ব বহু জনগোষ্ঠী হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল যিশু খৃষ্টের জন্মকে ঘিরে যে প্রবাদ প্রচলিত তা শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধের জন্মের প্রবাদের মতই। খুব সম্ভবত যিশু খৃষ্ট ভারবর্ষে এসেছিলেন আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্রেক হওয়ার জন্য। গির্জার গঠন শৈলীর সঙ্গে বৌদ্ধ চৈত্যের মিল পাওয়া যায়। প্রথম দিককার খৃষ্টানদের প্রাথমিক সত্য নিরুপণ হয়ত জৈন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

পাশ্চাত্যের বহু দেশে যখন বর্বরতাই নিয়ম ছিল সেই সময় পশ্চিম পৃথিবীকে খৃষ্টধর্ম ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে খুন, জখম, কলহে ভরা পৃথিবীতে একধরনের পরিচ্ছন্ন ভাব দেখা গেল। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতা ভীষণভাবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে জড়িত যদিও এই সভ্যতার অনেক রূপান্তর ঘটেছে। উপনিবেশিকতার যুগে ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের অধিকৃত অঞ্চলের মানুষদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য ধর্মযাজকদের উৎসাহিত করেছে এবং এই কাজের জন্য তারা তাদের সামরিক শক্তিতে ব্যবহার করতেও কার্পন্য করেনি। পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগুলিকে এদেশে প্রয়োগ করার জন্য তারা পুরোপুরি দায়বদ্ধ এবং একনিষ্ঠ ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফল হিসাবে তারা অধিকৃত অঞ্চলের মানুষদের যাদের তারা অসভ্য বর্বর ছাড়া অন্য কিছু মনে করত না, তাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল দেখা গেছে যে যেখানে যেখানে "খৃষ্টের সৈন্যরা" গেছে, তারা সেখানকার শত সহস্র শতাব্দী প্রাচীন জীবন পদ্ধতি এবং সংস্কৃতিকে অপসারিত করে সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তার ধরনধারনও পাল্টে দিয়েছে। এর ফলে অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের তৃতীয় প্রজন্ম নিজেদের জীবন যাত্রা সংস্কৃতির মূল সূত্র ভুলে তাদের পূর্বপুরুষ যাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল তাদেরকেই নতুন প্রজন্ম তাদের পরিত্রাতা বলে ভাবতে শুরু করে। ঠিক এই কারণে একই ভাবে দক্ষিণ আমেরিকার একটা এবং আজটেক নামক সর্বোৎকৃষ্ট দুইটি সভ্যতা স্প্যানিস সৈন্য এবং ধর্ম যাজকদের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম শতকে ভারতবর্ষে সীরিয় খৃষ্টানদের আগমনের সময় থেকে ভারতবর্ষ খৃষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এরা কেরালায় ভারতীয় জীবনে অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে যে খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা এদেশে প্রবেশ করে তারা আবিষ্কার করে যে হিন্দু ধর্ম এমনই এক ধর্ম যা অন্যান্য সমস্ত ধর্মকে সত্য বলে মেনে নিকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেয় তা সে ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের যতই দর্শনিক পার্থক্য থাকুক না কেন। তারা আর লক্ষ্য করে যে এদেশের মানুষ তাদের মাতৃভূমিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তারা এও বুঝতে পারে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না এখানকার মানুষ যেন এক জাতি এক প্রাণ। এদেশের মানুষের রক্তের মধ্যে আত্ম মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি আত্মসমর্পনের বীজ বোনা আছে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করা খুব শক্ত। অতএব সহিষ্ণুতা, এবং নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে খৃষ্টান সন্ন্যাসীরহিন্দু ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে তাকে অনুধাবন করতে থাকে; এই থেকে তারা ক্রমশ হিন্দুধর্মের আত্মশক্তি যা হিন্দু সমাজের সুস্পষ্ট হওয়ার মূল তাকে চিনতে এবং বুঝতে পারে তারা এও বোঝে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না এইগুলিকে ধ্বংস করা যাচ্ছে বা মুছে ফেলা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নূতন ধর্মের এদেশে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়।

"তখনই জন্ম হল" গতিয়ের এই ভাবে লিখছেন, সেই মহান তত্ত্বের "আর্যদের অনুপ্রবেশের তত্ত্ব এবং নিম্ন বর্ণ দ্রাবিড় এবং উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মন ও ক্ষত্রিয় যারা উভয়ে উভয়কে করুনা, ঘৃণা করে এসেছে এমন দুই সভ্যতার সপক্ষে দুইটি তত্ত্ব। আশ্চর্য্যের বিষয় আজও এই ধারণা চলে আসছে এবং পশ্চিমের প্রতিটি ঐতিহাসিক এই তত্ত্বগুলিকে ব্যবহার করেছেন এবং অত্যন্ত দুভার্গ্যজনক এই যে বেশীর ভাগ ভারতীয় পুস্তকেও এসব কথা লেখা আছে। তিনি বলেছেন এই কথাগুলি কেমন শোনাচ্ছে -- পূর্বপরিকল্পিত? সরলীকৃত? অসম্ভব? যাই হোক না কেন তথাপি এই তত্ত্বগুলি শুধুমাত্র যে বৃটিশ সন্ন্যাসীর তৎকালীন ব্রাহ্মন যারা একা হাতে প্রায় পাঁচ সহস্র বছর ধরে মুখে মুখে শুধুমাত্র স্মৃতি নির্ভর হয়ে হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে অচ্ছুৎদের খেপিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল তাই নয় এটি বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তি এদেশে বিভাজন এবং শাসন" এই পদ্ধতির পথটিকেও সুগম করে দিয়েছিল। এদেশে ইংরাজি শিক্ষার পিছনে ম্যাকলে নামের যে মস্তিষ্কটি কাজ করেছিল তিনি ১৮৩৬ সালে তাঁর পিতাকে লিখছেন "এখন আর এমন কোন হিন্দু অবশিষ্ট নেই যে ইংরাজি শিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ায় পর তার নিজ ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে।"

অথচ আর্য এবং দ্রাবিড়দের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছিল আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোথাও তার কোন চিহ্ন বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি। যদিও রাম রাবণের যুদ্ধকে আর্য ও অনার্যের মধ্যে সংগ্রামের ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা হয় তবুও ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণের যে কোন শিশুও জানে যে রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মন সন্তান। তা হলে আর দুটি জাতির মধ্যে যুদ্ধের কথা আসে কী করে? ডাচ্ বা ওলেন্দাজ সমাজ তাত্ত্বিক কোনাড এলস্ট দেশীয়/স্বদেশজাত ভারতীয় এই দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেন। তিনি তাঁর ধারণার স্বপক্ষে অতি সম্প্রতি যে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বস্তুগুলি থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তা থেকে মনে করা হয় যে বৈদিক সভ্যতা এবং হরপ্পা'র (দ্রাবিড়ীয়) সভ্যতা দুটি এক এবং অদ্বিতীয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই তার মহান তত্ত্ব "উর্চ্চিমট" এর উপস্থাপনা করেন

- আর্যরা আসলে ভারতবর্ষে ছিল
- ভারতবর্ষ থেকে আর্যরা ইরানে যায়, তারপর তুর্কীস্তান
- এবং সবশেষে ইউরোপে প্রবেশ করে

দ্বিতীয় বিকৃতি : বেদ

"বেদ হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া" এবং "অ-দার্শনিক প্রকৃতি উপাসনার উৎস" বেদ সম্বন্ধে বিদেশী যাজকে এই ধরনের বিকৃত তথ্য পরিবেশ করতে থাকে তারা বেদকে একদল নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের গ্রন্থ বলে প্রচার করতে থাকে। বেশীর ভাগ পশ্চিমি ঐতিহাসিকগণ এই ধারণাকেই সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে চলেন। তারা বেদ'এ খুব সামান্য পরিমাণে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পরিচয় পান এবং এটিকে খৃষ্টপূর্ব ১০০০ বা ১৫০০ বছরের পুরাতন, প্রাচীন ধ্যানধারণার লিপি বলে চালিয়ে দেন এবং এই ধারণাগুলি পশ্চিমিদের দ্বারা আনীত আধুনিক সভ্যতায় সমৃদ্ধ বিশ্বজোড়া ঐতিহাসিকরাই শুধু অন্ধের মত মেনে নিয়েছিলেন তাই নয় অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে বেশীরভাগ ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও মূল সত্যকে যাচাই না করেই এ সব কথা মেনে নেন। Mr. Gantier প্রশ্ন তুলছেন, কেন ঐতিহাসিকরা বেদ কে একটি আবোল তাবোল কুসংস্কারে ভরা নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একটি প্রাচীন গ্রন্থ বলে তুলে ধরতে এত উতলা হলেন? কারণ, এ না হলে বেদ পশ্চিমের /পাশ্চাত্যের নিজস্ব উৎকৃষ্টতার ধারণাকে নস্যাৎ করে ধ্বংস করে দিত।

প্রাগৈতিহাসিক /আদিম বর্বরতা তখনও পর্যন্ত সম্ভবত এইরূপ উচ্চতায় উঠতে পারেনি যে বেদ এর

ধ্যানধারণাকে বুঝতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে পশ্চিমিরা যখন সাড়ম্বরে ঘোষণা করে যে "খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগে ২৩ শে অক্টোবর থেকে বর্তমান যুগের সূচনা" সুতরাং তার আগেও যে কোন সভ্যতা ছিল সে কথা সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন ছিল।

"Why did historians show such an eagerness to post-dating the Vedas and making of them just mumble-jumble of pagan superstition? Because it would have destroyed the west's idea of its own supremacy. Primitive barbarism could not possibly have risen to such high conceptions so early particularly when the Westerners have started our era after the birth of Christ and decreed that the world began on 23rd October 4000 BC."

অতি সাম্প্রতিক কালে যে সব গবেষনা হয়েছে তার মধ্যে "কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ (Carbon 14 analysis) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের মেহেড়গড় এবং সিন্ধু উপত্যকায় এই ধরনের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে জানা গেছে যে খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৭০০০ এর মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। যদিও সমস্ত বড় বড় প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা সবার শেষে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইতিহাস বইতেও সব শেষে স্থান পেয়েছে তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে সিন্ধু সভ্যতাই হ'ল প্রাচীন সভ্যতা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩২ সালে জাপানী বোমা বর্ষণের সময় যখন চীনের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে সেই সময় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে অনেক নীচে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি পূর্ণ একটি পেটিকা পাওয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপি থেকে চীনের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। পাণ্ডুলিপিটির লেখক সেই পাণ্ডুলিপিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং কোন অবস্থায় এটি লেখা হয়েছিল তার সম্বন্ধে কিছু লিখে রেখেছিলেন। চীন সম্রাট চীন-জে-ওয়াঙ নিজেকে শিক্ষা এবং জ্ঞানের মহান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিজের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতে এই লেখার বন্দোবস্ত করেন, তাঁর রাজত্বকালেই যে চীনদেশে শিক্ষার প্রসার শুরু হয় এবং চীনের প্রাচীন গৌরব ইত্যাদির ঐতিহাসিক তথ্য ও তার বর্ণনা এখানে নথিবদ্ধ করা আছে। এই পাণ্ডুলিপির লেখক চীনের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করেন এবং একটি টীকায় লেখেন কেন তিনি এই পাণ্ডুলিপিটিকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে যাচ্ছেন। এই পাণ্ডুলিপিটি স্যার অগস্টাস প্রিংস জর্জ্জ কিনে নেন এবং প্রফেসর অ্যাড্রিনি গ্রেমের নেতৃত্বাধীনে লন্ডনে কর্মরত কিছু চীনা বিশেষজ্ঞের হাতে এটি তুলে দেন। দ্বিতীয়জন এটিকে বৃটিশ জাদুঘরের কর্তা স্যার ওয়ালশ বজ্ কে দেখান এবং এটি দেখে স্যার বজ্ মন্তব্য করেন যে এই পাণ্ডুলিপিটি কোডেক্স সায়াটিকাস এর চেয়েও মূল্যবান। এই পাণ্ডুলিপিতে তাঁরা মনুর নিয়মের সরাসরি উল্লেখ পান যা ১০,০০০ বছর আগে বৈদিক ভাষায় প্রথম লেখা হয়েছিল। এই সূত্রটি থেকে ভারতবর্ষ, আমেরিকা এবং চীনের জনগনের মধ্যে যে সরাসরি সম্পর্ক ছিল তা বোঝা যায় এই পাণ্ডুলিপি থেকে আরো জানা যায় যে তৎকালীন যে সমস্ত নগর ধ্বংস হয়েছিল পরে যাদের ধ্বংসাবশেষ পেরুভিয়ান অরণ্যের মধ্যে পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। কিন্তু মানব ইতিহাসের এই মহান পাণ্ডুলিপিটির শেষ পর্যন্ত কী হল? এটি কি বৃটিশ জাদুঘরে পাওয়া যাবে? শোনা যায় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেশ কিছু পাণ্ডুলিপির নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং সংরক্ষনের স্বার্থে বৃটিশ জাদুঘর থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বেদ এর-ই বা কী হল? পশ্চিমি বিদ্বান ব্যক্তিরা যেটিকে "আদিম নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের আচার-অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্তসার" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন? সেই সব বিদ্বান ব্যক্তিদের দুর্ভাগ্য যে সম্প্রতি মহর্ষি মহেশ যোগীর প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈদিক বিজ্ঞানের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়ার কাজটি শুরু হয়েছে। তিনি নিজে

একজন পদার্থবিদ্যার ছাত্র, সেই তিনি যখন সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বিস্তারের একত্রীকরণ সূত্র (Unifieddfield Theory) সম্বন্ধে জানতে পারলেন তখন তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে অধুনালব্ধ "বিস্তারের একত্রীকরণসূত্র" সম্বন্ধে যে জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে তা বহু আগেই সবিস্তারে বেদ'এ বা বৈদিক সাহিত্যে বর্ণনা করা ছিল। (১৯৮৬) অধ্যাপক কেনেথ স্যান্ডলার লিখছেন "আধুনিক পরীক্ষা নির্ভর বিজ্ঞান এবং মহর্ষির বৈদিক বিজ্ঞানকে দুটি বিভাজিত ধারা হিসেবে মনে হলেও বিজ্ঞানের অন্তর্লীন সত্য এবং বাস্তবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এরা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে"-- একটি গবেষণা মূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এবং অন্যটি সচেতনতার একটি বিশেষ সূত্রকে অনুধাবন করার মাধ্যমে"। আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈদিক বিজ্ঞানে বিস্তারের একত্রীকরণের সূত্রের মধ্যে যে মিল পাওয়া গেছে তা বহু লব্ধ প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিকদেরও নয় বহু গণিতজ্ঞ, শারীরতত্ত্ববিদ এমন কী বেশ কিছু নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদেরও কৌতূহল আকর্ষণ করেছে।

তৃতীয় বিকৃতি ঃ বর্ণ প্রথা (The Third Disinformation : The Caste System)

আর্যরাই অনার্য তথা দ্রাবিড়দের এবং অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের উপর বর্ণ প্রথা চাপিয়ে দিয়েছিল এমন এক ভ্রান্ত তথ্য দারুন ভাবে বিস্তার লাভ করে।

বর্ণ প্রথার নাম করে প্রত্যেকে হিন্দু সমাজকে অন্যায়ভাবে শোষণ করে এসেছে বা বলা ভাল হিন্দু সমাজে অন্যায় ভাবে সুযোগ নিয়ে গেছে। গত দুই শতকে খৃষ্টান ধর্মযাজক মুসলমান এবং হিন্দু বুদ্ধিজীবিগণ, সার্বভৌমত্বের ধ্বজধারী ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিগণ এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ এই অন্যায় সুযোগ নিয়ে এসেছে শুধু মাত্র নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কিন্তু সত্যটি তবে কী? এটি কী তাহলে আর্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোন অভিযোগ যে তারা দ্রাবিড় এবং অনুন্নত শ্রেণীর ওপর বর্ণ প্রথা কায়েম করেছিল? বর্ণ প্রথার আসল উদ্দেশ্য তবে কী ছিল? তবে কী এটি সামাজিক কাজের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক বিভাজন ছিল? এটির কী অবক্ষয় হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে কবে থেকে? সারা পৃথিবী জুড়ে যত জাতি এবং সংস্কৃতি আছে তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এমনকী আজকে ইউরোপেও বিপুলভাবে এই শ্রেণী বিভাজন চোখে পড়ে। ভারতবর্ষের বর্ণ প্রথা কী সত্যিই খারাপ? এটিকে কী বাদ দেওয়া বা বর্জন করা যায়? আমাদের এটা ভোলা উচিত নয় যে বর্ণ প্রথা শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যে আছে তাই নয় ভারতবর্ষে খৃষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যেও বর্ণ প্রথা বর্তমান।

এটি এক ভারতীয় ঐতিহ্য একটি পরম্পরা। এটাকে বুঝতে গেলে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষকে বুঝতে হবে।

৩.৩.৭ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ঃ এক মহৎ সংশ্লেষ (The Great Synthesis : Unity in Diversity)

ভারতীয় সমাজের বহিরঙ্গ প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে রামায়ণ এবং মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের দ্বারা গঠিত এবং পরিপুষ্ট হয়েছে। উভয় মহাকাব্যই নীতি শাস্ত্র এবং সমাজ শাস্ত্র বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এই মহাকাব্যের শ্লোকগুলি নীতি এবং সমাজতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে লেখা। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী যিনি 'রাজাজী' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন তিনি তাঁর রচিত

মহাভারত, ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশনা, গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে মুখবন্ধে লিখেছেন মহাভারত আমাদের কাছে এক ঐশ্বর্য মন্ডিত সভ্যতাকে মেলে ধরে এবং একটি ঘটমান সমাজ ব্যবস্থার কথা বলে যদি তা হয়ত এক প্রাচীনতর পৃথিবীর। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তার সাথে আমাদের আজকের ভারতবর্ষের মূল্য বোধ, আদর্শ ইত্যাদির মিল পাওয়া যায়। সেখানেও বর্ণ প্রথা ছিল কিন্তু আন্তঃবর্ণ বা অসবর্ণ বিবাহের কথাও অজানা ছিল না। মহাভারতের চরিত্রগুলি এবং সভ্যতা যেন সমগ্র বিশ্বের সভ্যতার ছাঁচে গড়া .....যদি কোন বিদেশী এই গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করেন হয়ত বা সেটি মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার তবু এটি পড়ার পর তার এমন অনুভূতি হবে যে তিনি একটি যথার্থ মূল্যবান এবং উন্নতমানের গ্রন্থ পাঠ করেছেন এমনকি তাঁর এমন আত্মবিশ্বাসও জন্মাতে পারে যে তিনি ভারতবর্ষের আত্মাকে ধরতে পেরেছেন, ভারত বর্ষের উচ্চ-নীচ ধনী- দরিদ্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষকে বুঝতে পেরেছেন।"

"The *Mahabharata* discloses a rich civilisation and a highly evolved society which, though of an older world, strangely resembles the India of our own time, with the same values and ideals..... The caste system prevailed, but intercaste marriages were unknown. Some of the greates warriors in the *Mahabharata* were brahmins..... The *Mahabharata* has moulded the character and civilisation of one of the most numerous of the world's people.... If a foreigner reads this book - translation and epitome though it is - and closes it with a feeling that he has read a good and elevating work, he may be confident that he has grasped the spirit of India and can understand her people - high and low, rich and poor."

ভারতবর্ষের জনগনের মধ্যে যে বিভিন্ন জাতির উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে তা এই দুটি মহাকাব্য পাঠ করলে জানা যায়। রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগে জাতিতত্ত্বগত সমস্ত উপাদানের এক মহান সংশ্লেষ ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ যিনি মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাঁর পিতা বাসুদেব ছিল শূরের পুত্র। এই শূর আবার এক নাগা রমণীর সন্তান। পান্ডব জননী কুন্তীও ছিল একজন শূরের কন্যা। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ছিলেন এক আর্য ঋষির পুত্র। পরাশর ছিলেন একজন মৎস্যজীবি রমণীর সন্তান। এই রমণী পরে আর্য সম্রাট শান্তনুর সম্রাজ্ঞী হন। ইনিই পান্ডব এবং কৌরবদের প্রপিতামহী। ভীম বিবাহ করেছিলেন হিড়িম্বাকে যিনি ছিলেন একজন নিষাদ রমণী। এই মহাকাব্যে এমন অনেক ঐতিহাসিক রাজবংশের কথা বর্ণনা করা আছে যারা অনার্য ছিল। জরাসন্ধ এবং শল্য ছিলেন অনার্য। পুরাকালে যাদের ঋষি বলা হত তাঁরাই ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং ভারতবর্ষে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য তাঁরাই সৃষ্টির করেন।

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের আশেপাশের সময়ে যেখানে রামায়ণে পরশুরামের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এবং প্রায় এই সময়ে যখন মগধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়টি অর্থাৎ উত্তর বৈদিক যুগ প্রচুর সামাজিক সংশ্লেষের সাক্ষী।

৩.৩.৮ সামাজিক, জৈবনিক নিয়ম ঃ বৈদিক প্রতীকতা (Social Organic System : The Vedic Symbolism)

সামাজিক স্তর বিন্যাস একটি বিশ্বজনীন ঘটনা। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজে এর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে এই স্তর বিন্যাসের প্রকৃতি কেমন ছিল? এই প্রথা কিসের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল? শ্রী

অরবিন্দ তাঁর রচিত মানব চক্রে বলেছেন বৈদিক প্রতিষ্ঠানের চতুঃবর্ণকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় চারটি বর্ণ প্রথাকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে জাতি চিরায়ত আর বর্ণ হল একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতীক। আমাদের শেখান হয়েছে যে সমাজে চারটি বর্ণের উদ্ভব আসলে অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে যেটি রাজনৈতিক কারণে আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। একথা হয়ত সত্যি, কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সেই সময়কার মানুষ এটিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। আমরা কিছুক্ষণের জন্য যখন কোন সামাজিক ঘটনার পিছনে বাস্তবিক ও বস্তুনির্ভর কারণ খুঁজে পাই তখন সেইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি এর চেয়ে বেশী আর কিছু ভাবি না। বড়জোর বস্তুকেন্দ্রীক বিষয়গুলিকে বেশী করে না দেখে বরং প্রথমেই এর প্রতীকতা ধর্মীয় মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যকে দেখা উচিত। বেদ'এ পুরুষসুক্তকে এ কথা বলা আছে যেখানে চারটি ক্রম এক সৃষ্টিশীল দেবত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে চারটি ক্রম বা বর্ণের কোনটি যেন সেই দৈব শরীরের মাথা থেকে, কোনটি বাহু থেকে, কোনটি জঙ্ঘা থেকে এবং কোনটি পা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের কাছে এটি যে এক কাব্যিক রূপ/ধারণা যার থেকে মনে হয় যে ব্রাহ্মনরা জ্ঞানের অধিকারী, ক্ষত্রিয়রা ক্ষমতার অধিকারী, বৈশ্যরা উৎপাদনের অধিকারী এবং শূদ্ররা ভৃত্য কর্মের অধিকারী। আমরা এই থেকে অময়দের পূর্বপুরুষদের মানসিকতাকে আন্দাজ করতে পারি এবং বুঝতে পারি যে তাঁরা একধরনের কল্পানাশ্রয়ী বর্বরতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

আমাদের কাছে কাব্য হল বুদ্ধিমত্তা এবং শৌখিনতার সংমিশ্রণে কল্পনা শক্তির বহিঃপ্রকাশ যা আমাদের মনোরঞ্জন এবং আনন্দ দান করে।

কিন্তু প্রাচীন কালের মানুষের কাছে একজন কবি হলেন এমন একজন দর্শক যিনি লুকানো সত্যকে দেখতে পান, কোন কল্পনার জাল তিনি বোনেন না বরং দুঃসহ্যের রূপকে তিনি সামনে নিয়ে আসেন। সমস্ত অন্তর্লীন সত্যকে তুলে ধরেন, বৈদিক ধারায় কোন প্রতীক শব্দ বা স্মিত মুখ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয় এবং আশা করা হয় যে এই প্রতীক বা চিহ্নগুলি বাস্তবকে তুলে ধরে, কোন কল্পনা বিলাস আনন্দের ভাবনাকে নয়। কবির মত দর্শনকারী একজনের প্রতীক ব্যবহার করা হত এই জন্য যে তিনি সেই অর্থে বুদ্ধিজীবি মনের ওপর অনেক বেশী করে রেখাপাত করতে পারবেন। একটি বুদ্ধিজীবি মনকে অনেক বেশী আলোকিত করবেন। সেই কালের মানুষের কাছে এই ধরনের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব তার ভাবমূর্তির চেয়ে আরো অনেক বেশী কিছু ছিল। এরা পবিত্র সত্যকে প্রকাশ করত। মহাজাগতিক পুরুষ যে কিনা নিজেকে মহাবিশ্বে বস্তু এবং শরীরের বাইরেও বার বার প্রমাণ করছে তাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করার জন্য তখনকার দিনের এই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বরা বিভিন্ন প্রতীক প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে মানব সমাজকে বেছে নিয়েছিলেন। মানবজাতি এবং মহাবিশ্ব উভয়েরই প্রতীক এবং প্রকাশভঙ্গি এক তা হল অন্তর্লীন সত্য।"

"এই ধরনের প্রতিকীবাদ থেকে সমাজের সবকিছুকে একটি ধর্মীয় অলঙ্ঘনীয় ধর্মাশ্রিত রূপে দেখার একধরনের মনোভাব তৈরী হয় যদিও এর মধ্যেও একটি তেজস্বী মুক্তিকামী রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

সারণী ঃ সামাজিক জৈবনিক নিয়ম ঃ বৈদিক প্রতিকীতা

ক্রম	সৃষ্টি সংক্রান্ত নীতি	মানুষের মধ্যে দিয়ে ভাবের বিস্তার	দেবত্ব এবং দিব্য পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	চতুর্বর্ণ পবিত্র পুরুষের সামাজিক বহিঃপ্রকাশ	পুরুষার্থ
১	যে জ্ঞান বস্তুর ক্রম এবং নীতিকে ঠিক করে দেয়	দিব্যজ্ঞান	মস্তিষ্ক	জ্ঞানের অধিকারী মানুষ (ব্রাহ্মন)	ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ

এম	সৃষ্টি সংক্রান্ত নীতি	মানুষের মধ্যে দিয়ে ভাবের বিস্তার	দেবত্ব এবং দিব্য পুরুষের অঙ্গ প্রতঙ্গ	চতুবর্ণ পবিত্র পুরুষের সামাজিক বহিঃপ্রকাশ	পুরুষার্থ
২	সেই শক্তি যেটি একে অনুমোদন করে, তুলে ধরে আরো শক্তিশালী করে।	দিব্য শক্তি	হস্ত/বাহু	শক্তির অধিকারী মানুষ (ক্ষত্রিয়)	ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ
৩	সেই ঐকতান যা একের সঙ্গে অপরের সংযুক্তি ঘটায়	দিব্য ভাব যা উৎপাদন, প্রফুল্লতা এবং সহমতের মধ্যে বিরাজ করে	উরু/জঙ্ঘা	সমাজের উৎপাদক এবং সহায়ক শ্রেণী মানুষ (বৈশ্য)	ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ
৪	নির্দেশ মত কার্য সম্পাদন	দিব্য ভাব যা কর্মে বাধ্যতায় এবং পরিসেবার মধ্যে বিরাজ করে।	পদ	পরিসেবা প্রদানকারী মানুষ শ্রমিক শ্রেণী (শূদ্র)	ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ

৩.৩.৯ ভারতীয় সংস্কৃতির গঠনশীল রূপদায়ক উপাদান (Formative and Vitalising Elements of Indian Culture)

ভারতীয় সংস্কৃতির গঠনশীল অপরিহার্য উপাদানগুলি বৈদিক সংস্কৃতির থেকে লব্ধ। এই সংস্কৃতির মূল হল কূল অর্থাৎ পরিবার, জন অর্থাৎ জাতি পাঞ্চজনা অর্থাৎ জাতিগত সংসদ কুল এর অলঙ্ঘতা বা অদ্রবনীয়তা বা অভঙ্গুরতা কিছু কিছু মৌলিক মূল্য বোধের দ্বারা সংরক্ষিত হয় যেমন পিতৃযজ্ঞ, তর্পন এবং শ্রাদ্ধ, এর মাধ্যমে পূর্বপুরুষ, পিতা, মাতা, এবং পুত্রকন্যা একই আত্মায় সম্পর্কযুক্ত তারা একই পরম্পরা এবং ঐশ্বর্যের অধিকারী। কূল কিছু নিয়ম এবং পরম্পরার প্রবর্তন করে। একবারে শৈশব হতে পরিবারের সদস্যদের এমন কিছু অনুশীলনের মাধ্যমে পরিচালিত করে যাতে তারা সম্ঘবদ্ধ ভাবে কোন কাজ করতে উৎসাহিত হয় ভালবাসতে শেখে আত্মত্যাগে উৎসাহিত হয় এবং সর্বোপরি পিতৃ পুরুষের প্রতি গর্বিত বোধ করে। এইভাবে কূল একটি চিরকালীন স্থায়িত্ব, বহমানতা এবং অপরিহার্যতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। কূল আবার গোত্রের অঙ্গীভূত, গোত্র যা আবার উদ্ভূত হয়েছে কোন একজন ঋষির থেকে। বিবাহ বন্ধন আসলে দুটি ব্যক্তিত্বের একীকরণ। পারিবারিক নিয়ম মূল্যবোধ গুণাবলী ইত্যাদিকে অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে রক্ষা করা হয় যাতে দেব দেবী পূর্বপুরুষ বা ঋষিগণ পুনরায় একটি পুত্র বা কন্যার আর্বিভাব / আগমনে অনেক প্রত্যাশা এবং আনন্দ বয়ে আনে।

পরবর্তী সমাজে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হল "যজ্ঞ" হ'ল সঙ্কল্পিত কর্ম যা পবিত্রতার প্রতি উৎসর্গীকৃত। সন্ন্যাসীরা বলেন, যজ্ঞ যজ্ঞেন কল্পতম' আচার আচরণ (যজ্ঞ) তখনই সাফল্য লাভ করে যখন এটি বলিদান বা নিবেদনের

মন নিয়ে করা হয়। এই নিবেদনকে বলে 'তপ'। যজ্ঞের কঠোর পালনের মধ্যে দিয়ে যে শক্তি বিস্তার লাভ করে তাকে "ঋত" বলে যা কোন মনস্কামনা বলিদান বা নিবেদনের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টিতত্ত্বের সত্তা যা নাকি সমস্ত বিশ্ব জুড়ে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে একা অলৌকিক অতিপ্রকৃত দিক নির্দেশের দ্বারা আত্ম নিবেদনের মাধ্যমে তাকেও উপলব্ধি করা যায়। যজ্ঞ পৃথিবীর মানুষ এবং স্বর্গের ঈশ্বরকে অনেক কাছাকাছি এনেছে এবং আরো ঘনিষ্ঠভাবে উভয়কে যুক্ত করেছে এটি মানুষের মধ্যে আত্মোৎসর্গ, নিবেদনের বীজ বপন করেছে এবং মানুষকে সত্যের জন্য ও একে অপরের সাথে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্য শিক্ষা দিয়েছে।

ঋত : সৃষ্টি তত্ত্বের চিরন্তণ নিয়মকে পরিব্যপ্ত করে এবং তাকে তুলে ধরে। এটি হল সমস্ত রকম প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। যা ঋত নয় তা অসত্য। ঋতকে সুষ্ঠু চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে নিয়মে পরিণত করা হয়েছে। ঋত, ভাবনা, শ্লোক এবং কর্মপন্থার মাধ্যমে সত্যে পরিণত হয়। ঋত এবং সত্য তপ থেকে উদ্ভূত হয়।

তপ : মন, বাকশক্তি, এবং দেহ এর পবিত্রতায় উন্নীত হওয়ার জন্য যে স্বীয় নিয়ম পালন করা হয় তা হ'ল তপ। এটি দম্ভ, উদগ্র বাসনা ইত্যাদিকে প্রশমিত করে এবং এমন এক শক্তির মুক্তিঘটায় যা মানুষের অন্যান্য উগ্র স্বভাব যেগুলি সমাজ এবং পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলিকে প্রশমিত করে। তপ হ'ল যোগশক্তি -- একটি সচেতনতার শক্তি যাকে চিদশক্তি বলা যায়।

পৃথিবী উন্নীত হয়েছে ঋত, সত্য, তপ, এবং যজ্ঞ এর মাধ্যমে এবং এদেরকে পুষ্ট করেছে **ধর্ম**

ধর্ম : ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় জীবনের ভিত্তিই হ'ল ধর্ম, আধ্যার পরেই এর স্থান। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে ধর্ম তবে কী? যতাভ্যুদায়ানিশ্রি যশ সিদ্ধি স্ব ধর্ম: অর্থাৎ যা মনুষ্য সত্তকে সর্বোত্তম পরিতৃপ্তি বা প্রাপ্তি লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করে তাই ধর্ম। ধারনাতধর্মমিত্যাহ ধর্ম ধারয়িত প্রজাঃ অর্থাৎ শাশ্বত, স্থিতিশীল নীতির থেকেই ধর্মের উৎপত্তি এটি পরস্পকে কাছে আনে এবং পরস্পরকে ধরে রেখে সমাজ গঠন করে। ধর্মের বিস্তর অর্থ আছে : জীবনের অভিষ্টকে উপলব্ধি করতে এবং বিশ্বজগতে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে একজন ব্যক্তিকে সক্ষম এবং অনুপ্রাণিত করে ; আবার এটি সেই শক্তি যা পরস্পরকে একত্রিত করে আবদ্ধ করে সমাজের সৃষ্টি করে। মনুস্মৃতি বলছে "বেদকে জানার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সচেতনতার আবেগ, সাধু সন্ন্যাসীদের প্রবর্তিত নিয়ম এবং আত্ম-পরিতৃপ্তি, হ'ল ধর্মের মূল। বেদ, স্মৃতি, সু-কৃতি এবং আত্মতৃপ্তি বৃশত এই চারটি হল ধর্মের চিহ্ন। সদাচারি থেকে ধর্মের উৎপত্তি। সংব্যবহার থেকে সুকৃতি। এর উৎস ভারতবর্ষ। এটি সরস্বতী এবং দৃশাদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্ত নামের যে পবিত্র অঞ্চলটি ছিল সেই অঞ্চলের সব বর্ণের মানুষ এই সংবাবহার বা শুদ্ধাচার পালন করত এবং পরম্পরাগত ভাবে এই ঐতিহ্য চলে আসছে। সারা বিশ্বের মানুষ ভারতবর্ষের কাছ থেকে শুদ্ধচারের শিক্ষা গ্রহন করতে পারে।

ধর্মের মধ্যে সমস্ত নৈতিক ধারণা একত্রিভূত। শ্রী অরবিন্দের ভাষায় এমন কোন নৈতিক ধারণা নেই যার ওপর এটি জোর দেয় না ধর্ম সব কিছুর ওপর তার আদর্শ রূপটি প্রকাশ করে তার এই প্রকাশ করার জন্য সে শিক্ষা উপকথা, শৈল্পিক সৃষ্টি এবং নানবিধ রূপক উদাহরণ প্রভৃতির আশ্রয় নেয়। কিছু কিছু ভিত্তিমূলক উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয় ধারণা আছে যেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলা যায়না। কারণ সেগুলি আমাদের সত্তার এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ নীতির অঙ্গ; আমাদের স্বধর্ম... মনুষ্য জীবনের প্রকৃত ক্রম বিনাসে যা যুগ যুগ ধরে মহাবিশ্বকে রক্ষা করে চলেছে। প্রাচীন ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি যদি নিষ্ঠাভরে তার স্বধর্ম পালন করে এবং তার স্ব গোষ্ঠীর প্রকৃত নিয়ম ও নীতি পালন করে তবে সমবেত জীবন ও সেই ভাবেই চলতে থাকে। পরিবার, গোষ্ঠী, বর্ণ, শ্রেণী, সমাজ, ধর্মীয় গোষ্ঠী, শিল্প গোষ্ঠী বা অন্য সম্প্রদায় রাষ্ট্র জনগন এরা সকলেই

জৈবনিক সত্তা যারা নিজের নিজের ধর্ম পালন করে চলে এবং এই পালন কিছু নিয়ম দাবী করে যা অনুসরণ করার ফলে সুস্থ ভাবে ধর্ম সংরক্ষিত হয় আবার অবস্থানের ধর্ম বলেও এক ধরনের ব্যাপার আছে এটি হ'ল একের সঙ্গে অপরের সম্পর্কের অবস্থান নির্ভর। একথা সত্যি যে কিছু বিশেষ অবস্থা নিজেকে ধর্মের ওপর আরোপ করে, পরিবেশ সমকাল এদেরও ধর্মের ওপর যথেষ্ট প্রভাব আছে যাকে বলা হয় "যুগধর্ম" যা চিরাচরিত ধর্ম এবং এরা সকলেই স্বাভাবিক ধর্মের ওপর ক্রিয়াশীল - ক্রিয়া যা স্বভাব দ্বারা পরিচালিত এবং স্বভাব যা নিয়মের শারীরিক রূপ। প্রাচীন তত্ত্বে বলা হত যে একজন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর এবং সুস্থ অবস্থার মানুষ, কোন ব্যক্তিত্ব বা সামগ্রীক সুন্দর অবস্থা প্রবাদ প্রতিম স্বর্ণ যুগকে সূচিত করে। সেটি ছিল সত্য যুগ সে সময় কোন রাজনৈতিক সরকার বা রাষ্ট্রের বা কৃত্রিম সমাজের প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন সকলেই স্বাধীনভাবে সত্য নির্ভর আলোকিত সত্তা নিয়ে ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাণী হিসেবে বসবাস করত এবং এক স্বতস্ফূর্ত অন্তরের দিব্য ধর্ম আশ্রয় করে বেঁচে থাকত। স্ব-নির্ধারিত ব্যক্তি, স্বনির্ধারিত সম্প্রদায় যারা নিজেরা এবং অন্য সত্তাকে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার দিয়েছিল, ফলে এটিই ছিল আদর্শ বাঁচার উপায়। কিন্তু আজ আমরা দেখছি যে মানবতার প্রকৃত অবস্থা কেমন, এর বিকার প্রস্তুতা এবং সত্য সামাজিক ধর্ম থেকে বিচ্যুতি। তাই আজ এমন এক রাজ শক্তির প্রয়োজন হয়েছে যে অন্যায় ভাবে মানুষের ওপর কোন কিছু যেমন চাপিয়ে দেবে না তেমনি সে লক্ষ্য রাখবে যাতে সত্য নির্ভর মনুষ্য ধর্মপালিত হচ্ছে কিনা এবং যেখানে এগুলি লঙ্ঘন করতে ধর্ম রক্ষার স্বার্থে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা।

৩.৩.১০ শ্রী অরবিন্দের ভাষায় ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি [Cultural Foundation of Indian Society (Varnasharama Dharma) in the Words of Sri Aurobindo]

খুবই প্রাথমিক অবস্থা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি দু ধরনের ধারণা নিয়ে নিজেকে পরিচালিত করে এসেছে। যার ছাপ পড়েছে ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ ব্যবস্থায়। এগুলি হ'ল চার প্রকার বর্ণ এবং চতুরাশ্রম -- যা আসলে সমাজ চার ধরনের শ্রেণী এবং মানুষের জীবন বিন্যাসের চারটি ক্রমপর্যায় বা চারটি স্তর।

প্রাচীন চতুঃবর্ণকে কখনই তার পরবর্তীকালের এর বহু বিভক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত এবং অর্থহীন জাতি ব্যবস্থা দিয়ে বিচার করলে চলবে না। এটি কিন্তু অন্যান্য সভ্যতায় যে চারধরনের শ্রেণী বিভাগ আছে যেমন পুরোহিত, শিক্ষিত, ব্যবসায়ী, এবং শ্রমিক এই ধরনের সহজ সরল শ্রেণী বিন্যাসের মত নয়। এটির শুরুটা হয়ত বাহ্যিক ভাবে অনেকটা এক রকম কিন্তু এর তাৎপর্য একেবারে ভিন্ন। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ধারণা ছিল যে মানুষ তার প্রকৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ফলে চারটি ধরনের মধ্যে কোন একটির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। প্রথম এবং সর্বোচ্চ স্তরে হচ্ছেন শিক্ষিত জনেরা তারপর ক্ষমতাশালী ক্রিয়াশীল মানুষ, শাসক, যোদ্ধা, প্রশাসক। তৃতীয়স্তরে যারা উৎপাদক, বৈশ্য শ্রেণী। এঁদের ধরা হত দ্বিজ যাঁরা প্রাথমিক ভাবে ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সর্বশেষে এল সবচেয়ে অনুন্নত এক মানব শ্রেণী যাদের কোন ভাবেই উপরোক্ত শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করা যায়না। এদের না ছিল বুদ্ধিমত্তা, না ছিল শক্তি না ছিল সৃষ্টিশীলতা বা উৎকর্ষতার সঙ্গে কোন কিছু উৎপাদনের ক্ষমতা। এরা একমাত্র অদক্ষ শ্রমিক এবং খিদমদগার হিসেবে গণ্য হত। শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী এরা ছিল শূদ্র শ্রেণীর। সমাজের ক্রমবিন্যাস এই চারধরনের শ্রেণীকে ভিত্তি করে করা হত। ব্রাহ্মনরা সমাজে পৌরহিত্য করতেন তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত বিদ্বান ধর্মীয় নেতা এবং সমাজের পথ প্রদর্শক। ক্ষত্রিয় শ্রেণী সমাজে দিয়েছিল রাজা, যোদ্ধা, প্রশাসক ইত্যাদি। সমাজে বৈশ্যদের অবদান কৃষিজীবি ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকের। আর সবশেষে শূদ্ররা ছিল সমাজের দাস এবং খিদমদকার। যতদিন

এই ব্যবস্থা চলেছিল ততদিন কোন অসুবিধা ছিল না বরং ধর্মকে ভাবনা এবং শিক্ষাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছিল। এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতা এটি সামন্তরাল ভাবে চলে আসছিল। ভারতীয় ধারণায় মানুষের অবস্থান তার জন্ম সূত্রে নির্ধারিত হত না বরং তার ক্ষমতা এবং অন্তর্লীন স্বভাব, প্রভৃতি দ্বারা নির্ধারিত হত। সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং সুরক্ষার জন্য সেই যুগে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী রূপ নিয়েছিল এটির এতটাই স্থিতিশীল যে অন্য কোন সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা চলে না। ভারতীয় মনীষীরা যেভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন তাতে করে এটি সাধারণ বহির্জগতের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিকাঠামোগত যে সমবেত জীবনের পরিসেবায় লাগে তার চেয়েও আরো বেশী কিছু ছিল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে কিন্তু ভারতবর্ষের চারটি বর্ণ প্রথার প্রকৃত মত দাঁড়িয়ে ছিল না। এটির অকৃত্রিম এবং চিরস্থায়ী মূল্য নির্ভর করত এর আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ বিষয় বস্তুর ওপর যা চিন্তাবিধ এবং সমাজ সংগঠকগণ বিভিন্ন রূপে পরিবেশন করে গেছেন। এই যে অন্তরের বোধ এটির শুরু হত এই ভাবে যে একটি জাতির মূল প্রয়োজন হল ব্যক্তি সত্তার আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত উন্নতি লাভই হচ্ছে আসল। আর এই উন্নতির ক্ষেত্রে সমাজ হচ্ছে একমাত্র প্রয়োজনীয় কাঠামো। এটি সম্পর্কের বিষয় যার জন্য বিশেষ মাধ্যম, ক্ষেত্র এবং অবস্থার প্রয়োজন এবং একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে এমন এক যোগসূত্র বা বোঝাপড়ার প্রয়োজন। এর জন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সুরক্ষিত জায়গার প্রয়োজন যেখানে দাঁড়িয়ে একজন ব্যক্তি এই সম্পর্ককে বজায় রাখতে পারবে এবং সমাজের প্রতি যথাযোগ্য সাহায্য এবং কর্তব্য বজায় রাখতে পারবে এবং সাম্প্রদায়িক জীবনের উৎকৃষ্টতম সাহায্যের মাধ্যমে আত্মোন্নতির পথে এগোতে পারবে। জন্ম বিষয়টিকে স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রথম নির্ণায়ক হিসাবে ধরা হয়। ভারতীয় মানসিকতার বংশগতিকে বরাবর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে এটিকে প্রকৃতির একটি চিহ্ন এবং পারিপার্শ্বিক এবং পরিবেশের একটি সূচি হিসেবে দেখা হয়েছে যা ব্যক্তি মানুষ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিজেই তৈরী করে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে জন্ম কোন মতেই বর্ণের একমাত্র নির্ণায়ক হতে পারে না। একজন মানুষের বুদ্ধিমত্তা তার মানসিকতা, তার নৈতিক চরিত্র এবং তার আধ্যাত্মিক উচ্চতা বা সামগ্রীকতা এই গুলি হ'ল অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব তখন, পরিবার প্রথার প্রচলন হয়, ব্যক্তিগত পরিলক্ষ্য, স্ব-প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি ছিল এর অত্যাবশ্যক অঙ্গ। প্রতিটি ব্যক্তি তার জীবনে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট যত্নসহকারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হত তার স্বভাব, উত্তরণ এবং সম্মান বোধকে গড়ে তোলার মাধ্যমে। তাকে যে কাজ করতে হবে তার জন্য বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তাকে যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা হত। এই পথে সবচেয়ে ভালভাবে সাফল্য পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা হল অর্থ তা সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়েই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনর জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। আত্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে আত্ম-তৃপ্তি লাভের জন্য প্রত্যেকে নিখুঁত ভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করত। বিশেষ ক্রিয়াকর্ম এবং প্রশিক্ষণের বাইরেও সাধারণভাবে বিজ্ঞান, শিল্প কলা জীবনের সুন্দর দিকগুলির সমন্বেও অবহিত করা হত যেগুলি মানুষের প্রকৃতিগত নান্দনিক এবং বুদ্ধিজীবি বোধকেও পরিতৃপ্ত করত। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের চিন্তা, সুখ বোধ ইত্যাদি প্রতিটি সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে দেখা যেত।

এত স্বচ্ছতা এত স্বাধীনতা এবং এত কিছুর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য সংস্কৃতির মত ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা কিন্তু এখানে থেমে থাকেনি। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জানায় যে অত্যন্ত প্রয়োজনের কথা মনে রেখে

এ হ'ল একটি উপগঠন মাত্র তাই বলে এটি কখনই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সর্বশেষ বিধি নয়। আপনি যখন সমাজের প্রতি আপনার ঋণ পরিশোধ করছেন, সমাজ জীবনে নিজেকে যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষার সাহায্য করছে এবং এ সবই তোমার ন্যায্য অধিকার সম্পাদন করার মাধ্যমে কাঙ্খিত পরিতৃপ্তি অর্জন করছেন বলে মনে করছেন তার পরেও আরো মহত্তর কাজগুলি পড়ে থাকছে। এরপরেও আপনার নিজস্ব সত্তা থাকছে আপনার অন্তরের আত্মা, আপনার ভেতরকার আপনি সেই আধ্যাত্মিক অংশ যা অনন্তের একাংশ, চিরন্তনের নির্যাস। আপনাকে এই স্ব-অস্তিত্ব এই অন্তরের আত্মাকে খুঁজতে হবে। আমিও সেই জায়গা থেকে এসেছি জীবনের এই বোধ থেকেই শুরু হবে আপনার নিজেকে খোঁজার পালা। প্রতিটি বর্ণের জন্য যিনি সর্বশক্তিমান তিনি মানব জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ পথ তাই বেছে রেখেছেন। নিজের জীবন এবং প্রকৃতিকে যদি সেই পথে পরিচালিত করতে পারা যায় নিখুতভাবে সেই দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায় তবে আপনি যে শুধুই আদর্শভাবে বেড়ে উঠবেন এবং প্রকৃতির ঐকতানের মধ্যে প্রবেশ করবেন তা নয় আপনি দিব্য জীবনের আরো কাছাকাছি চলে আসবেন। এটিই আপনার জীবনের আসল উদ্দেশ্য। এর থেকেই যে জ্ঞানের উৎপত্তি তা আপনাকে এক আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে নিয়ে যাবে একেই বলে "মোক্ষ"। মোক্ষ লাভ হলে তবেই একজন সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতার উপরে উঠতে পারে আর সেটা একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়েই সম্ভব। এবং এ সমস্তকে ছাড়িয়ে আপনার নিজের মধ্যে যে চিরন্তন পরিপূর্ণতা আছে যে মুক্তি যে মহত্ব এবং অমর আত্মার পরম সুখ তাকে উপলব্ধি করতে পারবে; মানুষে স্ব-প্রকৃতি এসবকে আড়াল দিয়ে রাখে। আর জানবেন যখন আপনি এগুলি করতে পারবেন তখনই আপনি মুক্ত। তখনই আপনি সমস্ত ধর্মের উর্ধে, আপনি তখন বিশাত্মা, সমস্ত সত্তা নিয়ে এক এবং অদ্বৈত, হয় আপনি তখন দিব্য স্বাধীনতা নিয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারবে অথবা নিজের মধ্যে এক অপার্থিব অনন্ত পরমসুখ লাভ করতে পারবেন। চারটি বর্ণের ওপর ভিত্তি করে যে সমাজ ব্যবস্থা তার অর্থ ছিল একটি ঐকতানের মধ্যে দিয়ে আত্মা মন এবং জীবনের অগ্রগতি। মানুষের জীবনের প্রকৃত পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত আত্মার অমরত্বের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে, পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তির পর এক অনন্ত চিরন্তন অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশের অনুভূতির মাধ্যমে।

ভারতীয় ব্যবস্থা এই ধরনের আত্ম উন্নতির কঠিন বিষয়টিকে পুরোপুরি ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়নি। বরং এর জন্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটি পরিকাঠামো একটি মান একটি শ্রেণীবিন্যাস প্রভৃতি ব্যবস্থার আয়োজন করে রেখেছে যাতে তার জীবন উর্ধারোহণের একটি সিঁড়ি হিসেবে গণ্য হতে পারে। চতুরাশ্রমের এটিই হল সবচেয়ে সহজ এবং সর্বোত্তম উদ্দেশ্য।

জীবন চারটি স্বাভাবিক পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এর এক একটি অধ্যায় জীবনের সাংস্কৃতিক ধারণা এবং কর্মকান্ডের দ্বারা নামাঙ্কিত ছিল। এই চারটি পর্যায় হল ছাত্রাবস্থা, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস বা পরিব্রাজক। একজন মানুষের জীবন সমন্ধে যা জ্ঞান আহরণ করা উচিত ছাত্রাবস্থার পর্যায়টি সেইভাবে গঠিত হত। বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্নধারায় শিক্ষা দান করা হত ঠিকই কিন্তু বৈদিক নিয়মে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাচীন কালে যা ছিল শিক্ষা এবং নীতির অপরিহার্য অঙ্গ তার ওপরও বেশী করে জোর দেওয়া হত। প্রাচীনকালে এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত শহর থেকে বহু দূরে একটি মনোময় পরিবেশে। শিক্ষকগণ নিজেরা খুব স্বাভাবিক ভাবে এমন একটি জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে নিজেদের নিয়ে যেতেন এদের মধ্যে কেউ কেউ উল্লেখযোগ্য ভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধি কেন্দ্রিক বা বুদ্ধিনির্ভর

হয়ে পড়ছিল। এই সময় থেকে শহর এবং বিশ্ববিদ্যালয়মুখী শিক্ষাদানের সূচনা হয় কিন্তু অন্তরাত্মার চারিত্রিক গঠন ও প্রস্তুতির জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তার মাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। তার পরিবর্তে শিক্ষা অনেক বেশী করে নির্দেশ ভিত্তিক ও বুদ্ধি মত্তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। কিন্তু শুরুতে আর্যরা প্রকৃত অর্থে জীবনের চারটি মূল উদ্দেশ্য অর্থ, কাম, ধর্ম, মোক্ষ ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে সাজিয়ে ছিল। এই জ্ঞান নিয়ে গার্হস্থ জীবনে প্রবেশের পর একজন গৃহী মানব জীবনের তিনটি উদ্দেশ্যকে সাধিত করতে সমর্থ হত। সে তার স্বাভাবিক সত্তা এবং স্বীয় স্বার্থ এবং জীবন থেকে আনন্দ আহরণ করতে পারত। জীবনের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের কাছে তার যা ঋণ এবং সমাজের কাছে তার যা চাহিদা সে সব পরিপূরণ করত এবং এইভাবে সে নিজেকে অস্তিত্বের চরম শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করত। জীবনের তৃতীয় ভাগে এসে সে বানপ্রস্থ গ্রহণ করত এই সময় সে জনকোলাহল থেকে নিজকে সরিয়ে নিয়ে বনের মধ্যে বসে আত্মার সত্তা উপলব্ধিতে ব্রতী হত। এখানে সে তার সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনেক বেশী স্বাধীনভাবে বাস করত, কিন্তু সে যদি মনে করত যে তার অর্জিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান সে অপেক্ষাকৃত তরুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে তাহলে সে তরুণ প্রজন্মকে তার কাছে ডেকে নিতে পারত। জীবনের শেষ পর্যায়ে সে সকল সামাজিক বন্ধন ত্যাগ করে পার্থিব অস্তিত্ব থেকে এক চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়ে তার অন্তরাত্মাকে চিরন্তনের মধ্যে দিয়ে অনন্তের মাঝে বিলীন করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকত। তবে সকলের ক্ষেত্রেই জীবনের এই চারটি পর্যায় অতিক্রম করা হত না অনেকে বানপ্রস্থ অবস্থায় পরলোক গমন করতেন। কিন্তু এই চারটি পর্যায় মানবাত্মার জীবন চর্যার একটি নিখুত পরিকল্পনা হিসেবে গন্য হত।

এই ধরনের মহৎ ভিত্তি থাকার ফলে ভারতীয় সভ্যতা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী অনন্য সাধারণ এবং মৌলিকতায় পরিণত হয়ে এক অসাধারণ সভ্যতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছানো সত্ত্বেও কিন্তু জীবনের অন্যান্য পর্যায় বা স্তরগুলিকে কখনও অবহেলা করেনি। এটি শহর এবং গ্রাম দুটি জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেই থেকেছে, অরন্যের নিঃসঙ্গতা এবং মুক্তির পর অবশেষে মহাজগতের ইথার তরঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে। অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে এবং জীবনের মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়ে অনেক মহান আত্মার সন্ধান পেয়েছে এবং অমরত্বকে অনুভব করেছে। এটি বহিঃপ্রকৃতি বা বহিঃবিশ্বকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছে। এইটি জীবনকে ঐশ্বর্য মন্ডিত করে আত্মার উন্নতি ঘটিয়েছে। এই ভাবেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, ভারত জাতি নিজেদেরকে সংস্কৃতির এক অত্যাশ্চর্য্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছে। এটি অত্যন্ত সুগঠিত এবং মহান ভিত্তির ওপর অধিষ্ঠিত হয়ে যথেষ্ট শক্তি এবং স্বাধীনতার মধ্যে বেঁচে থেকেছে। ভারতীয় সভ্যতা মহান সাহিত্য উন্নত বিজ্ঞান এবং চারুকলা, শিল্পস্থাপনার জন্ম দিয়েছে। এটি উচ্চতম আদর্শের শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে এবং এখানে কখনও সত্যকার জ্ঞান সংস্কৃতির কোন অবমূল্যায়ন বা অপব্যবহার হয়নি। এখানে মানুষের প্রতি মানব প্রেম, সমবেদনা, দয়াপরবশত এবং সর্বোপরি সাম্যতা দারুনভাবে কাজ করেছে যা ছিল মহাজ্ঞানী দার্শনিকদের অনুপ্রেরণার ভিত্তি। এটি বহিঃবিশ্বের গুঢ়তাকে পরীক্ষা করেছে এবং অন্তরের অন্তস্থ সত্য এবং অলৌকিক ক্ষমতাকে আবিষ্কার করেছে। একথা সত্য যে এই সভ্যতা যতবেশী ঐশ্বর্যমন্ডিত এবং জটিল হয়েছে এটি তত বেশী করে এর প্রাথমিক পর্যায়ের সরলতাকে হারিয়েছে। বুদ্ধি মত্তা ক্রমশই আরো উঁচু এবং প্রসারিত হয়েছে কিন্তু অন্তরের স্বাভাবিক বোধশক্তি বা অতিন্দ্রিয় বোধ শক্তি শুধুমাত্র সাধু সন্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এই সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ত্রুটিহীনতা এবং ক্রমপর্যায় নির্ধারণের ওপর বেশী করে জোর দেওয়া হয়, এবং এগুলি শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনের কথা ভেবে নয় আত্মার উন্নতি কল্পেও এগুলির

প্রধানত এটি হয়েছে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় পারিবারিক নিয়ম কানুনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পারমার্জন করার স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে যাকে এক কথায় 'আচার' বলা হয়।

আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সভ্যতার রাজনৈতিক সামাজিক বিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সভ্যতা চারটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়েছে প্রথমটি অতি সরল আর্য সম্প্রদায়; এরপর একটি দীর্ঘকালীন পটপরিবর্তন যেখানে রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় জীবন নানা প্রকার পরীক্ষা নিরিক্ষা রাজনৈতিক গঠন এবং পরিকাঠামোর পরিবর্তন এবং সংশ্লেষের মধ্যে দিয়ে যায়, তৃতীয়ত রাজতন্ত্রের গঠন যারা সাম্প্রদায়িক জীবনের সমস্ত জটিল উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটিয়ে সাধারণ নাগরিক জীবনকে একটি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মধ্যে নিয়ে এসেছিল। চতুর্থ এবং সর্বশেষ যুগটি হ'ল অবনমনের যুগ যখন এক অভ্যন্তরীণ স্তবিরতা সমাজ জীবনকে ঘিরে ফেলে এবং পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে আনীত নূতন নুতন সংস্কৃতি, নিয়ম এবং প্রথাকে জাতীয় জীবনের ওপর চাপিয়ে দেয়। প্রথম তিনটি পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল মানব জীবনে লক্ষনীয় নানারকম ঘনসন্নিবদ্ধতা, স্থিতিশীলতা যা গোটা সামাজিক প্রথাকে এক রক্ষণশীলতায় আগলে রেখেছিল। এই ঘনসন্নিবদ্ধতা থাকার জন্য যখন অবক্ষয়ের শুরু হয় তখনও সবটুকু ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাওয়া বিরুদ্ধে এই ঘনসন্নিবদ্ধতা প্রতিরোধ করেছিল।

ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের যে নীতি তার গঠন, পরিবর্ধন, পুনর্নির্মাণ প্রভৃতিতে স্থায়ী ভাব কাজ করে এসেছে তা হ'ল একটি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সাম্প্রদায়িক জীবনের নীতি; এই দৃঢ়সংবদ্ধ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মানসিকতাকে ভিত্তি করে মতদানের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি তৈরী করা বা গণ সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রেই কাজ করেনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব এবং অস্তিত্ব আছে। একটি স্বাধীন সম্প্রদায় ক্রম হ'ল এর বৈশিষ্ট্য এবং যে মুক্তি এর লক্ষ্য তা কিন্তু ব্যক্তি জীবন বা ব্যক্তি বিশেষ মুক্তি নয় সমগ্র সম্প্রদায়ের মুক্তি। একেবারে প্রথমদিকে সমস্যাটা খুবই সাধারণ ছিল কারন তখন মাত্র দুই ধরনের সম্প্রদায়কে ধর্তব্যের মধ্য আনা হত, গ্রামীন সম্প্রদায় এবং ছোটখাট আঞ্চলিক উপজাতি সম্প্রদায়। স্বাধীন জীবনযাপনের ধারাকে ভিত্তি করে প্রথমটি এত সুন্দর যথাযোগ্য স্ব-নিয়ন্ত্রিত প্রথার মাধ্যমে এক গ্রামীন সম্প্রদায় রূপে পরিণতি লাভ করেছিল যে, এটি সময়ের নানা টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়েও আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল এবং এটি খুব ভালভাবেই চলেছিল, সাম্প্রতিক কালে বৃটিশ আমলা তন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণে অত্যন্ত নির্মমভাবে এটি তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। শ্রমের পরিষ্কার ভাবে কোন শ্রেণীবিন্যাস না থাকা সত্ত্বেও রাজার নেতৃত্বে গ্রাম মানুষ চাষাবাদ, ধর্মাচরণ, সমরশিক্ষা রাজনৈতিক দলগঠন এবং আরও নানারকম সভা, সমিতি গঠন করে সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল।

আর্য সমাজে সকল সদস্যদের প্রথামিক জীবন ছিল কৃষি ও গ্রাম ভিত্তিক। ক্ষত্রিয়রা বরাবরই সংখ্যায় অধিক ছিল। তারা বাণিজ্য, শিল্প স্থাপন এবং নানাবিধ চারুকলা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত ছিল কিছু সামান্য সংখ্যক জনসমষ্টি বিশেষ ধরনের কিছু পেশায় যেমন সামরিক বাহিনী, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্য ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ ছিল। গ্রামীন সম্প্রদায় চিরকাল একটি স্থিতিশীল সুসংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করত। এরা সমাজের অবিনশ্বর বলে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমশই শত শত গ্রাম নিয়ে কিছু কিছু মানব গোষ্ঠী তৈরী হয় যার কারো নেতৃত্বাধীন হয়ে জীবন যাপন করত। খুব স্বাভাবিক কারণেই এর ফলে কিছু প্রশাসনিক সংস্থা বা সংগঠনের প্রয়োজন হয়েছিল এবং গোষ্ঠী যত বড় হতে লাগল তখন ক্রমশ একটি রাজত্ব বা গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতে লাগল। এই রাষ্ট্রভিত্তিক বৃত্তটি যখন চক্রবৃদ্ধি হারে আরো বেড়ে যেতে লাগল তখন সৃষ্টি হল আরো বড় রাজত্বের এবং সম্রাটের উদয় হয়। ভারতীয় সামাজিক রাজনৈতিক গঠনের দুর্লভ পরীক্ষার সাফল্য লুকিয়ে আছে অত্যন্ত

সফলভাবে প্রয়োগ করা সাম্প্রদায়িক নীতি আত্ম-সঙ্কল্প ক্রমউন্নতি পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এসেছে।

এই ধরনের প্রয়োজন মেটাতে ভারতীয় মানসিকতা চিরকাল আবর্তিত হয়ে এসেছে। একটি স্থায়ী সামাজিক ধর্মীয় প্রথা যা চতুঃবর্ণের ওপর নির্ভরশীল। বাহ্যিক ভাবে মনে হতে পারে যে এই বর্ণপ্রথা তো যে কোন মনুষ্য সমাজে বিভিন্ন সময়ে স্বাভাবিক ভাবে পালিত হয়ে এসেছে, যেখানে পুরোহিত, সমর এবং রাজনীতিবিদ, অভিজাত এবং কারিগর /শিল্প গোষ্ঠী এবং স্বাধীন কৃষিজীবি, বণিক, এবং সর্বহারা শ্রমিক সকলেরই স্থান আছে।এই মিলটুকু শুধুমাত্র বহিরঙ্গের কিন্তু ভারতবর্ষের চতুঃবর্ণ প্রথার অন্তঃসারটি সম্পূর্ণরূপে আলাদা।

বৈদিক পরবর্তী যুগে এই চতুঃবর্ণ প্রথা সমাজে পুরোপুরি ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এই কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক অবস্থান বজায় রেখে স্বীয় মৌলিক ক্রিয়াকর্ম করতে থাকে। কেউ কারো কাজকর্মের বা অবস্থানের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করত না। একটি অতি প্রাচীন প্রথাকে বোঝার জন্য এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরী কিন্তু কিছু ভুল বোঝাবুঝির থেকে উদ্ভূত কিছু ভ্রান্ত ধারণা কিংবা পরবর্তী বিষয়ের অতিরঞ্জন এইগুলির থেকে এই বর্ণপ্রথার আসল অর্থটি বিলুপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে এটি অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

যাই হোক পরবর্তীকালে বেশ কিছু ধারাবাহিক ধর্মীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে পুরানো দিনের স্বাধীনতার মূল উপাদানগুলি রক্ষিত হয়। এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণের দরজা সকলের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, শুরুতে আমরা যেমন দেখেছি যে বৈদিক এবং বৈদান্তিক ঋষিগণ যে কোন শ্রেণীর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম গ্রহণ করতেন। একই ভাবে পরবর্তী কালেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমাজ সম্প্রদায়ের সকল স্তর থেকে এমনকি যারা শূদ্রবর্ণ বা যারা জাতিচ্যুত তাদের মধ্যে থেকে যোগী পুরুষ সাধু-সন্ত, আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ, উদ্ভাবক, ধর্মগীতিকার এবং মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা উঠে এসেছেন।

চারটি বর্ণ বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রমানুসার গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটির সঙ্গেই কিন্তু একধরনের আধ্যাত্মিক জীবন, কার্যকারিতার একটি নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা, কিছুটা শিক্ষা, সামাজিক নীতি ও নৈতিক সম্মান এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উপযুক্ত কাজের স্থান ইত্যাদি যুক্ত থাকত। এই প্রথার মধ্যে আবার স্বাভাবিক নিয়মে আপনা থেকে কিছু কাজে/শ্রমের বিভাজন একটি স্থায়ী অর্থনৈতিক অবস্থা বংশ পরম্পরায় চলে আসা কিছু নীতি চলে আসছিল, যদিও এক্ষেত্রে অনুশীলনের চেয়ে তত্ত্ব ছিল আরো গাঢ়। কিন্তু কাউকেই তার নিজের প্রভাবে ধন সঞ্চয় করা বা সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে ওঠা, প্রশাসন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত না। যদিও শেষ পর্যন্ত সামাজিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ কখনই রাজনৈতিক ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে এক ছিল না। সাধারণত রাজনৈতিক বিষয়ে চার শ্রেণীর নাগরিকেরই সমানাধিকার ছিল। প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক ক্ষেত্রে তার নিজ নিজ স্থান এবং প্রভাবের অংশ লাভ করত। সমগ্র ভারতবর্ষের সামাজিক রূপটি গঠিত হয়েছিল সাধারণ মানব জীবনের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণের ফলে এই সাধারণ স্তরে মানুষেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহীয়ান, কর্তৃত্ববান ছিলেন। যেমন ধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুধ, রাজকার্য, ব্রাহ্মনগন।

আন্তরাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণ, অর্থনৈতিক এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে, কিন্তু তাই বলে কেউ ই এমন কি শূদ্রবর্ণের মানুষও সভ্য সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হত না এবং প্রতিটি বর্ণের মানুষেরই রাজনীতিতে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ, অভিমত প্রকাশ, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল। এর ফলস্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি গঠন করতে নামমাত্র সময় লেগেছিল বা বলা

যেতে পারে এর জন্য তেমন কোন সময়ই লাগেনি কিন্তু দুঃখের বিষয় এটি দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি, অন্যান্য দেশে যেমন মনুষ্য সমাজের শ্রেণী বিন্যাস ব্যবস্থা সেই দেশের রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী ছাপ ফেলেছিল, ভারতবর্ষে তেমনটি হয়নি। তিব্বতের মত যাজক কেন্দ্রিক দিব্যতন্ত্রের মাধ্যমে রাজ্য শাসন বা সামরিক আভিজাত্য নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফ্রান্স, ইলংন্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে যেভাবে শাসন ব্যবস্থা চলে এসেছে অথবা ভেনিসে যেমন স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যশাসন হয়ে এসেছে, এগুলি কোনটি ভারতীয় ব্যবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গির কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভারতবর্ষে দেখা গেছে যে সাধারণভাবে কিছু ক্ষত্রিয় পরিবারের প্রকট ভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষত সাধারণ বা কোন গোষ্ঠী যখন নিজেদের আরও বিস্তৃত করতে চেয়েছে এবং প্রকারান্তরে একটি রাজত্ব গঠন করতে চেয়েছে বা কোন নেতৃত্বে কোন জাতির ওপর কর্তৃত্ব করতে চেয়েছে তেমন কোন সময়ে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই ধরনের প্রবণতা যেন মহাভারত এর পরম্পরাগত কাহিনির মধ্যে সংরক্ষিত আছে আবার এই একই জিনিস আমরা মধ্যযুগের রাজপুতনায় আগেও দেখেছি। কিন্তু যাই হোক না কেন প্রাচীন ভারতবর্ষে এগুলি ছিল কিছু বিলীয়মান অধ্যায় এবং এই প্রকটতা কখনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাধীন সাধারণ মানুষ ও তাদের রাজনীতিতে এবং সমাজজীবনে প্রভাবকে বাদ দিয়ে হয়নি। মধ্যবর্তী সময়ের গনতান্ত্রিক রাজ্যগুলি যখন গঠিত হয়েছিল তখনও তারা সকল সম্ভাব্য অবস্থাতেই একটি রাজনীতি মেনে চলেছে যা হয়ত সেই প্রাচীন যুগের সাধারণ মানুষের রাজসভায় যোগদানের নীতিরই এক পরিপূর্ণ প্রচেষ্টার বাস্তব রূপ এবং এটি কখনও গ্রীস দেশের গনতন্ত্রের মতো নয় যেখানে কিছু স্বল্প সংখ্যক মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে একটি রাজ্য এবং তার সরকার গঠন করত এবং এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সমাজের উঁচুতলার মানুষ এবং সীমিত সংখ্যার সভাসদ পরবর্তীকালে যা পর্ষদ বা বিধানসভা গঠন করেছিল যেখানে চার বর্ণে শ্রেণীর মানুষ প্রতিনিধিত্ব করত; রাজ্যপর্ষদ ইত্যাদি গঠিত হয়েছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা থেকে যেটি উদ্ভূত হয় তা হল একটি মিশ্র রাজনৈতিক সত্ত্ব যেখানে কোন শ্রেণীর মানুষই অধিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারত না। সেইমত ভারতবর্ষের আমরা কিন্তু কোন সম্প্রদায়েই অভিজাত শ্রেণী এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে কোন সংগ্রাম হতে দেখিনি, স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা রাজ্য শাসন বা গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উভয়েই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে; গ্রীস, রোম, প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে যা বহুবার ঘটতে দেখা গেছে, বা পরবর্তী কালের ইউরোপে সর্বহারা মানুষের সংগঠন দেশ শাসন করছে এমনটি ভারতবর্ষে কিন্তু কখনও ঘটতে দেখা যায়নি।

রাজনৈতিক কাঠামোর শীর্ষ স্থানটি তিনটি পরিচালন সমিতির দ্বারা অধিকৃত ছিল রাজাকে নিয়ে তাঁর মন্ত্রিপরিষদ, পৌরসভা এবং রাজ্য বিধান সভা এই তিনটি নিয়ে রাজ্য। পরিষদ সদস্য এবং মন্ত্রিগণ জনসাধারণের মধ্যে থেকে নির্ধারিত হতেন। তবে পরিষদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকল বর্ণেরই নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু প্রতিনিধি থাকত।

ঠিক পরিস্কার করে বলা যায় না যে কবে থেকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্ব হারাতে লাগল, সে কী এদেশে মুসলমান বহিরাক্রমণের আগে নাকি বিদেশী অধিগ্রহণের ফলশ্রুতি রূপে। সে যাই হোক এক কথা বোঝা যায় যে মধ্য এশিয়া থেকে বহিরাক্রমণের ফলে এক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসকের অনুপ্রবেশের ফলে এদেশের পূর্বেকার শাসন ব্যাবস্থার কাঠামোটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এবং সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে এই ধ্বংস লীলা চলতে থাকে। দক্ষিণ ভারতে কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা আরও বহু শতাব্দী ধরে বজায় ছিল। যদিও

সেখানে যে জনসভাগুলি ছিল তাদের সাথে প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সাংবিধানিক মিল তেমন একটা ছিল না। বরং কিছু অন্য সংগঠনের সংবিধানের সাথে মিল ছিল। এই নিম্ন মানের সভাগুলি মূলত রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে এবং বজায় রেখে চলত এখানে প্রাতিষ্ঠানিক সর্বোচ্চতায় যে গোষ্ঠী বিরাজ করত তাকে বলে 'কূল' এবং রাজ্য কে বলত "গন"। এই অবস্থায় এরা খুব বেশী কার্যকরী কিছু করতে পারত না। তাদের কর্মক্ষেত্রের এবং অধিকার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। কূল বা পারিবারিক গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হারাবার পরও একটি সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপে টিকে ছিল। এটি বিশেষ ভাবে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেখা যেত এবং তার তাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতি গুলি সুরক্ষিত করে রেখেছিল যাকে বলা হত "কূলধর্ম" এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সভা যাকে বলা হত কূলসঙ্ঘ।

ভারতীয় সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী চিরস্থায়ী উপাদান যা চতুর্বর্ণ প্রথার মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং যেটির অবসান হওয়া সত্ত্বেও কিছু অনন্য সাধারণ শক্তি স্থায়িত্ব এবং প্রভাব রেখেছিল যা রীতিমত ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এখনও যখন জাতি প্রথা, বর্ণ বৈষম্য ইত্যাদি প্রায় আর নেই বললেই চলে তখনও এর প্রভাব একেবারে মুছে যায়নি। আর একটি শুরু হয়েছিল প্রথমিক চারটি বর্ণের মধ্যে থেকে উপবর্ণ গঠনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দের মধ্যে এই উপবর্ণ গঠন হয়েছিল মূলত ধর্মীয় সমাজধর্মীয় এবং অনুষ্ঠান কে ভিত্তি করে কিন্তু তদুপরি সেখানে প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক বিভাজনও ছিল। বেশীরভাগ সময় জুড়েই ক্ষত্রিয়রা অবশ্য অবিভাজিত বর্ণ হিসেবে থেকে গিয়েছিল যদিও তাদের মধ্যে অনেকগুলি কূল ভাগ ছিল। অপরদিকে বৈশ্য এবং শূদ্রগন অসংখ্য উপবর্ণে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর এটি হয়েছিল মূলত তাদের বংশানুক্রমিক অর্থনৈতিক বৃত্তি বা পেশার ওপর ভিত্তি করে। বংশানুক্রমিক রীতি নীতির ক্রমবর্ধমান গোড়ামীর ফলে এই উপবর্ণগুলি বিভিন্ন রাজ্য ও নগরাঞ্চলে যথেষ্ট সুরক্ষিত এবং ঐশ্বর্যশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীগুলিরও অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সাধারণ বর্ণ হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শহর এবং সেই হিসেবে তারা এই বর্ণের মানুষ শহর এবং গ্রামে তাদের ধর্ম, সামাজিকতা এবং অর্থনীতির গন্ডি বেঁধে নি। গ্রাম অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজবর্ণ সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় নিজেদের গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে বাইরের কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজেরাই মিটিয়ে নিত।

একমাত্র ধর্ম সংক্রান্ত কোন সমস্যা এলে তার জন্য সকল বর্ণের মানুষকে ব্রাহ্মনদের শরনাপন্ন হতে হত কারণ যেহেতু তাঁরাই ছিলেন শাস্ত্রের অধিকর্তা। ঠিক একই রকমভাবে প্রত্যেকের কূলপ্রথায় কিছু নিয়ম কানুন থাকত যা তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের বেঁচে থাকার শর্ত হিসেবে পালন করত। একে বলা হত জাতি-ধর্ম এবং বিভিন্ন বর্ণের যে নিজস্ব বিধানমন্ডলী তাকে বলা জাতি-সঙ্ঘ।

ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক গোষ্ঠী বরাবরই কোন না কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কখনই কোন ব্যক্তি নির্ভর রূপে গড়ে ওঠেনি। রাজ্যের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপেও বর্ণের একটা ভূমিকা সবসময়ে থেকে এসেছে। যে উপগোষ্ঠীগুলির সৃষ্টি হয়েছিল তারা সমানতালে স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক এবং শিল্প গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে এসেছে প্রয়োজনে তারা নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে আলোচনা এবং নানাবিধ প্রশাসনিক বিষয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করত এরই পাশাপাশি তারা সমবেত হয়ে এক ধরনের পরিচলন সমিতি গঠন করেছিল। এই গোষ্ঠী সরকার পরবর্তীকালে সাধারণ নাগরিক সমিতিতে পরিণত হয় যেটি গোষ্ঠী এবং বর্ণ উভয়ের মিলিত ঐক্যের প্রতিনিধি রূপে কাজ করে। রাজ্যের সাধারণ বিধান মন্ডলী বা সমিতিতে বর্ণ কখনও সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করেনি, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনিক কার্যে তাদের স্থান অতিঅবশ্যই ছিল।

সমগ্র ব্যবস্থাটির স্থায়িত্ব এবং বাস্তবতা ছিল গ্রামীন সম্প্রদায় ও নগর জীবনের ওপর ভর করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এগুলি কখনই শুধুমাত্র নির্বাচন প্রশাসনিক, এবং অন্যানা প্রয়োজনীয় সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত হত না। বরং একথা সত্যি যে একটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য বদ্ধতা বজায় রেখে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র রাজ্যচালনার সাধারণ কলাকৌশল নয়। গ্রামীন সম্প্রদায়কে নিয়ে যে জনজীবন তাকে ছোট গ্রামীন রাজ্য হিসেবে চিরকাল বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে কোন অতিরঞ্জন নেই। তার কারণ প্রতিটি গ্রাম তার সীমাবদ্ধতার নিয়েও স্ব-নির্ভর স্বয়ংশাসিত এবং স্বনির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাগুলিকে পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত করত এর মধ্যে দিয়েই তারা নিজেদের চাহিদা পূরন শিক্ষা ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রশাসন আইন আদালত এবং সকল অর্থনৈতিক চাহিদা এবং ক্রিয়াকর্ম পালন করত, সেই সঙ্গে এক স্বাধীন স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করত।

ভারত—আমাদের সকলের মা

ভারতবর্ষ আমাদের মানব জাতির মাতৃভূমি এবং সংস্কৃত হচ্ছে ইউরোপীয় ভাষাগুলির জন্ম দাত্রী। ভারতবর্ষ মানব জাতীর দর্শনের জন্মদায়িনী, গণিত শাস্ত্রের আরব ভারতবর্ষ খ্রীষ্টধর্মের আদর্শের মাতৃত্বে দাবী করতে পারে যা বুদ্ধদেবের দর্শনকে অনুসরণের মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা পেয়েছিল; স্বনিয়ন্ত্রিত সরকার এবং গনতন্ত্রের জন্মদাত্রী যে ভারতবর্ষ তা দেখা গেছে ভারতের গ্রামীন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে। এই রকম নানা ভাবে ভারতমাতা আমাদের সকলের মা

---- আমেরিকান ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট (ইউ.এস.এ)

INDIA – MOTHER OF US ALL

India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of of Europe's Languages. She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs fo much of our mathematics, mother through Buddha, of the ideals embodied in Christianity, mother through the Village Communities of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all

– American Historian Will Durant (USA)

৩.৩.১১ ভারতীয় সমাজে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনে শবরদের ভূমিকা ঃ একটি উদাহরণ (The Role of the Tribal Savaras in the Sociao-cultural and Religious Movement in Indian Society : An Example)

প্রাচীনকালে মধ্য ভারতের বিন্ধ পর্বত থেকে পূর্বে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল শবরদের বাসভূমি। মহাভারতের যুগে এই অঞ্চল টিকে ছিল দক্ষিণাখোসলা এবং কলিঙ্গা। মূল শবর উপজাতিরা হ'ল "সুরগন, কন্দ, গন্ড, বিলজ্জল, ভুঁইয়া কোল কিশান কুর খেড়িয়া, মুন্ডা এবং ওরাঁও। আর্য সাহিত্যে এই সকল শ্রেণীর উপজাতিকে শবর বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাক বৈদিক যুগে এই উপজাতিরা অনেক বেশী উন্নত

হয়েছে। কোশালা অঞ্চলে এরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বাস করত, প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করে নেতা থাকতেন যিনি মাটি বা পাথরের তৈরী দুর্গের মধ্যে বাস করতেন। এই ধরনর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বহু জায়গায় আজও দেখা যায়। এই উপজাতি সম্প্রদায়ের নেতারাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। দক্ষিণ কোশালায় এই ধরনের রাজ্যস্তরে প্রতিনিধিরা রাজার অধীনে থেকে তাদের কার্যপালন করতে থাকে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন সোমবংশী রাজা। এই রাজা ভিত্তিক ব্যবস্থা সে যুগে যখন বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক তামাডোল সৃষ্টি হত সেই সময় সমাজে সাম্যবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করত।

তারা ছিল ভূমিপুত্র এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। তারা তাদের পরিবেশের সঙ্গে আবেগ এবং আধ্যাত্মিক উভয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকত। তারা অবশ্য পরিষ্কার করে গ্রামের পত্তন করেছিল এবং জমিকে কৃষি উপোযোগী করে তুলেছিল। গ্রামের সন্নিকটে তারা জলাধার খনন করত পশ্চিম উড়িষ্যায় যেগুলিকে "মুন্ডা" বলা হত। এই নামকরণটি মুন্ডা উপজাতিদের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছিল তারা সোনা, রুপা, টাকা পয়সা এরকম মূল্যবান সামগ্রী মাটির তলায় পুঁতে রাখত। তারা বিশ্বাস করত যে কোন দিব্যশক্তি বুঝি সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই দেব দেবীরা সর্বত্র বিরাজমান। পশ্চিম উড়িষ্যায় উপজাতিদের মধ্যে এদের কারোনাম ভেরাপেনু (পৃথিবীর দেবতা); ভেহেলায়পেনু (সূর্যদেবতা) দান্জুপেনু (চন্দ্রের দেবতা) সরুপেনু (পর্বত দেবতা) ডুংরিপেন (পাহাড়ের দেবতা) নাদয়াপেনু (গ্রামের দেবতা) সান্দিপেনু (সীমানার দেবতা) লোহাপেনু (যুদ্ধের দেবতা)। উপজাতিদের একটি প্রথা বা রীতি ছিল যে প্রত্যেক গৃহ, গ্রাম, দুর্গ, নগর ইত্যাদি যে কোন জায়গায় একজন দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা করা। তাদের বিশ্বাস ছিল যে এইসব দেব দেবী তাদের সকল দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবেন। সংস্কৃত ভাষায় এই সব দেবদেবীর নাম হ'ল গৃহদেবতা, গ্রামদেবতা, নগরদেবতা, এবং দুর্গের দেবতা।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে থাকতেন একজন রাষ্ট্রদেবতা যিনি সমগ্র রাষ্ট্রের সুরক্ষা, এবং শ্রীবৃদ্ধির প্রতি নজর রাখতেন। এই রীতিটি যে কেবলমাত্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় ভারতীয় সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই এটি প্রকটভাবে বর্তমান ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে আমরা এই রাষ্ট্রদেবতার ধারণা পাই। যখন কলিঙ্গ এবং অস্ভক দুই রাজার মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ চলছে তখন কলিঙ্গ এবং অস্ভক এর রাষ্ট্র দেবতা দুই যুযুৎমান বৃষের চেহারা নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

প্রত্যেক শবর গ্রামে একটি কাঠের খুঁটিকে রাষ্ট্রদেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হত। এবং এটি করা হত মহাকান্তার (বর্তমানে কালাহান্ডি এবং বস্তার জেলা) অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৭৫ খৃষ্টাব্দ) এটিরই সংস্কৃত নাম থাম্ভেশ্বরী।

কলিঙ্গ অঞ্চলের শবরেরা প্রাচীনকালে প্রত্যেক কুঁড়ে ঘরে, গ্রামে, পর্বতের চুড়ায় এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে কাষ্ঠ অথবা প্রস্তরখন্ড প্রতিষ্ঠা করে রাখত। তারা তাদের ঈশ্বরকে কিটুঙ্গ নামে ডাকত। প্রধান "কিটুঙ্গ"কে স্থাপনা করা হয়েছিল মহেন্দ্র পর্বতে যেটি ছিল তাদের রাষ্ট্র দেবতা। বংশানুক্রমে এই অঞ্চলটি পান্ডবদের সঙ্গে জুড়ে যায় যারা এই দেবতাকে পূজা করত। এখনও বেশ কিছু পাহাড়ে কিছু প্রাচীন মন্দির আছে যাদের নাম কুন্তি জেইলা (দেউলা মন্দির) যুধিষ্ঠির দেউলা এবং ভীম দেউলা, দক্ষিণ কলিঙ্গ প্রদেশে সমুদ্রগুপ্তের অভিযান যে সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে হয়েছিল সেগুলি হ'ল দক্ষিণ কোশালা, মহাকান্তার, কুরালা এবং মহেন্দ্র।

তিনি বিজিত রাজাদের মুক্তিদানের জন্য মহেন্দ্র পর্বতের চূড়াটিকে বেছে নিয়েছিলেন। শবর ভাষায় কিটুঙ্গ শব্দটি সংস্কৃতি সয়ম্ভু রূপে পরবর্তীকালে পর্যবসিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে শবর দেবতা কিটুঙ্গ মাখারাগন কর্তৃক রাষ্ট্র দেবতা হিসাবে পূজিত হয়। একাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে শৈলোদ্ভব এগঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে হিন্দুদের মধ্যে পরবর্তীকালে পূজিত হন।

তোশলী (যা বর্তমানে বালাসোর কটক পুরী আংশিক ভাবে গঞ্জাম অঞ্চলে উপকূল জেলা) সেখানকার ভৌমকরা রাজা (৮ম থেকে ২০ম শতক) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তারা রাষ্ট্রদেবতার পূজা হিসেবে মহাযানের প্রবর্তন করেন আর "স্বয়ম্ভু বা কিটুঙ্গ" হলেন জগন্নাথ।

জৈনরা জগন্নাথ কে শুধুমাত্র মহাবিশ্বের দেবতা হিসাবেই জ্ঞান করেন না বরং তারা বিশ্বাস করেন জগন্নাথই হলেন মহাবিশ্ব। তাঁরা তাঁকে জিননাথ রূপেও পূজা করেন। মহানদীর পশ্চিম পাড়ে বিখ্যাত শবরী নারায়নের মূর্তি আছে। কথিত যে রামায়ণের যুগে শবরী রামচন্দ্রকে এই স্থানে ফল খেতে দিয়েছিলেন এবং বর পেয়েছিলেন যে তাঁর নাম শ্রী রাম চন্দ্রের চেয়েও চিরস্থায়ী হবে। চতুর্দশ শতকে ওড়িয়া ভাষায় লিখিত মহাভারতের রচয়িতা শরৎ দাস শবরী নারায়নের মধ্যে জগন্নাথের মুল অস্তিত্ব খুঁজে পান। তার মতে শবরী নারায়ণ থেকে জগন্নাথ দেবকে পুরীতে আনা হয়।

জগন্নাথ দেবের কাষ্ঠ নির্মিত বিগ্রহ, তিনি জগতের নাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে বসবাস করে নীল পর্বতের শঙ্খ ক্ষেত্রের নীলাচলধামে যা মহানদীর (আসলে যা বিখ্যাত বঙ্গোপসাগর)'র তীরে পুরী নামে পরিচিত। ঈশ্বরের এই আসনটি উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক জাতীয় সড়ক ভারতের পূর্ব উপকূল ধরে গড়ে তুলেছে ভারতের সমাজ সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনে এটি এক অনন্য সাধারণ স্থান দখল করে আছে। এটি ভারতীয় সভ্যতার একটি দিক চিহ্ন। প্রত্যেক প্রজাতির মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস বজায় রাখার এটি একটি পবিত্র রাষ্ট্র এখানে উপজাতি, জৈন, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্ম নিজস্বতা বজায় রাখতে পারে। শ্রী জগন্নাথ দেবের আরও এককভাবে এই প্রত্যেকটি ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিভূ হয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। কাষ্ঠ নির্মিত শ্রী জগন্নাথ দেবের আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই যে তিনি তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা বলভদ্র, এবং কনিষ্ঠ ভগিনা সুভদ্রার সঙ্গে একই সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছেন। জগন্নাথ দেব কৃষ্ণবর্ণ, ভগবান বলভদ্র শ্বেত বর্ণ, দেবী সুভদ্রা পীতবর্ণা।

এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হ'ল যে এই তিন দেব দেবীর আরাধনার মধ্যে এক সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বদেশী সংস্কৃতির সংশ্লেষে যেখানে শবর উপজাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী ভূমিকা আছে কারণ এই দেবতা মূলত শবরদের দেবতা যিনি পরবর্তীকলে অন্যান্য শ্রেণী মানব গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

৩.৪ বিকাশশীল ভারতীয় সমাজ (EMERGING INDIAN SOCIETY)

মানব বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ভারতীয় বিকাশশীল সমাজ একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

৩.৪.১ মানুষের বিবর্তন মুলক বা অবধাতী নিয়তি (The Evolutionary Destiny of Man)

মহাজগতে জৈবিক বিবর্তনে প্রক্রিয়ার চূড়ায় হ'ল মনুষ্যজাতি। প্রখ্যাত বিবর্তনবিদ স্যার জুলিয়ান হাকস্‌লি যাকে বলছে এবং মানুষের সঙ্গে ("And with man") অন্যান্য সত্তার মধ্যে বিবর্তনমূলক পরিবর্তনের একটি নূতন পদ্ধতি শুরু হয় যেটি জীববিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং স্ব উৎপাদন পদ্ধতির থেকে একেবারেই আলাদা। মানব জাতি সৃষ্টির সংক্ষিপ্তসার রূপে আদিতে ছিল তারপর সে তার নিজে ক্ষমতার জোরে

এবং সচেতনতার জন্য নিজের মধ্যে নিখিল জগতের ক্রমবর্দ্ধমান সব কিছুকে একত্র করতে থাকে এবং তাদের আরও নতুন ভাবে আরো মূল্যবান করে সংগঠিত করতে থাকে এবং পরবর্তীকালে এইগুলি দিয়ে নিখিল বিশ্বকে প্রভাবিত করে। বর্তমান অবস্থা পৃথিবী নামে আমাদের গ্রহটির আরো উল্লেখযোগ্য উন্নতির ব্যবস্থা করে চলেছে। এবং এটি করতে গিয়ে এমন এক সঙ্কটপূর্ণ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে যেখানে মানব জীবনে বিবর্তনের প্রক্রিয়া এই প্রথম তার নিজের সম্বন্ধে সজাগ হতে শিখেছে। এটি তাই নিজেকে উন্মুক্ত করার নিয়ম ইত্যাদি পর্যালোচনা/অনুধাবন করছে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কোন দিকে বা তার নিয়ন্ত্রণই বা কার হাতে সে সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় বিবর্তন এখন অন্তর্মুখী অভ্যন্তরীণ সচেনত এবং স্ব-পরিচালিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে জৈবিক বিবর্তনের ফলে হলেও শুধুমাত্র শারীরিক সত্ত্বই এককোষী প্রাণী থেকে বহু কোষী প্রাণী মানুষে বিবর্তিত হয়েছে একই সঙ্গে মানব মস্তিষ্কে সহজাত প্রবৃত্তিরও একত্রীকরণ হয়েছে যা সময়ে সময়ে বিবর্তনের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে সাহায্য করেছে। এখন পুরান দিনের অবস্থার এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি মানুষের কাছে শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে তাই নয়, এগুলি মানুষের অগ্রগতিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লে কম্তের (Le Comte) ভাষায় এই যে বংশগত ভাবে স্মৃতির বিশাল একত্রীকরণ আজ যার কোন অর্থ হয় না এবং যাকে চিরকালের মত অদৃশ্য করে ফেলা হচ্ছে; আসলে মানুষ যেত আধ্যাত্মিক সত্তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে যা তার আসল নিয়তি অনুযায়ী হওয়ার কথা।

অতএব, একদিকে মানুষ জৈবিক বিবর্তনের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছচ্ছে আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের সূচনা বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হ'ল তার মধ্যে যে পাশবিক প্রবৃত্তি নিহিত আছে তাকে জয় করে নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া।

ইশোপনিষদ দাবী করে যে মানব জীবনের সেটি পথনির্দেশিকা "অবিদ্যায়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যামৃতমশ্নুতে" মরণশীল এই পৃথিবীকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে জয় করতে হবে এবং যোগের মাধ্যমে অমরত্ব প্রাপ্ত হতে হবে, পতঞ্জলী তাঁর যোগ দর্শনে পারিপার্শ্বিক মহাবিশ্বকে বলেছে দৃশ্য - যা দেখা যায় এবং মানুষের মধ্যে যে অমরত্বের সত্তা আছে তিনি হলেন দ্রষ্টা যিনি দেখতে পান। তিনি মহাবিশ্বকে বর্ণনা করেছে দৃশ্য রূপে "প্রকাশক্রিয়া স্থিতিশীলম ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম ভোগপাবর্গার্থম দৃ-শ্যম্" প্রকৃতিতে যা দেখা যায় তা উজ্জ্বল চলমান এবং গতিশীল এগুলি জড় ও জীব উভয় উপাদানে গঠিত এবং চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্যেই এগুলি তৈরী যাতে চূড়ান্ত স্বাধীনতা/মুক্তিতে পৌঁছান যায়। বিজ্ঞান মহাবিশ্বের গতিবিধির জ্ঞান এবং যোগ হল মানুষের গতিপ্রকৃতির জ্ঞান। প্রাচীন ভারতবর্ষ দুই-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল, বিজ্ঞান এবং যোগ দুটিই মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রিয়া এবং শ্রেয়া। প্রিয় জীবনের আনন্দ যা বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আরাম ও বিলাস লাভ করা। শ্রেয় জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য যাতে করে আত্মার অমরত্বকে অনুভব করা যায় এবং চিরন্তন অস্তিত্ব জ্ঞান সুখ প্রভৃতিকে উপলব্ধি করা যায় একমাত্র যোগের মাধ্যমেই মানুষ এই জায়গায় পৌঁছুতে পারে।

৩.৪.২ মানুষের বিবর্তনমূলক লক্ষ্য এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যের মূল উপাদান (The Evolutionary Goal of Man and the Essence of Indian Social Heritage)

ভারতীয় সামাজিক ঐতিহ্যের মূল নির্যাস হল মানুষের এই বিবর্তনমূলক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মহাযোগী শ্রী অরবিন্দের ভাষায় "যে মূল চেতনা ভারতীয় মানুষের জীবন, সংস্কৃতি সামাজিক আদর্শ প্রভৃতিকে

চালিত করে এসেছে তা আসলে মানুষের নিজের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্তাকে খোঁজার প্রয়াস এবং জীবনকে আর কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায় তাকে আবিষ্কার করা যাতে করে মানুষের অজ্ঞতা থেকে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের উত্তরণ ঘটে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গঠন/নির্মান বা কঠিন বাস্তবাদী জরুরী প্রয়োজনের সময়ে ভারতবর্ষ কিন্তু এই প্রবল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি বা এটিকে ভুলে যায়নি। তিনি আরো জোর দিয়ে বলেছেন "ভারতবর্ষের মানসিকতার আধ্যাত্মিকতাই হ'ল প্রধান চাবিকাঠি অনন্তের বোধ এর চিরকালীন এবং স্বদেশীয়"

"The master idea that has governed the life, culture, social ideals of the Indian people has been the seeking of man for his true spritual self and the use of life as a frame and means for that discovery and for man's ascent from the ignorant and natural into the spiritual existence. This dominant idea India has never quite forgotten even under the stress and material exigencies and the externalities of political and economic construction." He has emphasised, "Spirituality is indeed the master key of the Indian mind, the sense of infinity is native to it."

"বিশ্বে হৃদয় শান্তিময় পরিপূর্ণতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।" "Not peace but fulfillment is what the heart of the world is seeking".

চাহিদা এবং দায়িত্ব ধারণা এবং সুযোগ, ঐতিহ্য এবং উচ্চাশা সময় এবং পরিবেশ এ সব নিয়েই আমূল পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের চলমানতা। তথ্য বিপ্লবের যুগে এমন কোন সমাজ নেই যার ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এমন একটি সমাজ যে তার প্রাচীন ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের কাছে দায়বদ্ধ এবং যেটি একটি চলমান সংস্কৃতি ও সভ্যতা সে কিন্তু আত্মার শক্তিতে নিজের উচ্চাশা অনুযায়ী পরিপূর্ণতার বিবর্তনের দিকে সমকালের গতিতে ঘুরিয়ে দিতে পারে। খুব ধীরে হলেও নিশ্চিত রূপে।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মানুষ

- পরম্পরাগত সামাজিক ছাঁচটি বজায় রেখে আধুনিক অবস্থাকে মানিয়ে নিচ্ছে।
- প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রেরণা অনুযায়ী মূল বিষয়বস্তুর সামান্য পরিমার্জন করেছে।
- নিজেদের জাতি বা বর্ণে সংশ্লিষ্ট থাকছে, যা তাকে তার আত্ম পরিচয়ে সাহায্য করছে।
- জাতি প্রথার বিষয়ে অনেক বেশী খোলা মেলা হচ্ছে, এখন আর বর্ণের ভিত্তিতে পেশা, শিক্ষা রোজগার এবং বাসস্থান নির্ভর করছে না।
- নিজগৃহ নিজ পরিবেশের বাইরে গিয়েও যেমন সুযোগ আসছে সেই অনুযায়ী কাজ করছে যেখানে "জাতি" ধারণাটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে।

অন্যান্য

- গ্রাম্য জীবনে পরস্পর নির্ভরশীল জাতির মধ্যেও একটি সামাজিক ক্রম বজায় থাকত। কিন্তু এই ক্রমতালিকা যে বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে করা হত আজ মনে করা হয় সেগুলি যেন পুনর্বিন্যাসের কিছু কিছু প্রক্রিয়া ছিল।
- বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। "সাংস্কৃতিক" ঐতিহ্য এবং সমাজের শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট বর্গের আধুনিক ঐতিহ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষ বা নিচু জাতির কাছে অধরা থাকছে না তারা ক্রমশ তাদের সুউচ্চ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা যার দ্বারা তারা সমাজের যে কোন ক্ষেত্রে উচ্চতম স্থানে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে সজাগ হচ্ছে।

- অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে।
- অবস্থা এবং অবস্থানের ক্রমপরিবর্তনের ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে তা কিন্তু সমাজের প্রস্তাবিত হওয়ার লক্ষণ যদিও সত সহশ্রাব্দের প্রেক্ষাপটে এটিকে একটি আন্তঃকালীন পরিবর্তনের সময় বলে ধরা যেতে পারে এবং এটি আরো বৃহত্তর ঐক্যের প্রতি এবং স্থিতবস্থার একটি পদক্ষেপে বলে গন্য হতে পারে গান্ধীজী যাকে গ্রাম স্বরাজ রূপে আখ্যা দিয়েছেন।
- মানব সভ্যতার শুরু থেকে যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজে যে বাহ্যিক মূল্যবোধগুলি টিকে ছিল তা আজও অটুট আছে এবং তা সমাজের স্থিতাবস্থা এবং সমাজকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে।
- একজন মানুষ তাঁর মূল্যবোধ আছে বিশেষত যার হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন যে জাতিরই হন না কেন যত নিম্ন বর্গেরই হউন সমাজের অন্যান্য মানুষ তাঁরা অর্থে, সামর্থে তাঁর তুলনাই যত বড়ই হোক না কেন তাঁদের থেকে উক্ত ব্যক্তি সমাজে অনেক বেশী সম্মানিত।
- **অন্তরাত্মার স্বাধীনতা ঃ** কোন বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসের উচ্চাভিলাষ এবং তাকে সার্বজনীন রূপ দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তা বিবিধ মনুষ্য চরিত্রের রূপান্তর এবং অন্তত তা আত্মার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুসারী তার কারণ আত্মার স্বভাবই হল একটি ভেতরকার স্বাধীনতা যা অন্তরের মুক্তিকে তুলে ধরা এবং এক বিশাল ঐক্য যার মধ্যে অতি অবশ্যই মানুষকে তার নিজের স্বভাব , প্রকৃতি অনুযায়ী বেড়ে উঠতে দিতে হবে।

৩.৫ ভারতীয় সমাজের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা (MISHON AND ASPIRATION OF INDIAN SOCIETY)

মহান দ্রষ্ট্রা শ্রী অরবিন্দ বলেছেন "ভারতবর্ষ হল ভারত শক্তি, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং বিশ্বাস/আস্থা হ'ল এর অস্তিত্বের মূল নীতি এবং প্রধান শক্তি ভারতবর্ষ তার নিজ গুণে অমর জাতিতে পরিণত এই গুণগুলি হল ভারতবর্ষের বিস্ময়কর ভাবে টিকে থাকা এবং সময় সময় পুনর্জীবন প্রাপ্তির গোপন কথা।"

"আধ্যাত্মিক এবং মানসিকতা সঠিক ঐক্যবন্ধন করতে হবে কারণ আত্মা মন ও শরীরের মধ্যে দিয়ে কাজ করে কিন্তু পুরোপুরি বুদ্ধিমত্তা বা ভীষণ রকম বস্তুবাদিতা নির্ভর সংস্কৃতি যা আজ ইউরোপে (পশ্চিমে) দেখা দিয়েছে, মনে রাখতে হবে তার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও চেতনার মৃত্যু বীজ লুকিয়ে আছে।"

"সাম্প্রতিক ভারতীয় প্রজন্মের মধ্যে যে পশ্চিমি মানসিকতার আদর্শের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক এবং অন্যান্য প্রতিভা সম্পন্ন মানসিকতার প্রতি কোন শুভ সংকেত যাচ্ছে না।" কিন্তু এত কিছুর বিভ্রান্তিকর ধোঁয়াশার মধ্যেও এখনও ক্ষীণ আলোর সম্ভাবনা আছে আর এই ক্ষীণ আলো সায়াহ্নের নয় এটি নূতন ভোরের আলো এটি যুগ সন্ধির আলো। প্রাচীন ভারতবর্ষ কিন্তু মরে যায়নি এমন কি সে তার সৃষ্টিশীলতরার শেষ কথাও বলেনি; ভারতবর্ষ ভীষণভাবে আজও তার নিজের এবং সমগ্র পৃথিবীর

মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদে শুধুমাত্র প্রাচ্যের যে সমস্ত মানুষ ইংরেজ নবীশ হয়ে পড়ছে তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে, যারা পশ্চিমের বাধ্য ছাত্র হয়ে পাশ্চাত্যের সাফল্য এবং বার্থতাকে নকল করতে গিয়ে ভবিষ্যতকে নষ্ট করে ফেলছে তাই নয় প্রাচ্যর যে নিজস্ব অমর আত্মশক্তি তাকেও জাগিয়ে তুলতে হবে।" "India is the Bharata Shakti, the living energy of a great spiritual conception and fidelity to it is the very principle of her existence. For by its virtue alone she has been one of the immortal nation, this alone has been the secret of her amazing persistence and perpetual force of survival and revival."

"Spiritual and temporal have indeed be perfectly harmonised, for the spirit works through mind and body. But the purely intellectual or heavily material culture of the kind that Europe (West) now favours bears in its heart the seed of death".

"The lifeless attempt of the last generation to imitate and reproduce with a servile fidelity the ideals and forms of the West has been no true indication of the political mind and genious of the Indian people. But again all the mist of confustion there is still the possibility of a new trilight, not of an evening but a morning yuga-sandhya. India of the ages is not dead nor has she spoken her last creative word; she lives and has still something to do for herself and the human people. And that which must seek now to awake is not an anglicised orient people, docile pupil of the West and doomed to repeat the occident's success and failure, but still the ancient immemorable Shakti recovering her deepest self, lifting her head higher towards the supreme source of light and strength and turning to discover the complete meaning and a vaster form of her Dharma."

যুগ যুগ ধরে অতীতের ভারতীয় সমাজ নানা টানাপেড়েনে ক্লান্ত হয়ে প্রেয়র চেয়ে শ্রেয়কে বেশী মূল্য দিয়ে এসেছে এবং বিজ্ঞানের অবহেলা করেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছে তবে এত কিছুর মধ্যেও আত্মার স্বাধীনতা কখনও হারায়নি।

অতীত দিনের শত্রুহরি তাঁর "নীতি শতকম" এ মানব সমাজকে সাবধান করেছেন এই বলে যে সেই সব মানুষ যাঁদের কোন সৎভাব নেই কোন পবিত্রতা বোধ নেই, কোন অবদান নেই, কোন জ্ঞান নেই, কোন শালীন ব্যবহার জানা নেই, কোন গুণ নেই, কোন ধর্মই নেই তারা মরণশীল জগতে পৃথিবীর কাছে একধরনের বাড়তি বোঝা।

বর্তমান ভারতীয় সমাজে বিজ্ঞান এবং যোগ সাধনা উভয়েরই গুরুত্ব আছে। আজকে পৃথিবীর জন্য গান্ধীজির বাণী হল হিংস্রতা নয় শান্তি। প্রধান গান্ধীবাদী শ্রী বিনোবা ভাবে বর্তমান সময়কে বিজ্ঞান এবং যোগ এর যুগ বলে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন এই দুইয়ের সমন্বয়ে মানব সমাজে এবং পরিবেশের মধ্যে ঐক্য এবং সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে।

ভারতীয় সমাজে প্রধানতম আকাঙ্খারই হল উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা, মহান দার্শনিক শ্রী অরবিন্দের ভাষায় মানব জাতিকে যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সেগুলি একমাত্র অন্তরের মধ্যে জয় করার মধ্যে দিয়েই তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, আরাম এবং বিলাসের জন্য প্রকৃতির শক্তিকে কব্জা করার মধ্যে দিয়ে নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মার শক্তিকে বাড়িয়ে নিয়ে তা করা উচিত।

The problems which have troubled mankind can only be solved by conquering the kingdom within, not by harnessing the forces of Nature to the service of comfort and luxury, but by mastering the forces of the intellect and the spirit, by vindicating the freedom of man from within as well as without and conquering from within external Nature.'

৩.৬ এককের সারাংশ (UNIT SUMMARY)

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হচ্ছে ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় সকলের জন্য স্থান আছে। ইউরোপ এবং এশিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য অনুপ্রবেশকারী গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষ অতিথেয়তার সঙ্গে বরণ করে নিয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনভাবে বজায় রেখে সমানধিকার লাভ করে এসেছে।

প্রত্যেক জাতির মানুষ এদেশে এসেছে এবং নিজেদের স্থান করে নিয়েছে, তাই ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ভৌগোলিক ভাবেই সারা বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার নয়, সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতিরও সংক্ষিপ্তসার।

ভারতীয় সমাজে মধ্যে অবদমিত করে রাখার যে প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় সেটি অন্যান্য দেশের বর্ণপ্রথা প্রতিষ্ঠানিকতার সমগোত্রীয়। প্রতিটি বর্ণের নিজস্ব জীবন ধারা আছে যা তার নিজস্ব নিয়ম, নীতি আচার অনুষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই সৃষ্টি জ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত দর্শন অনুযায়ী যে গনতন্ত্র সেটিও ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রবলভাবে পরিচালিত করে। গনতান্ত্রিক বোধ স্বাধীনতা, সাম্যতা এগুলি পুরোপুরি ভারতবর্ষের নিজস্ব মানসিকতা এবং তা যেন প্রতিটি শিরা উপশিরায় অন্তর থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বৈদিক সংস্কৃতি সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি জুগিয়ে এসেছে। এই সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল 'কুল' -- পরিবার জন -- উপজাতি, পাঞ্চজন-- উপজাতিদের সংসদ বা গোষ্ঠী। ভারতীয় সংস্কৃতিতে জীবনের ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম, আত্মার ঠিক পরেই এর স্থান ধর্ম আবার চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঋতম, সত্তম, তপ এবং যোগ। একমাত্র ধর্মই একজন অভিলাষী কে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়শ এর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ফ্রাঙ্কো গতি তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত (১৯৯৬) পুনর্লিখিত ভারতীয় ইতিহাস (Rewriting Indian History) গ্রন্থে যে পরিচ্ছেদটির ওপর জোর দিয়েছেন সেটির নাম "The tainted Glass": A look at Western Civilization" সেখানে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি ভ্রান্ত তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

- প্রথম ভ্রান্ত তথ্য -- আর্য বনাম দ্রাবিড়
- দ্বিতীয় ভ্রান্ত তথ্য -- বেদ সম্বন্ধীয়
- তৃতীয় ভ্রান্ত তথ্য -- বর্ণ প্রথা

ওলন্দাজ সমাজতাত্ত্বিক কোনার্ড এল্স্ট সাম্প্রতিক কালে প্রাপ্ত একত্রিত প্রমান্য বস্তুর ভিত্তিতে জোরের সঙ্গে দাবী করেছেন যে বৈদিক সংস্কৃতি এবং হরপ্পা (দ্রাবিড়ীয়) সংস্কৃতি আসলে এক এবং অদ্বিতীয় এবং এখান থেকে তাঁর বিখ্যাত "উর্চিমট" তত্ত্বের উদ্ভবন।

- আর্যরা আসলে ভারতেরই বসবাস করত
- ভারতবর্ষ থেকে আর্যরা ইরান, তুর্কীস্থান এবং
- ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে

বিগত দু-ই দশক জুড়ে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈদিক বিজ্ঞানের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আবিষ্কারে মানুষ লিপ্ত হয়েছে এবং এর ফলে "বিস্তারে একত্রীকরণ সূত্র" সম্বন্ধে দু'য়ের মধ্যে যে পারস্পরিক মিল পাওয়া গেছে তা বহু লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক গণিতজ্ঞ, শারিরবিদ সহ বহু সংখ্যক নোবেল পুরস্কার জয়ী ব্যক্তিত্বদের আকৃষ্ট করেছে।

ভারতীয় সভ্যতা প্রথমাবস্থা থেকে নিজের পথ প্রদর্শনের জন্য একধরেনের স্থিমতের ওপর নির্ভর করে এসেছে যা একে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি জীবন যাপনের পদ্ধতি শিখিয়েছে। এটি হল চতুঃবর্ণ এবং চতুরাশ্রম বিষয়ে দ্বৈত মত প্রথা -- চতুরাশ্রম মানব জীবনের উন্নতির চারটি পারস্পরিক / ক্রমপর্যায় স্তর চারটি বর্ণের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রথার সৃষ্টি তার ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থার উদ্রেক হয় যা মনুষের আত্মা, মন এবং জীবনকে স্বাভাবিক স্তর থেকে উন্নীত এবং অগ্রসর হতে সাহায্য করে। প্রথমত কিছু নিয়মের মধ্যমে এক নিখুঁত সত্তায় পরিণত করে -- ধর্ম এবং পরিশেষে যা এক আধ্যাত্মিক মুক্তির অনুভূতি এনে দেয়।

মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি যেন এই বোধের মধ্যে দিয় হয় যে তার আত্মা অমরত্বের অধিকারী এবং এর মধ্যে দিয়ে যে এক চিরন্তন অনন্ত অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করছে।

সমগ্র ভারতীয় ব্যবস্থাটির ভিত্তি হ'ল সাধারণ জীবনে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে অংশগ্রহণ যেখানে যে যার নিজের ক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রমী, যেমন ধর্ম, শিক্ষা, দীক্ষায় ব্রাহ্মণগন, যুদ্ধ রাজনীতি এবং রাজকার্যে ক্ষত্রিয়গন, ধনসঞ্চয়, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকার্য বৈশ্যগন এইভাবে শূদ্রবর্ণের মানুষও সভ্য জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার অধিকারী ছিল। প্রত্যেক বর্ণের মনুষেরই নিজ মত, রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ এবং প্রশাসনে ও ন্যায় বিচার বিভাগীয় স্তরে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল।

এর ফলশ্রুতী হিসাবে ভারতীয় রাজনীতির জন্ম হতেও যেমন বেশী সময় লাগেনি তেমনই এটি বেশী দিন টেকেওনি। যদিও অন্যান্য দেশে শ্রেণীভিত্তিক শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবে সে দেশে রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাপ ফেলে ছিল। চারটি বর্ণ বিধিবদ্ধ সামাজিক স্তর বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছিল প্রত্যেক বর্ণই তাদের জীবনের সাথে আধ্যাত্মিকতাকে জুড়ে নিয়েছিল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক শিষ্টাচার, শিক্ষা সামাজি নীতি এবং সম্মান জনক নৈতিকতা এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজের ক্ষেত্র এবং পর্যাপ্ত অধিকার ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছিল এবং তা বজায় রেখে চলত। এই প্রথার ফলে সকল শ্রেণীর জন্য কিছু বাঁধাধরা শ্রমবিভাজন থাকত এবং একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা বজায় থাকত। এই সময় বংশানুক্রমিক নীতির অগ্রাধিকার ছিল যদিও এই সময় দৈনন্দিন অভ্যাসের চেয়ে তত্ত্ব অনেক দৃঢ় এবং কঠোর ছিল কিন্তু সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কাউকে অস্বীকার করা বা বাঁধা দেওয়া হত না এবং সমাজে, রাজনীতিতে, প্রশাসনে তার নিজের বর্ণের বা নিজ গোষ্ঠীর প্রভাবে অনেকে গন্যমান্য ব্যক্তিত্ব হয়েও উঠতেন। শেষ পর্যন্ত সামাজিক ক্রমবিন্যাস এবং রাজনৈতিক ক্রমবিন্যাসের মধ্যে তফাৎ থেকেই যেত উভয়ে কখনই এক হত না।

নাগরিকের সাধারণ রাজনৈতিক অধিকারের অংশীদার ছিলেন সকল মানুষ এবং জনসভা বিধানমন্ডলী ও প্রশাসনিক গোষ্ঠীতে তারা নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করার এবং আপন স্থান অধিকার করার সুযোগ পেতেন।

ভারতীয় সমাজে ঋষিরা ছিলেন এক আশ্চর্য চরিত্র এমন এক মানুষ যাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না অথচ তিনি কিন্তু যে কোন জাতিবর্গের বা বর্ণের মানুষ হতেন। কিন্তু ঋষি হওয়ার ফলে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সকলের উপরেই প্রয়োগ করতে পারতেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মের স্থান রাজারও উপরে ধর্ম–নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি, ন্যায়বিচার, ইত্যাদির জৈবিক চেহারা যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত।

মানুষ একদিকে জৈবনিক বিবর্তনের প্রতিনিধি অন্যদিকে অপার আধ্যাত্মিক বিবর্তনের প্রতিনিধি। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হল পাশবিক প্রবৃত্তিকে জয় করে নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুধুমাত্র শান্তি নয় পৃথিবীর হৃদয় আজ পরিপূর্ণতা খুঁজবে। বিজ্ঞান হল মহাবিশ্বের সাইবারনেটিক্সের জ্ঞান আর যোগ হচ্ছে মানুষের সাইবারনেটিক্স (গতিপ্রকৃতি)'র জ্ঞান। উভয়ে একত্রিত হয়ে মানব সমাজে মানুষ আর পরিবেশের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।

ভারতীয় সমাজের উচ্চাশা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই জিনিস চেয়ে এসেছে আর তা হল মানবিক এবং আত্মিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন।

৩.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ন (CHECK YOUR PROGRESS)

১. ভারতীয় সভ্যতা টিকে গেছে কিন্তু অনেক প্রাচীন সভ্যতা পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেছে, আপনার মত অনুযায়ী কি সেই শক্তি যার জন্যে ভারতীয় সমাজে এটি সম্ভব হয়েছে?

২. ভারতীয় সমাজে কোন কোন গুলি শাশ্বত এবং প্রয়োজনীয়?

৩. জাতি বা বর্ণ প্রথার দুর্বলতা এবং শক্তি গুলি আলোচনা করুন।

৪. এই বিবৃতিটির যাথার্থতা বিচার করুন এটি একটি জাতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শক্তি যা তার বিবর্তনের এবং বৃদ্ধির নিজস্ব নিয়ম গড়ে তুলেছিল এবং যার মাধ্যমে কোন জাতি বা বর্ণ কোন রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারত।

৫. ভারতীয় সমাজের কোন বৈশিষ্ট্যের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে যে বহিরাগত যে কোন জাতির মানুষ এদেশে এসে তাদের সাতন্ত্রতা বজায় রেখে সম্মানের সঙ্গে কোন জাতিগত প্রভেদ বা ভেদাভেদ ছাড়াই বসবাস করার জায়গা পেয়েছে?

৬. স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় সমাজে ধর্মের স্থান কোথায়?

৭. ভারতীয় সমাজে যুগ যুগ ধরে ঋষিদের স্থান কোথায়?

৮. ভারতীয় সমাজের উচ্চাশা কী?

৯. মানষের বিবর্তনীয় নিয়তি কী?

৩.৮ বাড়ীর কাজ (ASSIGNMENT/ACTIVITY)

১. আপনার নিজের ভাষায় যুক্তিপূর্ণতাসহ এই বিবৃতিটির যাথার্থতা বিচার "বর্ণ বা জাতি প্রথা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক বা সংবিধানের নেই। যে কোন জাতের বা বর্ণের সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই করে নিতে পারবে কারণ প্রত্যেক জাতের বা বর্ণের নিজস্ব নিয়ম এবং সংস্কৃতি আছে যেগুলি সেই বর্ণকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এইগুলি মধ্যে থেকেই একটি বিশেষ জাতি বা বর্ণের বিবর্তন ও বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

২. আজকের যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা কতটা?

৩.৯ আলোচনার বিষয়ও তার পরিস্ফুটন (POINTS FOR DISCUSSION AND CLARIFICATION)

এই এককটি পঠনের পর একজন শিক্ষার্থীর হয়ত কিছু কিছু বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে ভালভাবে বোঝার জন্য সেগুলিকে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করুন।

৩.৯.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৩.৯.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৩.১০ উৎস (REFERENCE)

1. CHAMANLAL (Editor, 1968) : India Mother of UA All, Bhikashn Chamanlal, Modern School Barkhamba Raod New Delhi-1
2. CHANDLER KENNETH (1987) Modern Science and Vedic Science : An Introduction, Modern Science and Voil Sciecne Vol.1, NO.4 Maharisha International University Fairfield lowa.
3. DASH, SHIVA PRASAD (1962): Sambalpur Itihas (The History of Sambalkur in Orya Langage) Published by Shiva Prasad Dash Sambalpur.
4. DOBZHANSKI.T (1962) Mankind Evolving

5. EQUALS ONE Pondichary
6. FRUMKUN R.M. (2001) Science and the concept of Race : Part I of a Series
7. GARN, STANLEY MARION (1963) : The Races of Mankind, The Book of Popular Science Vol 8.
8. GAUTIER FRANCOIS (1996) : Rewriting Indian History, Vikash Publishing House Pvt Ltd. 576 Masjid Road Jangrura, New Delhi, -110014
9. HOOTON EARNEST ALBERT (1946) : Up from the Age, Matilal Banarasidass, Varanasi, 1965.
10. HUXLEY JULIAN (1953):Evodution In Action, The Kalinga Prize Speech.
11. TERMAIN, R. et al. (Editors) (1990) : Understanding Physical Anthropology, (St. Paul. MN; West Publishing Company.
12. KALIDASA (Classical Sanskrit Poet) :Kumarsambhava (the first Verse)
13. Mc. CULLOCH RICHARD : The Races of Humanity
14. MAHARISHI MAHESH YOGI (1996) : India to be Supreme Power in the world, Maharishi Mahessh yogi Vedic Vishavidyalaya Z-14, zonel, Maharana Protap Mcyan, Bhopal - 462011
15. MALAYALa MANORAMA (1996) Manorama Year Book 1996, Malayala Manorama Co. Ltd. Kottayam Kerala.
16. MANDELBAUM, DAVIDG (1970) : Society in India, Popular Prakashasn, Mumbai-2000
17. MUNSI K.M (1961) Foundation of Indian Culture , Bharatity a Vidya Bhawan, Chowpatty. Mumbai, 1965
18. NARAYAN JAYAPRAKASH (1950) : Building up from the Village, Talks on All India Rado, April 1950 (Source Man than Rural Reconstruction Special 1980)
19. SCHUL BERG LUCILLE (1968) : Historic India, Time Life International (Nether Land) N.V 1971.
20. SRI. AUROBINDA (1916-21) : The Foundation of Indian Culture, Sir Aurobinda Foundation Trust. Sri Aurobindo Ashram Publication Department Pondichery. 1959.
21. SRI AUROBINDA (1909-10) : Teh Ideal fo the Karmayoin, Sri Aurobindo Foundation Trush Sri Aurobindo Ashram, Publication Department Pondichery 1966.

22. SRI AUROBINDO (1920) Ideals and Progress, Sri Aurobindo Ashram Publication Department Pondichery. 1966.

23. SRI AUROBINDO AND MOTHER :on the Future Society, Sri Aurobindo Society Pondichery.

24. SRI SWAMI SIVANANDA (1947) : All about Hinduism The Devine Life Society, Sivananda Nagar, Rishikesh, Himalaya 1961.

25. SWAIM RANGATHANANDA (1986) : Eternal Values For A Changing Society Vol IV. Bharatiya Vidya Bhavan Mumbai.

26. THE CENTRAL GAZETTEER GOI (1965) : The Gas etteer of India, Indian union, Vol 1, Country and People, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting GOI New Delhi.

27. UNESCO (1950) : Statement by Experts on Race Problems

28. UNESCO (1952) : Sttement on the Nature of Race Differences

29. WORLD UNION (1965) : Concion Evolution and the Destiny of man World Union International Centre, Pandicharry - 2 India.

পর্ব-৩

শিক্ষামূলক পরিকল্পনা সংস্থা এবং গঠন
[EDUCATIONAL SYSTEMS AGENCIES AND SET-UP]

পর্ব-৩

শিক্ষামূলক পরিকল্পনা, সংস্থা এবং গঠন
[Educational Systems, Agencies and Set up]

ভূমিকা (Introduction) ঃ

এই পর্বটি শিক্ষামূলক পরিকল্পনা, সংস্থা এবং গঠনের ধারণার সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করে। একক—১-এ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাগত পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত যা এই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করায়। এটি পার্থক্য সূচিত করে প্রচলিত, প্রথাবহির্ভূত এবং বিধিমুক্ত শিক্ষার মধ্যে এবং এর সাথে সাথে বিধিমুক্ত দূরসঞ্চারী এবং মুক্তধারা শিক্ষাগুলির মধ্যে পার্থক্যকেও সূচিত করে। এটি সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন এবং মূলসমৃদ্ধ শিক্ষাকেও উপস্থাপিত করে।

একক—২-এ আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাগত সংস্থা সম্বন্ধে গৃহ, বিদ্যালয়, লোকসমাজ এবং জনসংযোগ মাধ্যম এবং শিক্ষার সঙ্গে এই সমস্ত সংস্থাগুলির সম্পর্ক। এখানে বর্ণিত হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, শিক্ষক শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কাজ এবং ভূমিকা। এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যকলাপ এবং পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সংযোগ।

একক—৩-এ ভারতবর্ষে শিক্ষাগত পরিকাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে শিক্ষাগত পরিকাঠামো একই রকমের নয়। ভারতবর্ষে যে বিচ্ছিন্ন ধরনের শিক্ষাগত পরিকাঠামো দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ শিক্ষা দীর্ঘদিন রাজ্যের বিষয় ছিল। বর্তমানে এটিকে একমত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবুও শিক্ষার গঠনগত নিয়ন্ত্রণ রাজ্যগুলির একই আইনের আওতাভুক্ত। যদিও আমরা বিভিন্ন প্রণালী দেখতে পাই যেগুলি রাজ্যগুলি ও একক অঞ্চলসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈচিত্র্যের কারণগুলি ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা কেবলমাত্র রাজনৈতিক হতে পারে, বিভিন্নরকম গঠন গ্রাম এবং শহর পর্যায়ে, সমাজ পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে ও রাজ্য পর্যায়ে দেখা যেতে পারে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও শিক্ষাগত পরিকাঠামো গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এগুলি হল একক স্তর, দ্বিতীয় স্তর, তৃতীয় স্তর এবং চতুর্থ স্তর পরিকাঠামো। এছাড়াও রয়েছে অভিভাবক শিক্ষক সংগঠন এবং স্থানীয়, জেলা ও রাজ্য স্তরের গঠন।

একক ১ ❑ শিক্ষাপদ্ধতি (Educational Systems)

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ শিক্ষা এবং শিক্ষা পদ্ধতি

১.৩.১ শিক্ষা শব্দটির পরিভাষাগত বিশ্লেষণ

১.৩.২ পদ্ধতি শব্দটির অর্থ

১.৪ প্রচলিত, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ও বিধিমুক্ত শিক্ষার মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য

১.৫ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি

১.৫.১ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উপাদান সমূহ

১.৫.১.১ শিক্ষক

১.৫.১.২. শিক্ষার্থী

১.৫.১.৩. শিক্ষাদান শিক্ষা পদ্ধতি

১.৫.১.৪. শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা

১.৬ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা পদ্ধতি

১.৭. বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি

১.৮ বিধিমুক্ত দূরসঞ্চারী এবং মুক্তধারা শিক্ষাগুলির মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য

১.৯ মুক্তধারা শিক্ষা

১.৯.১ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১.৯.২ মুক্ত বিদ্যালয়

১.১০ দূরসঞ্চারী শিক্ষা

১.১০.১ বিশেষ শিক্ষার জন্য দূরসঞ্চারী শিক্ষা পদ্ধতি

১.১১. মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা

১.১১.১ মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার অর্থ

১.১১.২ মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার পাঠক্রম

১.১১.৩ শিক্ষকের ভূমিকা

১.১২. সি. বি. আর (সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন)

১.১৩ এককের সারাংশ

১.১৪ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.১৫ বাড়ীর কাজ

১.১৬ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১৭ উৎস

১.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই এককটির উদ্দেশ্য। শিক্ষার সংজ্ঞা এবং অর্থ কী আর শিক্ষা পদ্ধতি শব্দটিরই বা অর্থ কি তা এই এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচলিত প্রথাবহির্ভূত ও বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতিগুলির মধ্যে পার্থক্যও বলা হয়েছে। মুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা এবং দূরসঞ্চারী পদ্ধতিতে সাধারণ তথা বিশেষ শিক্ষা ও এই এককটিতে আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে, সি.বি. আর ও মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা এককটিতে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে আপনি পারবেন ঃ

- শিক্ষা শব্দটির অর্থ যথাযথ ব্যাখ্যা করতে
- প্রচলিত, প্রথাবহির্ভূত ও বিধিমুক্ত শিক্ষাসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে
- বিধিমুক্ত দূরসঞ্চারী ও মুক্তধারা শিক্ষাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে
- মুক্তধারা শিক্ষা, দূরসঞ্চারী শিক্ষা, মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা ও সি বি আর (সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসন) বর্ণনা করতে।

১.৩ শিক্ষা এবং শিক্ষাপদ্ধতি (Education and Educational Systems)

আমরা প্রায়শই নিজেদের 'শিক্ষিত' বলে বিবেচনা করি এবং 'শিক্ষা' শব্দটি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। আমাদের মধ্যে অনেকের কাছে শিক্ষা নিছক তথ্যাবলির সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয় আবার অন্যদের কাছে শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা লাভ করা। শিক্ষা সম্বন্ধে কি ধারণা সকলের কাছে গৃহীত হয়েছে তা দেখা যাক।

১.৩.১ শিক্ষা শব্দটির পরিভাষাগত বিশ্লেষণ (Analysis of the term 'education')

শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটি গতিশীল তাই সময়ের সাথে সাথে এটির অর্থ পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন মানুষের নিজেদের

শিক্ষা, মতবাদ ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে অনুদিত হয়।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'শিক্ষা-এডুকেশন' শব্দটির ল্যাটিন শব্দ 'এডুকেয়ার' বা একই ভাষায় ব্যবহৃত 'এডুসিয়ার' শব্দটির থেকে উৎপত্তি হয়েছে এটি বিশ্বাস করা হয়। 'এডুকেয়ার' শব্দটির অর্থ লালনপালন করা বা পরিপুষ্ট করা আর 'এডুসিয়ার' শব্দটির অর্থ 'উত্তোলন করা বা ভিতর থেকে বাইরে চালনা করা'। এখনও অনেকে আছেন যারা বিশ্বাস করেন শব্দটি অনুদিত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'এডুকেটাস' থেকে যেটি গঠিত হয়েছে দুটি পদ 'ই' এবং 'ডিউস' দ্বারা। 'ই' এর অর্থ 'ভিতর থেকে বাইরে চলন' এবং 'ডিউস' এর অর্থ 'উন্নতি সাধন করা বা এগিয়ে যাওয়া। মূল শব্দ দুটির অর্থ আমাদের এই বিশ্বাস করতে পরিচালিত করে যে 'এডুকেশন' শব্দটির অর্থ লালনপালন করার পরিবেশ তৈরি করা যা একটি শিশুকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

যাই হোক বর্তমান যুগে 'এডুকেশন' শব্দটি ব্যবহৃত হয় পদ্ধতি ও ফল দুটিকেই প্রকাশ করতে। ফল হিসাবে এডুকেশন হল শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা, ধারণা ও অর্জিত শিক্ষার মূল্য এগুলির মোট যোগফল। পদ্ধতি হিসাবে এটি হল— মানুষের মধ্যে ঐ গুণগুলি উৎপাদনের সহায়ক। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটি বলা যায় সুদূরপ্রসারী— শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি সারা জীবনব্যাপী পদ্ধতি। অপরদিকে শিক্ষা একটি সুন্দর সুপরিকল্পিত পদ্ধতিও বটে। দুটি অভিমত আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরের বিরোধী মনে হলেও আসলে এরা পরস্পরের পরিপূরক।

১.৩.২ পদ্ধতি শব্দটির অর্থ (Concept of System)

আমরা শিক্ষাকে ফল এবং পদ্ধতি হিসাবেও বিবেচনা করেছি। কোন পদ্ধতিই সম্পূর্ণ হয় না যদি সেটির গঠনে সহায়ক উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক কার্যকরী সমন্বয় না ঘটে। 'শিক্ষা'—এই পদ্ধতিটির উপাদানগুলির একটি তালিকা আপনি করতে পারেন কি? যখন উপাদানগুলি দলবদ্ধভাবে বা ব্যবস্থিত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং কার্যকরী হয় তখন তাকে পদ্ধতি বলে। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় আপনি কি লক্ষ্য করেন নি সেখানে পদ্ধতির ধারণা বর্তমান?

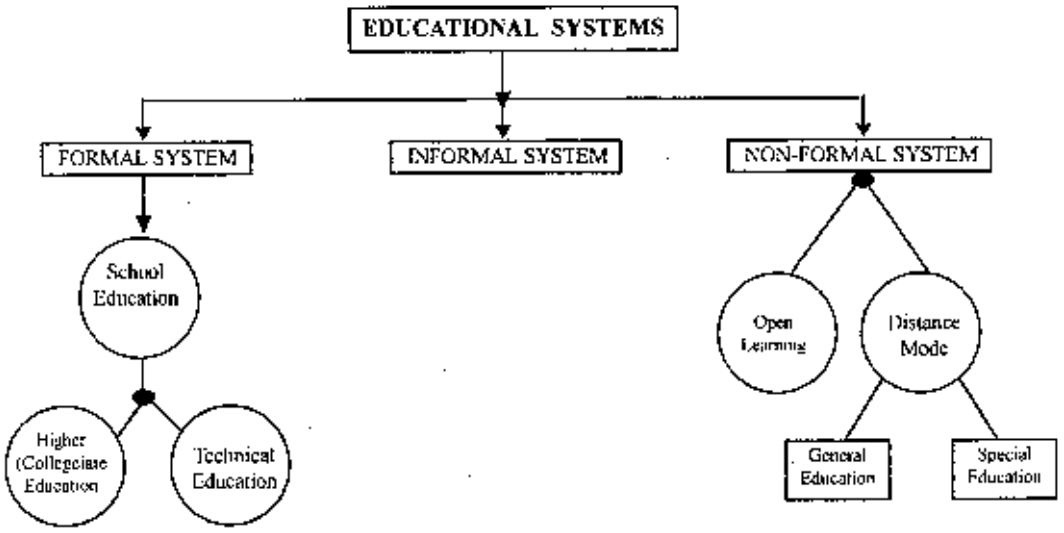

১.৪ প্রচলিত, প্রথাবহির্ভূত এবং বিধিমুক্ত শিক্ষাগুলির পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা (Conceptual Distintions Between Formal Informal, Non-formal Education)

আমরা বিবেচনা করেই নিয়েছি যে শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণাটি সুদূরপ্রসারী, শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যখন একটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তখন আমরা বলি শিশুটি শিক্ষা শুরু করেছে। ঠিক সেইভাবে যখন সে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা লাভ করে আমরা বলি তার শিক্ষণ শেষ হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় ডিগ্রি ডিপ্লোমা হল শিক্ষার শিক্ষার মাপকাঠি এবং বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষা সরবরাহ করে।

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী পদ্ধতি এই মূল সংজ্ঞাটিকে সাধারণ মানুষ সংকীর্ণরূপে প্রকাশ করে থাকেন। শিক্ষা সুদূরপ্রাসারী চিন্তা করলে বলা যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিক্ষার একটি অংশমাত্র। কিন্তু তার অর্থ শুধুমাত্র প্রচলিত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা নয়। আমরা যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে অভ্যস্ত সেটি প্রচলিত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আড়ষ্ট, সুন্দরভাবে বর্ণিত একটি আদর্শ নমুনাকে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করে। নির্দিষ্ট বয়সে ভর্তি, প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম, সারা বছরের নির্দিষ্ট কার্যসূচি, সময় মাফিক পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং অনুমোদিত পুস্তক ইত্যাদি বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিতে আছে। নার্সারি, প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে ভর্তি এবং উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে।

অপরদিকে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা পদ্ধতি উপরে বর্ণিত প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিকে অনাবশ্যক বিবেচনা করে দূরে সরিয়ে দেয়। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার সংজ্ঞা হল—শিক্ষা আসলে একটি জীবনব্যাপী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞাত কোন প্রচেষ্টা নেই। এই পদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন থেকে সে দোলনায় খেলা করে আর শেষ হয় সেদিন যেদিন তার মৃত্যু হয়। যথাযথভাবে বলা যায়—এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোন নিয়মকানুন, পাঠ্যপুস্তক বা সময়সীমা নেই। নেই কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা, ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। তথাপি বলা যায় প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত, আচারনিষ্ঠ, সংস্কৃতবান ও আদর্শবান যে কোন শিক্ষার্থী অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত শিক্ষার্থী উন্নতমানের হতে পারে।

Table : 1.1. : Comparison of features of syystems of education

Features	Formal system	Informal system	Non-formal system
1. Duration	Fixed, eg-10+2 system of schooling, 3 years for graduation.	No duration can be specified	Flexxible, may very according to needs.
2. Age	Age-groups well defined at every stage.	A continuous process, any age and all ages.	No age bar
3. Clientele	Young people of specified age, sex and socio-economic status.	Free for all.	Children outside school, the unemployed youth, working people adult literates and illiterates.
4. Cost	Costly	Almost free	Cost-effecrive
5. Objectives	Academically sound	Unspecified	Goal oriented
6. Nature	Rigid	Unorganized	Flexible

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির আড়ষ্টতার পাশাপাশি ব্যতিক্রমী শিক্ষা পদ্ধতির অসংবদ্ধতা বিবেচিত হওয়ার ফলে কিছু মানুষের কাছে বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির নমনীয়তা ক্রমশ বিকশিত হয়। মনে করা হয় বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতিটি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিটির পরিপূরক। অনেকের কাছে এটি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প। ১৯৭৩ সালে কুম্ব (coomb) মনে করেন বিধিমুক্ত শিক্ষার অর্থ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির কাঠামোর বাইরে এটি একটি সুব্যবস্থিত, রীতিসঙ্গত শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং এটিকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যা কেবলমাত্র নির্বাচিত পাঠ্যবিষয়বস্তু সীমিত সংখ্যক জনগণ শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সবার মধ্যে সরবরাহ করে। Any organized, systamatic education activity outside the framework of the formal system, designed to provide selective types of learning to particular sub groups in the population, adults as well as children." অন্যভাবে বলা যায় এটি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বহির্ভূত এক সুসংগঠিত পদ্ধতি। বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি মনোমত বহু নিয়মশৃঙ্খলা অনুগামী। এটি অনেক কমখরচ সাপেক্ষ, প্রয়োজনানুরূপ, কার্যকরী এবং প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।

১.৫. প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি (The Formal Education System)

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ অবগত আছি। বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় দুটি পুঁথিগত বিদ্যাবিষয়ক এবং যন্ত্রশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এটির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুপরিকল্পিত একটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে যেটি প্রথম প্রয়োজন সেটি হল একটি নির্দিষ্ট স্থান বিদ্যালয় যেখানে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। আদর্শ শ্রেণী যা বিস্তৃতভাবে বলা যায় শ্রেণীকক্ষ বা বিভাগ। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা একত্রে একটি নির্দ্ধারিত স্থানে বসে। শ্রেণী কক্ষটিতে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন ডেস্ক, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি থাকতে পারে।

প্রতি শ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে যাকে সেশন বলে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন বিদ্যালয় শুরু হয় এবং শেষ হয়। প্রতি পিরিয়ডের জন্য একটি সময়সীমা নির্দ্ধারিত থাকে।

শিক্ষণীয় বিষয়সূচী যা পিরিয়ডগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তা পূর্ব পরিকল্পিত পাঠক্রম থেকে স্থির করা থাকে। পাঠ্যপুস্তক থেকে নির্দেশিত পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হয় এবং তার ভিত্তিতে পরবর্ত্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি লাভ ইত্যাদি বিচার করা হয়।

বিদ্যালয়ে শিশুর সঙ্গে একটি নতুন সমাজের পরিচিত ঘটে যেটি তার বাড়ির পরিবেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইখানে শিক্ষক, সহপাঠী এবং আরও অনেকের সঙ্গে প্রতিদিন কার্যকলাপের যে আদানপ্রদান ঘটে তার প্রভাব শিশুর চিন্তাধারা এবং আচার আচারণের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। বিশ্বের সম্পর্কে সে অবহিত হয়, পরিবেশের বিশেষ কোন বস্তুর প্রতি তার মনোভাব প্রকাশ পায়। সে তার নিজের জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং শিক্ষক বা নেতৃস্থানীয়দের বিশেষ দক্ষতা জানতে পারে।

১.৫.১ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উপাদান সমূহ (Components of the Formal Educational System)

ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি যে, কোন পদ্ধতিতে যখন অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উপাদানগুলি একত্রে কাজ করে তখন সেটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এখন আমরা প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা

করব।

১.৫.১.১ শিক্ষক (The Teacher)

পদ্ধতিটির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল শিক্ষক। এই উপাদানটির কোন ত্রুটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র পদ্ধতিটির ব্যর্থতার উপর প্রতিফলিত হয়। যথার্থভাবে এবং যত্ন সহকারে নিজের কর্মদক্ষতার উপর শিক্ষকের প্রশিক্ষণ লাভ করা উচিত। সুসংহত সামাজিক, বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সব গুণ তার থাকা উচিত কারণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে।

১.৫.১.২ শিক্ষার্থী (The Learner)

পূর্বে মেধাবী শিক্ষার্থীর গুণের ক্রমবিকাশের জন্য পরিশ্রম করা হত। পৌরাণিক কাহিনীতে একলব্য, অর্জুনের মত শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। যাই হোক সাম্প্রতিককালে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে গবেষণা হয় তার থেকে জানা বিশেষ লক্ষণযুক্ত গুণাবলী শিক্ষার্থীর সহজাত যাকে বলা যায় ঈশ্বরের দান।

১.৫.১.৩ শিক্ষাদান-শিক্ষা পদ্ধতি (The Teaching Learning Process)

শিক্ষাদান শিক্ষা পদ্ধতিটির আর একটি মূল উপাদান যেটির ধারণা জটিল এবং সুদূরপ্রসারী। শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষা সংঘটিত করতে সবকটি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সমন্বয়ে এই পদ্ধতিটি গঠিত। শিক্ষালাভে সাহায্যকারী সহায়ক বস্তু, নিয়মপ্রণালী, শিক্ষাদানের জন্য প্রতিরূপ ও সূত্র, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া কিংবা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া এবং দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও সবই প্রয়োজনীয় উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞান নীতিভিত্তিক এটি একটি সুন্দর সুসংগঠিত পদ্ধতি।

১.৫.১.৪ শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা (The Management of Teaching)

আদর্শগতভাবে প্রত্যেক পদ্ধতিরই নিয়ন্ত্রণাধীন, সমশ্রেণীভুক্ত উপাদান থাকা উচিত যাতে পাদানগুলি একত্রে সহজে কাজ করতে পারে। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিটি সচল রাখতে প্রশাসনিক সব বিভাগকে শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৬ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা পদ্ধতি (The Informal Education System)

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাপদ্ধতিটিকে প্রাসঙ্গিক শিক্ষাপদ্ধতিও বলা হয়। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি এর কোন শুরু বা শেষ নেই এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত। এটাও বিশ্বাস করা হয় যে ব্যতিক্রমী শিক্ষাপদ্ধতি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি এবং এটি প্রচলিত পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করে। বাস্তবিক পক্ষে প্রায়শ অজ্ঞাতভাবে দুই পদ্ধতির সহ অবস্থান এটিতে গৃহীত হয়েছে।

এই ধরনের পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির সব বাধ্যতাই অনুপস্থিত। শিক্ষা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে যে কোন স্থানে যেমন সিনেমা হলে, পার্কে, পিকনিক স্পটে কিংবা সভাসমিতিতে প্রত্যেক স্থানে শিক্ষা গ্রহণ হয়।

এই শিক্ষা পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত সামাজিকতা, নৈতিকতা ও মানবিকতা এই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির বুনিয়াদকে দৃঢ় করে।

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিবার, সমাজ, সরকার, ধর্মীয় স্থান, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি গণ্য করা হয়। পরবর্তী এককে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

নির্দ্ধারিত সময়সীমা, স্থান এবং পাঠক্রম না থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিক্রমী শিক্ষা পদ্ধতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বা নিম্নমানের ভাবা যেতে পারে না। শক্তিশালী প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা পদ্ধতি একজন যোগ্য নাগরিককে সমাজে উপস্থাপিত করে।

১.৭ বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি (The Non-Formal Educational System)

বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি বা N.F.E.-র ধারণা সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা আছে। অনেকে মনে করেন বিধিমুক্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিপূরক আবার অনেকে মনে করেন এটি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প। NFE-এর সংজ্ঞা কুম্ব প্রথম যেটি দিয়েছেন সেটি শিরোলিপি 1.4-এ আলোকিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে উন্নতি অপেক্ষা NFE-র ধারণাটি জটিল এই মনে করে অনেকে এটিকে সমীহের চোখে দেখেন।

এটি জটিল কেননা

(ক) এটির সময় বা স্থানের কোন পরিমাপ নেই

(খ) এটি জনগণের বিশাল অংশের সঙ্গে যুক্ত

(গ) এটির শিক্ষণীয় বিষয়সূচি শিক্ষার্থীদের প্রতি বিভাগের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বন্দোবস্ত করতে হয়

(ঘ) শিক্ষার জন্য বহু মাধ্যমের প্রয়োজন

(ঙ) শিক্ষার মূল্য সার্টিফিকেট, ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা দ্বারা বিচারপূর্বক নির্দ্ধারিত হয় না

বিধিমুক্ত শিক্ষা একটি বহুমাত্রিক পদ্ধতি। শুধুমাত্র শিশু বা যুবক শ্রেণীকে নয় প্রাপ্তবয়স্ক যারা শিক্ষাগ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের জন্যও এই পদ্ধতির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার মূলকথা হল নমনীয়তা। ভর্ত্তি, উত্তীর্ণ হওয়া এবং যারা শিক্ষিত হতে আগ্রহী অথচ বিশেষ নিয়মকানুন মানতে পারবেন না তাদের যোগ্যতার মান নির্ণয় করা ইত্যাদি সমস্ত বাধ্যতামূলক নিয়মকানুনকে এটি প্রত্যাখ্যান করে। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোন স্তর বা সময়সীমা নেই। এর নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে এমনভাবে প্রস্তুত করে যাতে সে জীবনের যে কোন অবস্থায় নিজেকে উপযোগী করতে পারে (পরিবর্তনের দ্বারা) এবং যে কোন অবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারে। কম খরচ সাপেক্ষে এটি সর্বোৎকৃষ্ট ফলের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিধিমুক্ত শিক্ষার কতকগুলি মুখ্য বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হল :

(ক) কমনীয়তা (Flexibility) : নীচের বহুপ্রকার বিধি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমুক্ত পদ্ধতি নমনীয়তাকে যোগান দেয়—

সময়, স্থান, স্থিতিকাল, পরিমাপ, পাঠ্যসূচি, পদ্ধতি। বস্তুত এটি সেই পদ্ধতিই যেটি শিক্ষার্থীর দিকে ফিরে তার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা চাহিদাগুলি যেমন যারা পুরুষ কর্মে যুক্ত তাদের কর্ম শেষ হবার পর অর্থাৎ রাত্রে অথবা যারা মহিলা কর্মে যুক্ত তাদের কর্ম শুরু করার পূর্বে অর্থাৎ সকালে শিক্ষার সময়কাল স্থির করা ইত্যাদি মেটাতে সম্মত

থাকে।

(খ) প্রাসঙ্গিকতা (Relevance): বিধিমুক্ত শিক্ষার যেহেতু একটি নিশ্চিত লক্ষ্য আছে তাই সকলের জন্য একই ধরনের বিষয়সূচি এটির নেই কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন আবহাওয়া, সংস্কৃতি ও অবস্থা।

(গ) মূল্যায়ন (Evaluation) : বিধিমুক্ত শিক্ষার্থীকে ব্যর্থতার অপবাদ থেকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা করে। নমনীয়, সমষ্টিগত এবং আত্মমূল্যায়ন সমন্বিত বুদ্ধিসম্পন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতিটিতে আছে।

(ঘ) অভিগম্যতা (Accessibility) : এই পদ্ধতিটি শিক্ষিত হতে আগ্রহী এমন জনগণকে শিক্ষা প্রদান করে। এমনকি যাদের সুযোগ সুবিধার অভাব তারাও এই পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। এই ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য প্রথাগত মাধ্যমের পরিবর্তে বহুমুখী মাধ্যমের সহায়তা প্রয়োজন।

(ঙ) ব্যয় সাশ্রয় (Cost effectiveness) : প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বহির্ভূত জনগণের কাছে পৌঁছানই এই পদ্ধতিটির লক্ষ্য। আমাদের দেশে বিপুল জনসংখ্যার কথা চিন্তা করে শিক্ষার মান বজায় রেখে পদ্ধতিটির পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে স্বল্পব্যয়ে জনগণকে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

১.৮ বিধিমুক্ত, দূরসঞ্চারী এবং মুক্তধারা শিক্ষাগুলির মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য (Conceptual Difference Between Non-Formal Education, Distance Education and open Education)

এটি বিশ্বাস করা হয় যে পরিবর্তনশীল বিশ্বে ভবিষ্যতের জন্য কোন ধারণা সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। বর্তমানে বিধিমুক্ত পদ্ধতির দ্বারা আমরা যা বুঝি তা হল কয়েক দশক পূর্বে শিক্ষাপদ্ধতির ধারণায় এবং কার্যকারিতায় বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। সেইভাবে বর্তমানে এটি অনুমান করার বিষয় যে আগামী দিনে বিধিমুক্ত শিক্ষার অর্থ কি হবে।

যেহেতু আপনারা জানেন যে মুক্তধারা ও দূরসঞ্চারী শিক্ষা দুটিকে বিধিমুক্ত পদ্ধতির শাখা হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে fig-1.1 এ এই দুটি পদ্ধতিকে প্রচলিত ও বিধিমুক্ত পদ্ধতির পাশাপাশি উপস্থাপনা করা উচিত এই মতবাদের ভিত্তিতে অনেকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন। তাদের মতবাদ প্রথম দুটি পরবর্তী দুটির পরিপূরক— কোনটিরই অংশমাত্র নয়।

এই দুটিকে বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির অধীনে উপস্থাপনা করার সপক্ষে আমাদের যুক্তি হল আমরা মেনে নিয়েছিলাম এই সংজ্ঞাটি যে বিধিমুক্ত পদ্ধতি একটি সুব্যবস্থিত শিক্ষামূলক কার্যক্রম।

দূর সঞ্চারী ও মুক্তধারা শিক্ষা পদ্ধতি দুটিই বস্তুত স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিধিমুক্ত, দূরসঞ্চারী ও মুক্তধারা তিনটি শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করতে যাওয়া অনেকটা বরফের উপর হাঁটার মত। এগুলির মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও এদের মধ্যে পার্থক্য করা ফলপ্রসূ কেননা এগুলি শিক্ষার পদ্ধতি প্রকাশ করে।

যে কোন ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় পদ্ধতিকে সহজে বোধগম্য করতে তার মূল অনুসন্ধান করাই শ্রেয়। প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক কার্যকারিতার ফল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই অর্থে শিক্ষা একজনের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক বোঝায়। গুরু শিষ্য পরম্পরার উপর ভিত্তি করে সব শিক্ষা পদ্ধতি গঠিত হয়েছে। শিক্ষার সর্বজনীনতা এবং শিক্ষায় আগ্রহী জনস্রোত দুটির ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সম্পর্কের আদর্শ অসম্ভব হয়েছিল। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতের ছাঁচটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। তবুও শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকের

উচিত সশরীরে প্রতিদিন শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। শিক্ষার এই ধরনের সমঝোতার জন্য যেখানে শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় সেখানে শিক্ষার অন্য আর যে কোন পদ্ধতিই চিন্তা করা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নর্থ ইষ্ট মিসৌরী ষ্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত ইস্তাহারটির উদ্ধৃতিটি পাঠ করা যাক।

"ডাক যোগে শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব বিশেষভাবে রাখা হয় সেই সব উপযোগী শিক্ষার্থীদের কাছে যারা বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত উপস্থিত হতে পারবে না বা তাদের চাহিদামত বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই— তাদের জন্য। যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী, চাকুরিজীবি বা যারা কর্মজীবনে উন্নতি চান তাদের জন্য এই ধরনের শিক্ষা সুবিধাজনক।" এইভাবে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শারিরীক ব্যবধানের যে পূর্ব ধারণাটি অচিন্তনীয় ছিল তা এখন বাস্তবে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটিকেই আমরা বলি দূরসঞ্চারী শিক্ষা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে স্থানগত দূরত্বের মাধ্যমে। শিক্ষকের উপস্থিতি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র তার প্রেরিত পাঠ বিষয়বস্তুগুলির মাধ্যমে দূরসঞ্চারী পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে শিক্ষকের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন কিন্তু দূরসঞ্চারী পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষা দেন ছাপানো কাগজ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে পাঠিয়ে।

বিদ্যালয়ের বন্দিদশার পরিবর্তে দূরসঞ্চারী পদ্ধতি শিক্ষার মুক্ত পরিবেশ দিতে চায়। কিন্তু অনেকের মতে মুক্তির প্রস্তাবটুকুই যথেষ্ট নয়। সুতরাং মুক্তধারা শিক্ষার ধারণাটি ব্যক্ত হয়। নেতিবাচক অর্থে অবরোধ থেকে মুক্তি এটির উপর এবং ইতিবাচক অর্থে কাজ করার জন্য মুক্তি এটির উপর জোর দেয় মুক্তধারা পদ্ধতি। এই অবরোধগুলি চারটি সুপারিশের যথা স্থানসংক্রান্ত, সময়সংক্রান্ত, পদ্ধতি সংক্রান্ত, সাধারণ সংক্রান্ত অধীনে শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। স্থান সংক্রান্ত অবরোধগুলি ছাত্রদের নির্দিষ্ট স্থানে শ্রেণীতে উপস্থিত হওয়ার উপর জোর দেয়। সময় সংক্রান্ত অবরোধগুলি শ্রেণী চলার এবং সমস্ত শ্রেণী চলার মোট সময়সীমা নির্দ্ধারণ করে। সর্বাপেক্ষা কম বয়সী থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি বয়সী বয়স অনুসারে এই সময়সীমা নির্দ্ধারিত হয়। লিঙ্গ, সম্প্রদায়, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কিত অবরোধগুলি পদ্ধতি সংক্রান্ত অবরোধ গঠন করে। সাধারণ সংক্রান্ত অবরোধগুলি পেশ করে সরকার ও সমাজ।

আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি মুক্তধারা পদ্ধতি দূরসঞ্চারী পদ্ধতিরই একটি ধরন যেটির অবরোধগুলির অপসারণ করা হয়েছে। ঠিক সেইভাবে দূরসঞ্চারী পদ্ধতি বিধিমুক্ত পদ্ধতির একটি ধরন যেটি থেকে শিক্ষণ শিক্ষা পদ্ধতি চলাকালীন শিক্ষকের শারিরীক উপস্থিতি অবরোধটি অপসারিত করা হয়েছে।

১.৯ মুক্তধারা শিক্ষা (Open Learning)

মুক্তধারা শিক্ষার ধারণা থেকে অপরিহার্যভাবে বেড়ে উঠল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি। পেরি ১৯৭৬-এ তিনটি মুখ্য যুদ্ধোত্তর প্রবণতা চিহ্নিত করলেন যেগুলির সংগতি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি প্রকাশ করতে সাহায্য করে। যেগুলি হল—

(ক) বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ সুবিধার উন্নতি

(খ) শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি

(গ) শিক্ষায় সমতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রয়োগ বৃদ্ধি

ইংল্যান্ডের বয়স্ক শিক্ষায় প্রচুর অসুবিধা দেখা গেছিল। বিষয়সূচিটি ছিল সংস্কৃতি সংক্রান্ত এবং সেখানে বৃত্তিমুখী সংক্রান্ত বিষয় খুব কম ছিল। এটি কখনই ডিগ্রি লাভের পথ দেখায়তো না। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী এটি লাভ করার

সুযোগ পেত কিন্তু সমাজের বিশেষ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেণী এটির থেকে দূরত্বে থাকত। ইতিমধ্যে ইউরোপে জনসংযোগ ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ হতে শুরু করে এবং সমাজে শিক্ষার প্রসারের জন্য এমন তৎপর হয়ে ওঠে যা পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। বয়স্ক শিক্ষার বেতার অনুষ্ঠান বি.বি.সি নিয়মিত শুরু করে। টি.ভি. ও রেডিও প্রচার বিভাগের সঙ্গে ন্যাশনাল এক্সটেনশন কলেজ সংযুক্ত হয়ে ডাকযোগে শিক্ষারও প্রস্তাবনা রাখে।

ইউরোপে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (UKOU) প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে একই ধাঁচের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রি ইউনিভারসিটি অফ ইরান (১৯৭৩), ফেরারনুন উনিভেয়ারসিটিটি অফ্ জার্মানি (১৯৭৪), এভরিম্যানস ইউনিভারসিটি অফ ইস্রায়েল (১৯৭৪)। আল্লমা ইকবাল ওপেন ইউনিভারসিটি অফ পাকিস্তান (১৯৭৪), অ্যাথাবস্কা ইউনিভারসিটি, কানাডা (১৯৭৫) ইউনিভারসিডাড এসথাটাল ও ভিসটানসিয়া, কোস্টারিকা (১৯৭৭)। শ্রীলঙ্কা ইনস্টিটিউট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন (১৯৭৮) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ওপেন ইউনিভারসিটি, হায়দ্রাবাদ এগুলির তৎকালীন বিশ্ববদ্যালয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে মুক্তবিশ্ববিদ্যালয় (Open Universities in India)

বিংশ শতাব্দীর বিগত দু দশকে ১৯৮২ সনে অন্ধ্রপ্রদেশ ওপেন ইউনিভারসিটি, হায়দ্রাবাদ যেটির নামকরণ করা হয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ওপেন ইউনিভারসিটি (BRAOU) প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মুক্তধারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকারকে প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় স্তরে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভারসিটি (IGNOU) দিল্লিতে প্রধান কার্যালয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইগনু (IGNOU) ক্যাম্পাসস্থিত ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউনসিল (DEC) ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে দূরসঞ্চারী শিক্ষার সমন্বয়সাধন এবং উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ শুরু করে। ভারতের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল।

- ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভারসিটি (IGNOU)–1985
- ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ওপেন ইউনিভারসিটি (BRAOU)–1982
- কোটা ওপেন ইউনভারসিটি (KOU)–1987
- নালন্দা ওপেন ইউনিভারসিটি (NOU)–1987
- যশবন্ত রাও চ্যবন মহারাষ্ট্র ওপেন ইউনিভারসিটি (UCMOU)–1989
- মধ্যপ্রদেশ ভোজ (ওপেন) ইউনিভারসিটি (MPBOU)–1991
- ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর ওপেন ইউনিভারসিটি (BAOU)–1994
- কর্ণাটক স্টেট ওপেন ইউনিভারসিটি (KSOU)–1996
- নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভারসিটি (NSOU)–1997
- ইউ. পি. রাজর্ষি ট্যান্ডন ওপেন ইউনিভারসিটি (UPRTOU)–1998

ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদ, নিউ দিল্লীর সহযোগিতায় কলকাতার নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিখন পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে আত্ম শিক্ষণের পাঠ্য পুস্তিকাগুলির ক্রম অনুসারে বর্তমান এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। এটা হল একটা জাতীয় কর্মসূচী। অনুগ্রহ করে পরবর্তী অধ্যায় ১.১০ দূরসঞ্চারী শিক্ষা লক্ষ্য করুন যেখানে দূরসঞ্চারী শিক্ষার নীতিগুলি সংযুক্ত এবং প্রতিবন্ধীদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ

শিক্ষার ক্ষেত্রে এর উপযুক্ততা বিষয়টি রয়েছে।

১.৯.২ · মুক্ত বিদ্যালয় (Open School)

এটি উল্লেখযোগ্য যে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, নিউ দিল্লি একটি মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে চৌদ্দ বছরের বেশি বয়সী শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কেবল পড়তে ও লিখতে জানা চাই। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য অবশ্য মাধ্যমিক স্তরের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে চারটি বিষয় একটি ল্যাংগুয়েজ উত্তীর্ণ হতে হবে— সেটি একবছরে না হলেও পাঁচ বছরের মধ্যে একেবারে একটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

১.১০ দূরসঞ্চারী শিক্ষা (Distance Education)

১৯৮২ সালের জুন মাসে কানাডার ভ্যানকাউভারে অনুষ্ঠিত দ্বাদশতম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দি ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন কর্তৃক দূরসঞ্চারী শিক্ষার ধারণা গৃহীত হয়। এই পদ্ধতিতে জনগণকে যোগ্য নাগরিক হওয়ার জন্য সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা কাজকর্ম করে অবসর সময়ে পাঠাভ্যাস করতে পারেন। দূরসঞ্চারী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ দুটির মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ স্থান ও সময়।

দূর সঞ্চারী শিক্ষায় আছে

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান
- পাঠ্য বিষয় শিক্ষা-প্রস্তুতির এবং তা পুনরায় প্রেরণ এর মধ্যবর্তীকালীন সময়
- শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্য বিষয় গ্রহণ এবং তা পুনরায় প্রেরণ এর মধ্যবর্তীকালীন সময়।

দূরসঞ্চারী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সঞ্চালন কৌশলের সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহার, উপস্থাপনার সুস্পষ্টতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা · দূর থেকে শিক্ষালাভকে কার্যকরী করা, শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকাদির যথাযথ ব্যবহার এবং সংগঠিত ভাবে আদর্শ পদ্ধতিকে বহুমুখী মাধ্যমের সাহায্যে সহজে নিয়ে আসা।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব থাকার জন্য দূরসঞ্চারী শিক্ষাকে যোগাযোগ বজায় রাখতে বহু মাধ্যমের উপর আস্থাশীল হতে হয়। প্রতি কোর্সের প্রস্তুতি পর্বে বিশেষজ্ঞের সাহায্যে আত্মনির্ভর পাঠ্য উপাদান প্রস্তুত করা হয়। লক্ষ্য রাখা হয় সেগুলি পাঠ্যপুস্তকের মত কলেবরযুক্ত যেন না হয় কিংবা বিষয়সূচির দিক থেকে অপর্যাপ্ত না হয়। শিক্ষার্থী পাঠ্য উপাদানগুলি ডাক মারফত গ্রহণ করে এবং ইচ্ছামত সময়ে প্রস্তুত করে। এরপর যে ঐগুলির নির্দেশমত তার যা করণীয় সেগুলি করার পর প্রতিবেদনটি ডাক মারফত পাঠিয়ে দেয়। প্রতিবেদনটি পরীক্ষা করার পর সংশোধন অথবা পুনরায় যা করণীয় সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হয়।

স্বল্পকালীন পাঠক্রমগুলি যথোপযুক্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর নাগালের মধ্যে কোন জায়গায় সংঘটিত করা হয়। বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী যেমন, কর্মশালা (ওয়ার্কশপ), আলোচনাচক্র (সেমিনার) বিতর্কমূলক আলোচনাচক্র, প্রদর্শন বা অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

দূরসঞ্চারী শিক্ষার প্রতি বিভাগে খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞবর্গের শিক্ষা অতিরিক্ত সংযোজিত হয় যা প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষার্থীর কাছে স্বপ্নের মত অপূর্ণ থেকে যায়। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির জন্য সমপরিমাণগত এবং অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবিশিষ্ট যোগাযোগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকাংশে কমে গেছে। টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলি

দেখে কেবল যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা নয় শিক্ষার্থী টেলিফোন, ফ্যাক্স বা ইন্টার অ্যাকটিভ টিভি মাধ্যমে উপস্থাপকের সঙ্গে মতামত বিনিময় বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এইভাবে উপস্থাপক শিক্ষার্থীর সময়মত যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে।

দূরসঞ্চারী শিক্ষায় মূল্যায়নও একটি অসাধারণ অংশবিশেষ। ধারাবাহিক বুদ্ধিসম্পন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন, গঠনমূলক মূল্যায়ন ও নিজস্ব মূল্যায়ন এই তিনটি বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ায় বলা যায় এটি যথার্থই দূরসঞ্চারী পদ্ধতির সংজ্ঞার অনুগামী।

১.১০.১ বিশেষ শিক্ষার জন্য দূরসঞ্চারী পদ্ধতি (Distance Mode for special Education)

সমাজে এমন অনেকে আছেন যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। তাদের সেই শিক্ষার জন্য সেইরকম সব বন্দোবস্ত করা হয়। যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন তাদের আমরা সনাক্ত করব কেমন করে যাতে তারা বিশেষ শিক্ষা পেতে পারে?

কখন কখন যারা শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম এই ধরনের শিক্ষার্থীদের 'প্রতিবন্ধী' হিসাবে সুপারিশ করা হয় এবং তাদের বিশেষ শিক্ষার শ্রেণীভুক্ত করা যায়। মানসিক প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, স্বল্পমাত্রা প্রতিবন্ধী, শিখন প্রতিবন্ধী, শিখন উপযুক্ত মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা আবেগ বৈকল্য যুক্ত শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

যারা এই ধরণের স্বল্পমাত্রা প্রতিবন্ধী তাদের প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা। কিন্তু প্রশ্ন হল এই ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষা দেওয়া উচিত না স্বতন্ত্রভাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। যদি অন্যদের সঙ্গে সমবেতভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে তারা হয় নিয়মিত নির্দ্ধারিত শ্রেণীতে উপস্থিত হতে বাধার সম্মুখীন হবে আর না হয় তাদের প্রতি শিক্ষকের অতিরিক্ত মনোযোগ হেতু তারা অস্বস্তিবোধ করতে পারে বা বিব্রত হতে পারে। নিয়মিত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের থেকে স্বতন্ত্র করায় তাদের মর্যাদা কিছু কমে না। তারা বোধ করতে পারে যে অন্যরা তাদের দয়া দেখাচ্ছে কিংবা তাদের সঙ্গে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন আচরণ করছে। তারা এটাও বোধ করতে পারে যে তাদের মানসিক ক্ষমতা কম এই মূল্যায়ন করে তাদের অপর্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ভীতিজনক বিশেষণ যেমন দয়ার পাত্র, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি তারা অন্যদের কাছ থেকে শুনতে পারে। যে শিক্ষা তাদের

Table-1.2 : Unique and common characteristics of students with handicaps referred to as mild.

Characteristics	Condition		
	LD (Learning Disabled)	MR (Mentally Retarded	ED (Emotionally Diststurbed
1. Cognitive	Average I, memory problems, information deficits.	Below average IQ, memory problems, information deficits	Varied IQ, memory problems, information deficits
2. Achievement	Below average, reading problems, math deficits writing problems.	Below average, reading problems, math deficits, writing problems.	Below average reading math deficits, writing problems.
3. Language	Often	Often delayed.	Often delayed.
4. Social	Hyperactivity, non-attention, interpersonal	Hyperactivity, non-attention, interpersonal problems.	Hyperactivity, non-attention, interpersonal problems.

দেওয়া হয় সেটি তাদের শুধু উন্নতই করে না, তাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দেয়।

যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন সেইসব শিক্ষার্থীদের কাছে দূরসঞ্চারী শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এটি বেনামে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ করে দেয়।

১.১১ মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা (Value Oriented Education)

মানুষের আচার আচরণের পরিবর্তন ও প্রগতির উন্নতি সাধনে শক্তিশালী হাতিয়ার হল শিক্ষা কিন্তু আমরা দেখি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা তাদের জাতীয়তাবাদ সচেতন করতে নীতিবোধ ও ধর্মবোধের সঙ্গে খুব কমই পরিচয় করে। বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পদ্ধতিটি পুনর্গঠন করতে ওটির উদ্দেশ্য ও বিষয়সূচির মধ্যে অলঙ্ঘনীয় বাধা বিস্তৃতি পূর্বের মত থেকে যায়। মূল্য শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন কারণ বিষয়টি বিচার বিবেচনা নির্ভর। 'পারমাণবিক বোমা অসংখ্য মানুষকে ধ্বংস করতে পারে' এই বিবৃতিটি পরীক্ষা করতে পারেন কেননা এটি সত্য ঘটনা ভিত্তিক। অন্যদিকে "পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা অনুচিত" বিবৃতিটি পরীক্ষা করুন। সত্য ঘটনা ভিত্তিক। অন্যদিকে ভুল, সুন্দর, কুৎসিত ইত্যাদি শব্দগুলি সিদ্ধান্তমূলক বা মূল্য হিসাবে সেই সমস্ত জিনিসগুলিকে সুপারিশ করে যেগুলি মানুষ কামনা করে বা বেশি পছন্দ করে। উদাহরণ স্বরূপ অর্থ, খাদ্য, নিরাপত্তা সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি। ভাল ও মন্দের তুলনামূলক বিচার আছে কেননা মানুষ একটির পরিপ্রেক্ষিতে অপরটির মূল্যায়ন করে। মানুষ আদপে যে বস্তুগুলি আকাঙ্ক্ষা করে সেগুলি তার আকাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে। মানুষ খুব কম সময়ের মধ্যে ধনী হতে চায়। সেটি কোন অসাধু কর্ম অবলম্বিত পথের সঙ্গে জড়িত হতে পারে। সেটি তাহলে আকাঙ্ক্ষিত? আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম এই দুইএর মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্বই মানুষকে আকাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিতর মধ্যে তুলনামূলক বিচারের দিকে চালিত করে।

১.১১.১ মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার অর্থ (Meaning of Value Education)

শিক্ষার্থীর চালচলনের ভাব, আবেগ এবং চারিত্রিক উন্নতিকামী সুপরিকল্পিত শিক্ষামূলক পদ্ধতিটিকে মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা বলা যায়। ব্যক্তিত্ব উন্নতিমুখী বৈশিষ্ট্যগুলি বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত, সামাজিক, আদর্শগত, সৌন্দর্য সংক্রান্ত এবং আধ্যাত্মিকতা এটির অন্তর্গত। মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার মাত্রাগুলিকে সমগ্র পাঠ্য সূচিতে একত্রীকরণ করা হয়েছে। কোনটি সঠিক, কোনটি ভাল, কোনটি সুন্দর এগুলির সংবেদনশীলতা এবং সচেতনতার উন্নতি সংক্রান্ত এটি একটি ব্যাপক পদ্ধতি। জ্ঞানলাভ করা, অনুভব করা এবং কার্য করা এই মানব মনোবৃত্তিগুলি পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত। সমালোচনামূলক চিন্তা, যুক্তিসংগত পছন্দ ও কার্য এগুলির উন্নতির উপর শিক্ষার এই পদ্ধতিটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কোনটি করণীয় এবং কোনটি করণীয় নয় সেটি শিক্ষার্থীর উপর আরোপ না করে এটি তার স্বশাসনের মর্যাদা দেয়।

১.১১.২ মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum of Value Education)

নির্দ্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় পাঠ্যের পরীক্ষা নেওয়া হয় এমন একটি কোর্স বা বিষয় হিসাবে মূল্যসমৃদ্ধ শিক্ষাকে কেবলমাত্র দেখা সঠিক নয়। পাঠক্রমের অংশগুলি একত্রীকরণও একটি অধিকতর ভাল প্রস্তাবনা। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে এটির বিষয়সূচীর প্রস্তাবনা করা যেতে পারে— ব্যক্তিগত এবং সামাজিক। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্রে স্থিতি করিয়ে ভাবতে পারি সেই মূল্যগুলিকে যেগুলি ঘটনাচক্রে তাকে একটি সৎ ব্যক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারে। একই সাথে একটি কেন্দ্রস্থিত সমাজকে যে মূল্যগুলি একটি ভাল সমাজে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারে। এইভাবে সেই শিক্ষার মাধ্যমে

প্রকৃত মূল্যগুলিকে বর্দ্ধিত করতে আমরা ইচ্ছা করি যে শিক্ষা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ধারার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সব শিক্ষাই মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার সমগোত্রীয় কেননা সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষা একজন ব্যক্তি বিশেষের সর্বতোভাবে উন্নতি। পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রম, ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ এগুলির মধ্য দিয়ে মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা বার হয়ে আসে।

১.১১.৩ শিক্ষকের ভূমিকা (Role of the Teacher)

মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার সঙ্গে কোন শিক্ষকের এমন আচরণ করা উচিত নয় যে এটি তার কোন পেশাগত কার্যকলাপের পরিবেশ বহির্ভূত। শিক্ষকের বোধগম্য হওয়া উচিত যে বিদ্যালয়ের সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ যেমন শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক কার্যকলাপ এবং সহ-পাঠক্রম কার্যকলাপ এর মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতভাবে মূল্য অর্জন চলতে থাকে। বিদ্যালয়ের অজ্ঞাত কার্যকলাপ ও সাধারণ পারিপার্শ্বিক প্রভাবও মূল্য প্রেরণ করে। দুরকম ভাবে শিক্ষককে তার চূড়ান্ত ভূমিকাটি পালন করতে হয়— প্রথমটি মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষার বার্তা সরবরাহকারী হিসাবে এবং দ্বিতীয়টি বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক প্রভাবের প্রভাবকারী হিসাবে।

সুতরাং শিক্ষকের উচিত শিক্ষকতা পেশাটির নীতি ও সর্বোচ্চ মান অনুসারে আচার আচরণ বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে এটি মূল্য ও আদর্শের সহায়ক বিদ্যালয় উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

১.১২ সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসন (সি. বি. আর) (C.B.R.)

WHO বর্ণিত সি. বি. আর সমাজস্তরে উন্নতি সাধনের উপায় যেটি সমাজের সংগতির উপর গঠন করতে এবং ব্যবহার করতে বিজড়িত। দুর্বল বা অঙ্গ নষ্ট হয়েছে এমন মানুষ, অক্ষম ও পঙ্গু মানুষ এবং তাদের পরিবার সহ সমাজ সামগ্রিক ভাবে এটির অন্তর্গত।

'CBR', as defined by WHo, 'involves measures taken at the community level to use and build on the resources of the community, including the impaired, disabled and the handicapped persons themselves, their families and their communities as a whole.'

ILO-র মতানুযায়ী পুনর্বাসন, চিকিৎসা, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং বৃত্তিমূলক পরিমাপের প্রশিক্ষণ অথবা পুনঃপ্রশিক্ষণের জন্য ব্যক্তির কার্যকরী ক্ষমতার যতটা সম্ভব সংযুক্ত ও সমন্বিত ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

According to ILO, "Rehabilitation involves the combined and co-ordinated use of medical, social, educational and vocational measures for training or retraining the indvidual to the highest possible level of functional ability."

১.১৩ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- শিক্ষা একটি সুন্দর সুপরিকল্পিত পদ্ধতি। এটি জীবনব্যাপী পদ্ধতিও।
- পদ্ধতি হল যেখানে তার উপাদান বা অংশগুলির সমন্বয় ঘটে এমনভাবে যাতে একটি সামগ্রিকতা গঠিত

হয়।

- তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি হল—

  (ক) প্রচলিত পদ্ধতি

  (খ) ব্যতিক্রমী পদ্ধতি

  (গ) বিধিমুক্ত পদ্ধতি

- প্রচলিত পদ্ধতিটি কঠোর। এটির নির্দিষ্ট শিক্ষার স্থান আছে, এটি নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করে এবং সার্টিফিকেট, ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা যোগ্যতাগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়।
- ব্যতিক্রমী পদ্ধতিটিকে, প্রচলিত পদ্ধতির আনুষঙ্গিক পরিপূরকও বলা যায়।
- বিধিমুক্ত পদ্ধতিটি প্রচলিত পদ্ধতির পরিকাঠামোর বহির্ভূত সুন্দর পরিকল্পিত শিক্ষামূলক কার্যকলাপ।
- দূর সঞ্চারী পদ্ধতি প্রকাশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে শারীরিক দূরত্ব।
- মুক্তধারা শিক্ষা প্রকাশ করে স্থান সংক্রান্ত, সময় সংক্রান্ত, পদ্ধতি এবং সাধারণ অবরোধগুলি থেকে মুক্তি।
- মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা, নিয়মিত পাঠক্রম অজ্ঞাত পাঠক্রম সহযোগী পাঠক্রম এগুলির মধ্যে প্রবেশ করে বার হয়ে আসে এবং মূল্য ও আদর্শের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের প্রকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি করে।
- দূরসঞ্চারী পদ্ধতি বিশেষ শিক্ষার অধিকতর ভাল সুযোগের প্রস্তাবনা দেয়।

১.১৪ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত পদগুলির সংজ্ঞা/অর্থ নির্দেশ করুন

(ক) শিক্ষা, (খ) পদ্ধতি, (গ) বিধিমুক্ত শিক্ষা

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

(ক) প্রচলিত, ব্যতিক্রমী এবং বিধিমুক্ত শিক্ষা

(খ) বিধিমুক্ত, দূরসঞ্চারী এবং মুক্তধারা শিক্ষা

৩। বিধিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন উপাদানগুলি ক কি?

৪। বিশেষ শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয় সেগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন।

৫। মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা অবহিত করাতে কেমন করে শিক্ষক সাহায্য করতে পারেন?

১.১৫ বাড়ীর কাজ (Assignment)

আপনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলি বিধিমুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে দূরসঞ্চারী শিক্ষা/ডাকযোগে। অনুষ্ঠানগুলির দোষগুণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলি ঐগুলি সংঘটিত করতে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলির তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন এবং উন্নতিকরণের পন্থার ইঙ্গিত দিন।

১.১৬ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion Classification)

এই এককটি পাঠ করার পর আপনার কোন বিষয় সম্বন্ধে আরও আলোচনা করার এবং অন্যগুলির ব্যাখ্যাকরণের ইচ্ছা হতে পারে নীচের স্থানে বিষয়গুলি লিখুন।

১.১৬.১ আলোচনা সূত্র (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

১.১৬.২ ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

১.১৭ উৎস

1. Pandy R.S. (1988)–Principles of Education, Vinod Pustak Mandir, Agra.
2. Gupta N.L (1986)–Value Education : Theory and Practice, Kriskhna Brothers, Ajmir.
3. Singh. R. P. (1987)–Non formal Education: An aldterative approach, Strling (P) Ltd. New Delhi.
4. Sharma A. R. (1995)–Educational Technology, Vinod Pustak Mandir, Agra.
5. Swapna Barah (Ed) (1987)–Distance Education, Amar Prakashan, Delhi.
6. Paranaji S (Ed 1984)– DistanceEducation. Sterling Publishers (P) Ltd. New Delhi.
7. Seshadri C. *et. al* (Ed) (1992)–Education in Values : A Source Book, NCERT, New Delhi.

একক ২ ❑ শিক্ষামূলক সংস্থা সমূহ (Educational Agencies)

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ গৃহ

২.৩.১ কার্যকলাপ

২.৪ বিদ্যালয়

২.৪.১ কার্যকলাপ

২.৪.২ গৃহ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক

২.৫ লোকসমাজ

২.৫.১. শিক্ষার্থী

২.৫.২ গৃহ, বিদ্যালয় এবং লোক সমাজের মধ্যে সম্পর্ক

২.৬ জনসংযোগ মাধ্যম

২.৬.১ শিক্ষার পরিশিষ্ট হিসাবে জনসংযোগ মাধ্যম

২.৬.২ শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে জনসংযোগ মাধ্যম

২.৬.৩ কার্যকলাপ

২.৭. সি.এ.বি.ই

২.৭.১ কার্যকলাপ

২.৭.২ সাংগঠনিক কাঠামো

২.৮ এন.সি.ই. আর.টি

২.৮.১ কার্যকলাপ

২.৮.২ উপাদান সমূহ

২.৯ এন.আই.ই.পি.এ

২.৯.১ উদ্দেশ্য

২.৯.২ কার্যকলাপ

২.৯.৩ উল্লেখযোগ্য কৃতিসমূহ

২.১০ এন.সি.টি.ই

২.১০.১ উদ্দেশ্য

২.১১. আর.সি.আই

২.১১.১ উদ্দেশ্য

২.১১.২ কার্যকলাপ

২.১২. ইউনেসকো

২.১২.১ উদ্দেশ্য

২.১২.২ কার্যকলাপ

২.১২.৩ ইউনেসকো এবং শিক্ষা

১.১৩ ইউনিসেফ

২.১৩.১ লক্ষ্য

২.১৩.২ শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইউনিসেফের কর্মসূচি

২.১৪ ইউ.এন.এফ.পি.এ

২.১৪.১ উদ্দেশ্য

২.১৪.২ কার্যকলাপ

২.১৪.৩ উল্লেখযোগ্য কৃতিসমূহ

২.১৫ ইউ.এন.ই.পি

২.১৫.১ উদ্দেশ্য

২.১৫.২ কার্যকলাপ

২.১৬. অ্যাকশন এইড

২.১৬.১ উদ্দেশ্য

২.১৬.২ কার্যকলাপ

২.১৬.৩ উল্লেখযোগ্য কৃতিসমূহ

২.১৭. ডব্লু. এইচ. ও (WHO)

২.১৭.১ উদ্দেশ্য

২.১৭.২ কার্যকলাপ

২.১৭.৩ উল্লেখযোগ্য কৃতিসমূহ

২.১৭.৪ ভিশন 2050

২.১৮ প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা এবং সুবিধাদান

২.১৮.১ যোগাযোগের জন্য মূল সুপারিশসমূহ

২.১৯ এককের সারাংশ

২.২০ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.২১ বাড়ীর কাজ

২.২২ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.২২.১ আলোচনার বিষয়

২.২২.২ ব্যাখ্যাকরণের বিষয়

২.২৩ উৎস

২.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

পূর্ববর্তী এককে আমরা আলোচনা করেছি যে শিক্ষা একটি উৎপাদন আবার এটি একটি প্রক্রিয়া এবং এইগুলির সমন্বয়ে যে পদ্ধতি গঠিত হয় সেটিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন প্রচলিত, প্রথাবহির্ভূত এবং বিধিমুক্ত। মুক্তধারা শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষার জন্য এবং যে সব ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন তাদের জন্য দূরসঞ্চারী পদ্ধতি— এগুলি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে।

শিক্ষার অসংখ্য সংজ্ঞার মধ্যে একটি হল 'একটি শিশুর সর্বোতোভাবে উন্নতিই শিক্ষা'। 'সর্বোতোভাবে' এটিই মূল কথা। শারীরিক, বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক, আদর্শগত এবং আধ্যাত্মকতা শিশুর উন্নতির এই দিকগুলি এটির অন্তর্গত। যেহেতু মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী তাই আমরা শিশুর উন্নতি এবং তার পারিপার্শ্বিক সমাজের উন্নতি এই দুটিকে স্বতন্ত্র করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে শিশুর উন্নতি এবং যার অর্থ শিক্ষা সেটি ঘটে শিশু সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য।

আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, যে পূর্ববর্তী এককে শিক্ষার ব্যতিক্রমী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আমরা সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা করেছিলাম যে একটি জীবনব্যাপী পদ্ধতি। শিশুর শিক্ষা শুরু হয় ঠিক তার জন্মের পরমুহূর্ত থেকে যখন সে মায়ের মুখোমুখি হয় তারপরে তার পরিবারের। শিশু প্রথম ৪/৫ বছর বয়স পর্যন্ত গৃহে মা এবং পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটায়। এটি তার গৃহ— যেখানে শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। যখন সে কথা বলতে শেখে তখন তার যোগাযোগ করার দক্ষতার এবং যখন সে খেলা করে তখন সামাজিকতার দক্ষতার উন্নতি হয়। যখন সে গল্পকাহিনী শোনে তখন সে তার অর্থ বোঝে। এইভাবে গৃহকে শিক্ষার প্রথম সংস্থা বলা যায়।

শিশুর শিক্ষার অপর উৎস বা সংস্থা হল বিদ্যালয়। শিক্ষক, সহপাঠী, খেলার সাথী এদের নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সমাজটির সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়া হয় বিদ্যালয়ে এবং টিভি সিনেমা ইত্যাদি জনসংযোগ মূলক মাধ্যমে। গৃহ, বিদ্যালয়, পারিপার্শ্বিক লোক সমাজ এবং জনসংযোগ মাধ্যম যেগুলির সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ এবং যেগুলি তার চিন্তাশক্তি ও অন্যান্য আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলিকে শিক্ষার সংস্থা বলে।

এই এককটিতে আমরা জানব বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ এবং শিশুর উন্নতির স্বার্থে সেগুলির ভূমিকা।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে আপনি সক্ষম হবেন:

- গৃহ, বিদ্যালয়, পারিপার্শ্বিক লোকসমাজ ও জনসংযোগমূলক মাধ্যমগুলির কার্যকলাপ বলতে।
- শিক্ষার সংস্থাগুলি যেমন গৃহ, বিদ্যালয়, পারিপার্শ্বিক লোকসমাজ, জনসংযোগ মাধ্যম এগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে।
- বিধিমুক্ত দূরসঞ্চারী ও মুক্তধারা শিক্ষাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে
- মুক্তধারা শিক্ষা, দূরসঞ্চারী শিক্ষা, মূল্য সমৃদ্ধ শিক্ষা ও সি বি আর (সমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসন) বর্ণনা করতে।

২.৩ গৃহ (The Home)

গৃহ শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। এই স্থানে তার জন্ম এবং এখানে সে শেখে কেমন করে দাঁড়াতে হয়, হাঁটতে হয়, কথা বলতে হয় এবং যত্নবান হতে হয়। পাঠ্য পুস্তক, ব্ল্যাকবোর্ড বা শিক্ষামূলক ভাষণের সহায়তায় তাকে গৃহে শিক্ষা দেওয়া হয় না। সে এখানে দৈনন্দিন কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিবাজীর মা জিজাবাঈ তার পুত্রকে দেশপ্রেমবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মা পুতলী বাঈ-এর কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী আদর্শগত ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বিদ্যালয় শিক্ষা ছাড়াও গৃহ শিশুকে যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করে। গৃহে বন্ধুত্বপূর্ণ অনুকূল পরিবেশের অভাবে শিশু যথাযথভাবে উন্নতি করতে পারে না। অপরদিকে এটি বলা নিষ্প্রয়োজন যে উপযোগী পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই পার্থক্য সহজেই বোধগম্য হয়।

মাজিনি লক্ষ্য করেছেন যে নাগরিক হিসেবে শিশুর প্রথম প্রশিক্ষণ হয় বাবার স্নেহে ও মায়ের কোলে। মন্টেসরী তার বিদ্যালয়কে বলেছেন শিশুদের গৃহ। কমেনিয়াস বলেন যে শিশুর সকল শিক্ষার কেন্দ্র হল গৃহ। ফ্রয়েবল বলেছেন যে শিক্ষা স্বাভাবিক ও ফলপ্রদ হয় গৃহেই। পেস্টালজী অনুভব করেছিলেন যে গৃহই হল শিশুর প্রথম বিদ্যালয়।

২.৩.১ কার্যকলাপ (Functions)

শিশুর প্রথম বিদ্যালয় হিসাবে গৃহে যে কার্যকলাপগুলি সম্পাদিত হয়:

(ক) সামাজিক অনুষ্ঠান—শিশুর কাছে গৃহই প্রথম সমাজ। এখানে সে নিজের অধিকার এবং পরিবারের অপর সদস্যদের অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে শেখে।

(খ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—গৃহ শিশুকে তার সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করে। পরম্পরাগত সংস্কৃতি শিশুর উপর আরোপিত হয়।

(গ) ধর্মীয় অনুষ্ঠান—শিশু তার ধর্মীয় শিক্ষা সর্বপ্রথম গ্রহণ করে গৃহে।

(ঘ) আদর্শগত অনুষ্ঠান—আদর্শগত মূল্যায়ন অর্থাৎ কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ এটি গৃহেই শিশু শিক্ষালাভ করে।

(ঙ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান—জ্ঞানের উন্নতি, দক্ষতা, মনোভাব, মূল্য এবং আচার-আচরণ এগুলি শিশুর সর্বোতভাবে উন্নতির অন্তর্গত। পরিবেশের গুণে গৃহই শিক্ষা শুরুর উপযুক্ত স্থান। শিক্ষার জন্য শিশুকে প্রস্তুত করতে গৃহে প্রথম শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যভাবে বললে উপযুক্ত গৃহ শিশুর মনে শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ এবং অভিপ্রায় সৃষ্টি করে।

শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্নতি শুরু হয় গৃহে। শিশু যে গৃহ থেকে আসে সেটির আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে তার আগ্রহ, বাচনভঙ্গি, আদর্শগত মনোভাব ইত্যাদি।

শিক্ষা সংস্থা হিসাবে গৃহে নিম্নলিখিত কার্যকলাপগুলি সম্পাদিত হয় :

১। শারীরিক গঠন-সুস্থতা, মানসিক এবং আবেগজনিত সুস্থতা।

২। স্ত্রী-পুরুষ সমতা, সহযোগিতা, ত্যাগ ইত্যাদি সামাজিক অনুভূতিগুলির উন্নতি সাধন।

৩। আত্মমর্যাদা এবং সকলকে সম্মান করার বোধ গড়ে তোলা।

৪। সৃষ্টিমূলক দক্ষতা বাড়ানো।

৫। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

২.৪ বিদ্যালয় (The School)

শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটি গৃহ একক ভাবে করতে পারে না। গৃহের খোলামেলা পরিবেশ বীজ থেকে চারাগাছে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ শৈশবস্থায় শিশুকে হয়তো শিক্ষা দিতে পারে কিন্তু চারাগাছ থেকে বৃক্ষে পরিণত হওয়া অর্থাৎ শৈশবস্থার পর থেকে নিখুঁত সুপরিকল্পিত মানুষ হতে বিদ্যালয়ের কঠোরতর ও প্রচলিত আবহাওয়ার প্রয়োজন।

শিশু যে কোন গৃহ থেকেই আসুক না কেন বিদ্যালয় প্রত্যেককে একই ধরনের আবহাওয়া এবং উন্নতির জন্য সমান সুযোগের প্রস্তাবনা দেয়। প্রতি বিদ্যালয়কে বলা যায় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ তাই বিদ্যালয় শিশুর সমাজ সম্বন্ধীয় উন্নতি যথেষ্ট করতে পারে। একইভাবে প্রতি বিদ্যালয়েরই নিজস্ব ঐতিহ্য, নিয়মকানুন এবং সাধারণ শিক্ষামূলক আবহাওয়া আছে। সেই কারণে অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ গর্ব করে বিদ্যালয়কে সুপারিশ করেন, গৃহকে নয়। গৃহে পিতামাতার সান্নিধ্যে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিশু নিজেকে অভিন্নরূপে গণ্য করে। শিক্ষকের গুণাগুণ শিশুকে প্রভাবিত করে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসা সহপাঠীদের ও খেলার সাথীদের শিশু দেখে এবং তাদের মধ্যে আদান প্রদান ঘটে। বয়স্কদের প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা এবং কনিষ্ঠদের প্রতি রাগ, ভালবাসা এগুলি শিশুর মনে গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং স্পোর্টস বা খেলাধূলায় প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ের শিশুর উপর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়ে তার সহপাঠীদের এবং খেলার সাথীদের। যাদের সঙ্গে খেলাধূলা করে অথবা যারা দুষ্টুমিকে প্রশ্রয় দেয় তাদের সঙ্গে শিশুর দল গঠন করার প্রবণতা দেখা যায়। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে এবং দলের মধ্যে অবদমিত করা বা নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রতিযোগিতা থাকে। নেতা হিসাবে বা জাঁকজমক প্রদর্শনকারী হিসাবে বা কৌতুককারী হিসাবে নিজের ক্ষমতা এবং সামর্থ অনুযায়ী দলের মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়।

২.৪.১ কার্যকলাপ (Functions)

যেহেতু শিশুর উন্নতিমূলক পর্যায়ের বড় অংশ বিদ্যালয় অধিকার করে সেই কারণে এটি নিম্নলিখিত কার্য্যকলাপগুলি সম্পাদন করে :

(ক) সামাজিক অনুষ্ঠান—বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রায়তন সমাজ শিশুর সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন নেতৃত্ব দেবার গুণ, নিয়মশৃঙ্খলা, সম্মান এবং সমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(খ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—বিদ্যালয় ব্যাপকভাবে শিশুর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ভূত করে। এখানে শিশুর পরিচয় হয় তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি এবং গৃহের নানাবিধ আবহাওয়ার সামগ্রিক প্রভাব এর সাথে। জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা ও পরম্পরাগত সাংস্কৃতক ঐতিহ্য প্রকাশিত হয় শিশুর বিশেষ গুণসম্বলিত দক্ষতার মাধ্যমে।

(গ) আদর্শগত অনুষ্ঠান—বিদ্যালয়ের সাধারণ আবহাওয়ার সাথে বারবার পাঠক্রম এবং সহ-পাঠক্রম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি শিশুর মনে মূল্যবোধ ও নৈতিকবোধ জাগিয়ে তোলে।

(ঘ) যোগ্যতা উন্নতি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান—বিদ্যালয়ে শিশু জন্মগত দক্ষতা ও সামাজিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত দক্ষতাগুলি শিক্ষা করে এবং অভ্যাস করে। পাঠ করা, লেখার ক্ষমতা সংক্রান্ত জ্ঞান, গাণিতিক জ্ঞান থেকে শুরু করে শিশু ক্রমশ আরও অনেক ধরনের দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করে যার মূল্য যারা জীবনব্যাপী থাকে।

২.৪.১ গৃহ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship Between Home and School)

শিশুকে শিক্ষিত করা এই সাধারণ লক্ষ্যটি গৃহ এবং বিদ্যালয় উভয়েরই থাকার জন্য বলা যায় তারা একটি অপরিবর্তনীয় পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। গৃহের পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যালয় আশা করে। শিশুর প্রয়োজন গৃহের নির্দেশ উপদেশ বিশেষত বিদ্যালয় সংক্রান্ত যেগুলি করণীয় বা প্রদর্শন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে। গৃহের আবহাওয়া বিদ্যালয়ে শিশুর সাফল্যকে প্রভাবিত করে।

২.৫ লোকসমাজ (The Community)

সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সম পক্ষপাতিত্বে অঙ্গীকারবদ্ধ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারি জনগণকে বলা হয় লোকসমাজ। এই অঙ্গীকার এবং একতাবোধই সমাজ সংশ্লিষ্ট জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে লোকসমাজকে দায়িত্বশীল করে।

২.৫.১ কার্যকলাপ (Functions)

বিদ্যালয়ের তুলনায় লোকসমাজ অধিকতর বড় সামাজিক ক্ষেত্র হওয়ায় এটির কার্যকলাপ বিভিন্ন প্রকারে এবং ব্যাপক আকারে সম্পাদত হয়:

(ক) নির্দেশগত অনুষ্ঠান—শিক্ষার লক্ষ্য বা গতি স্থির করে লোকসমাজ। লোক সমাজের প্রয়োজন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিদ্যালয়ের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।

(খ) সমবায়ী অনুষ্ঠান—শিক্ষা খাতে অর্থের যোগান দেওয়া লোকসমাজের দায়িত্ব। লোকসমাজ বিশ্বস্ত প্রশাসক, শিক্ষক নির্বাচনে সহযোগিতা করে এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

(গ) ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান— বিদ্যালয়ের বাইরে অনেক সংস্থা আছে যেগুলির শিশুর শিক্ষায় অবদান আছে। গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, মিউজিয়াম, থিয়েটার সেন্টার ঐ সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যদি লোকসমাজ পুস্তকাদি পাঠ ইত্যাদির সুব্যবস্থা না করে তাহলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না. যখন শিশু শিল্প সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ সুবিধা পায় তখন তার শিক্ষার আরও উন্নতি হয়.

(ঘ) রাজনৈতিক অনুষ্ঠান— লোক সমাজের রাজনৈতিক আদর্শ শিক্ষার নীতি এবং অনুষ্ঠানের উপর প্রতিফলিত হয়। গণতান্ত্রিক চীন, মৌলবাদী আফগানিস্থান এবং ধনতান্ত্রিক আমেরিকার রাজনৈতিক চিন্তাগুলি তুলনা করুন। তাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি তাদের রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়।

(ঙ) অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান—সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ব্যতিরেকে শিল্প, কর্ম এবং পেশা লোকসমাজে উদ্ভূত হয়। পরিবারে কিছু কর্ম-উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য লোকসমাজের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। এইভাবে অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য লোকসমাজে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে।

(চ) সামাজিক অনুষ্ঠান— লোকসমাজে যারা বুদ্ধিমান তারা শিশুদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। দায়িত্বশীল নাগরিকের সামগ্রিক সচেতনতা আছে। শিশুকে সমাজ সচেতন করে তোলার দায়িত্ব লোকসমাজের। সমাজ সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকার সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়।

(ছ) আদর্শগত অনুষ্ঠান—অধিকাংশ অনুন্নত লোকসমাজের আদিম আদর্শগুলি তাদের পরবর্তী প্রজন্মের উপর আরোপিত হয়। নিজেদের সুবিধার স্বার্থে শিশুর চারিত্রিক উন্নতির জন্য লোকসমাজ পরিবেশ গঠন করে।

২.৫.২ গৃহ, বিদ্যালয় এবং লোকসমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship Between Home, School and Community)

যদি আপনি মনে করেন গৃহ, বিদ্যালয় এবং লোকসমাজ জাতি ও সমাজ সমন্বয়ে একটি বৃহৎ ব্যবস্থার অংশ তাহলেই আপনার কাছে এদের মধ্যে যে সম্পর্কটি আছে সেটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্ষুদ্রতম এককটি গৃহ এবং লোকসমাজ বৃহত্তম। উভয়েরই একটি লক্ষ্য— সেটি হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া। পরিবারের ভাল সদস্যরা পরিবারের উপকারী, ভাল শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ভাল নাগরিক গঠন করে একটি উন্নততর লোকসমাজ।

২.৬ জনসংযোগ মাধ্যম (The Mass Media)

সমাজ সংশ্লিষ্ট তথ্যবলির মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ আগুন আবিষ্কার করে এবং তার ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত হয় এই তথ্যের সঙ্গে তুলনা করুন।

বিগত শতবর্ষের প্রযুক্তিগত প্রগতির তথ্যাবলির মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেগুলির প্রভাব সামাজিক, ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

মাধ্যমের অর্থ সংবাদ তথ্য প্রচারের একটি ব্যবস্থা। যখন বিপুল সংখ্যক জনগণের মধ্যে বিবেচনা করা হয় তখন এটিকে জনসংযোগ মাধ্যম বলা হয়। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশন যেগুলি জনগণকে প্রভাবিত করে সেগুলি যদি আকাঙ্ক্ষিত কোন নির্দিষ্ট দিকে হয় তখন সেটিকে শিক্ষার ধরন বলা যায়।

২.৬.১ শিক্ষার পরিশিষ্ট হিসাবে জনসংযোগ মাধ্যম (Mass Media as a Supplement)

সমাজের চরিত্র, লক্ষ্যপথ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনসংযোগ মাধ্যম প্রতিফলিত করে। এইভাবে এটি সমাজের শিক্ষার অভাব পূরণ করে। জনসংযোগ মাধ্যম শুধুমাত্র তথ্যাবলী প্রচারই করে না এটিকে মানুষের চারিত্রিক গঠন সুদৃঢ় করতে বিচক্ষণভাবে ব্যবহার করা হয়. এটি নিয়মিতভাবে সাম্প্রতিক তথ্যাবলী প্রচার করে থাকে। শক্তিশালী জনসংযোগ মাধ্যম শক্তিশালী সমাজ সৃষ্টি করে কারণ তথ্য এবং শক্তি সমার্থক।

২.৬.২ শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে জনসংযোগ মাধ্যম (Mass Media as a System of Education)

জনসংযোগ মাধ্যম শিক্ষার একটি বিকল্প পদ্ধতির বন্দোবস্তও করতে পারে। সেটি কেবলমাত্র জনগণকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকরী না করে বিভিন্ন প্রকার নতুন কৌশল অবলম্বন করে জনসংযোগ মাধ্যম সমাজে শিক্ষা প্রচার করে। একটি শিক্ষামূলক ভিডিওর প্রভাবের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠ-এর তুলনা করুন।

জনসংযোগ মাধ্যম মাস মিডিয়া এবং মাল্টি মিডিয়া সময় ও স্থানের সীমারেখা অতিক্রম করে। একটি চারা গাছের জীবনচক্র মাত্র তিনমিনিটের টুকরো ভিডিওতে দেখা যেতে পারে। গ্রহনক্ষত্রের জটিল গতিপথ কমপিউটারের সাহায্যে অ্যানিমেশন ভিডিওর মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। প্রচুর পুস্তকাদির সাহায্য না নিয়ে কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি সহজে কমপিউটার-এর ডাটাবেস থেকে জানা যেতে পারে।

২.৬.৩ কার্যকলাপ (Functions)

(ক) সেতুবন্ধনকারী—শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সময় ও স্থানের ফাঁকটুকুর উপর জনসংযোগ সেতুর মত। স্যাটেলাইট টিভির দৌলতে একটি অতি দূর গ্রামের শিক্ষার্থী মেট্রোপলিটন শহরে বসে একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য পেতে পারে। সে উত্তরপত্রগুলি ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেল বা ডাক মারফত শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে। এইভাবে মাধ্যম শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সময় স্থানের উপর সেতুবন্ধন করে।

(খ) উপাদানের মান—উচ্চমানের আধুনিক এবং কার্যকরী উপাদান শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া জনসংযোগ মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক কার্যকারিতা। তথ্যের পরিবর্তন সময়ের সাথে সাথে হতে থাকে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্য পুস্তকে সময়মাফিক প্রকাশ করা সম্ভব হয় না ; জনসংযোগ মাধ্যম নাগালের মধ্যে একটি বিশ্বস্ত তথ্যবলীর উৎস বলা যায়। মাল্টি মিডিয়ার সাহায্যে উপাদানগুলির পরিবর্দ্ধন করা যেতে পারে।

(গ) সামাজিক অনুষ্ঠান—জন সংযোগ মাধ্যম ব্যাপকভাবে এবং অত্যন্ত কার্যকরীভাবে সমাজকে প্রবাবিত করে : এমন একটি সমাজ সৃষ্টি করে যে সমাজ তার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত। এইভাবে জনসংযোগ মাধ্যমকে সমাজ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয় :

(ঘ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা সমাজকে সংস্কৃতি এবং পরম্পরা ঐতিহ্যের অনুরাগী করে তুলতে নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তার শীর্ষে বলা যায়। আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কার্যকরীভাবে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

(ঙ) আদর্শগত অনুষ্ঠান— দেখা গেছে প্ররোচনার পরিবর্তে আত্মবুদ্ধির দ্বারাই মূল্যবোধ মনের মধ্যে গ্রোথিত হয়। জনসংযোগ মাধ্যম নীতি ও আদর্শগত ভিতটি সুদৃঢ় করে কারণ এটি ভাষণ দেয় না কর্ম করে।

২.৭ সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ্ এডুকেশন (CABE)

সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশন (CABE) নামে প্রাচীনতম সর্বোচ্চ বোর্ডটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে শিক্ষাসংক্রান্ত উপদেশাবলী দিয়ে থাকে। বর্তমান সংকট সময়ে দেশে উল্লেখযোগ্য অর্থ সামাজিক ও সামাজিক সংস্কৃতির উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডল থাকা উচিত এই ধারণাগত প্রস্তাবটি ১৯১৭-১৯ সময়কালের মধ্যে কলকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন প্রথম উপস্থাপনা করেন। শিক্ষা মূলত রাজ্যের বিষয় হিসাবে স্থিরীকৃত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯১৯ ধারা অনুসারে। এই ধারা অনুযায়ী শিক্ষার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ সীমিত রাখা হয়। এই ধারা ভারত সরকারের ভূমিকার পরিবর্তন করে শাসক থেকে উপদেষ্টা প্রধান।

সেই অনুসারে ১৯২০ সালে ভারত সরকারের এডুকেশন কমিশনের সভাপতিত্বের অধীনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংক্রান্ত উপদেষ্টা মণ্ডল গঠিত হয়।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ১৯২৩ সালে আর্থিক সঙ্কট হেতু মণ্ডলটির অবসান ঘটে।

পরবর্ত্তী বারো বছরের মধ্যে ভারত সরকারকে শিক্ষাসংক্রান্ত উপদেশ দেবার জন্য কোন কেন্দ্রীয় মণ্ডল ছিল না। একটি অনুতাপ বোধ গড়ে উঠতে শুরু করে বিশেষত হার্টগ কমিকটির রিপোর্টের পরে (১৯২৮)। ফলস্বরূপ ৪ আগস্ট ১৯৩৫ সালে পুনরায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংক্রান্ত উপদেষ্টামণ্ডল চালু হয়। ১৯শে অক্টোবর ১৯৯০ সালে এটি পুনরায় সাংবিধানিকভাবে গঠিত হয়।

২.১ কার্যকলাপ (Functions)

CABE-র কার্যকলাপগুলি হল—

(ক) সময় সময় শিক্ষার প্রগতি পুনর্বিবেচনা করা।

(খ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার কর্তৃক আরোপিত রীতি ও বিস্তারগুলির গুণাগুণ বিচার করা এবং সেই সংক্রান্ত যথাযথ উপদেশ দেওয়া।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার/আঞ্চলিক প্রশাসন, শিক্ষার উন্নয়নমূলক সরকারি বা বেসরকারি প্রতিনিধিত্বকারি সংস্থা এগুলির মধ্যে শিক্ষানীতিগত সমন্বয় সাধনে উপদেশ দেওয়া।

(ঘ) কেন্দ্রীয়, রাজ্য সরকার, রাজ্য/আঞ্চলিক কর্তৃক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সুপারিশ করা, উপদেশ দেওয়া।

কিভাবে CABE এই কার্যকলাপগুলি কার্যকর করে? এই ব্যাপারে বোর্ড পারে :

১। সরকারি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষের কাছে তথ্যাবলী চাইতে।

২। CABE সদস্যদের নিয়ে বা প্রয়োজন সাপেক্ষে অন্যদের নিয়ে দল বা কমিটি গঠন করতে।

৩। বোর্ড বা তার কমিটি/গ্রুপের প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়, গবেষণা বা বিশেষ বিষয়ের প্রতিবেদন সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করতে।

২.৭.২ সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational Structure)

হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট-এর সংযোগ (ইউনিয়ন) মন্ত্রী CABE-র চেয়ারম্যান এবং ঐ একই মন্ত্রকের রাজ্যমন্ত্রী এটির ভাইস চেয়ারম্যান। কেন্দ্রীয় সরকারের সাতজন প্রতিনিধি যারা এখানে আছেন :

১। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী (Minister of Information & Broadcasting)

২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী (Minister of Welfare)

৩। রাজ্য শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী (Minister of State for Labour)

৪। রাজ্য বিজ্ঞান কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী (Minister of State for Science & Technology)

৫। স্বাস্থ্য ও পরিসেবা দপ্তরের মন্ত্রী (Minister of Health & Family Technology)

৬। রাজ্য যুবকল্যাণ এবং ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী (Minister of State for Youth Affairs and Sports)

৭। শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়নের সদস্য (Member Education Planning Commission)

CABE-তে রাজ্য সরকার এবং ইউনিয়ন টেরিটোরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দপ্তরের শিক্ষাসংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ দপ্তরগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন অথবা অবসরপ্রাপ্ত রাজ্যপাল।

৪ জন লোকসভার এবং ২ জন রাজ্যসভার সদস্য সহ দশজন নির্বাচিত সদস্য আছেন। বাকি যারা তারা হলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইন্ডিয়ান ইউনিভারসিটিজ-এর অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন এর, মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এর এবং সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিন-এর সদস্য।

এছাড়া আর দশজন এক্স অফিসিও (ex-officio) সদস্য আছেন যারা হলেন শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ডিরেক্টর। পরিশেষে, বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রতিনিধি হিসাবে আছেন বত্রিশ জন মনোনীত সদস্য।

২.৮ এন. সি. ই. আর. টি (NCERT)

১৯৬১ সালে ভারত সরকার একটি চূড়ান্ত সংগতি প্রতিষ্ঠান দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশননাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (NCERT) প্রতিষ্ঠা করেন। এটির প্রধান দপ্তর নিউদিল্লিতে এবং সংস্থাটি বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা এবং উপদেশ দিয়ে থাকে।

বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বিদ্যা এবং প্রযুক্তিগত সাহায্যের জন্য নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখে।

১। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, (NIE) নিউদিল্লি

২। সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন্যাল টেকনোলজি (CIET) নিউদিল্লি

৩। পণ্ডিত সুন্দরমলশর্মা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ভোকেশন্যাল এডুকেশন (PSSCIVE) ভুপাল ৪-৭ আজমীর, ভুপাল, ভুবনেশ্বর এবং মাইশোর এই শহরগুলির চারটি রিজিওনাল ইনস্টিটিউটস অফ এডুকেশন (RIEA)

৪। রাজ্য ফিল্ড অ্যাডভাইসারস অফিস।

২.৮.১ কার্যকলাপ (Functions)

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন্যাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং এর প্রধান কার্যকলাপগুলি হল:

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানীতি, অনুক্রম গঠন এবং প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে সহযোগিতা করা।

(খ) প্রয়োজনীয়, গবেষণা, উদ্ভাবনা, পরিকল্পনামূলক মূলকার্য (Pilot projects), ট্রেনিং এবং কার্যের প্রসারণ ইত্যাদির অধিগ্রহণ।

(গ) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

এই কার্যকলাপগুলি সম্পাদন করার জন্য এন সি ই আর টি

- শিক্ষামূলক পাঠ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন ইত্যাদি সংগঠন এবং অধিগ্রহণ করে।
- কার্যের প্রশিক্ষণ প্রাথমিক এবং উচ্চতর পর্যায় পরিচালনা করে।
- প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কার্যের প্রসারণ করে।
- উন্নত শিক্ষামূলক কৌশল এবং অভ্যাসকারি কার্যগুলি সম্পর্কিত প্রচার করে।
- রাজ্য শিক্ষা বিভাগ, ইউনিভারসিটি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে।
- শিক্ষামূলক পুস্তক, পাক্ষিক, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশনা করে।
- বিদ্যাশিক্ষা সংক্রান্ত সব বিষয়ের ধারণা এবং তথ্যাদি সরবরাহ করে।

২.৮.২ উপাদানসমূহ (Constituents)

১। NIE-পাঠক্রমে শিক্ষকতা সংক্রান্ত গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করে, পাঠক্রম এবং অতিরিক্ত বিষয় উপাদানগুলি প্রস্তুত করে, ডাটা সম্বলিত স্কুল শিক্ষার উন্নয়ন, প্রাক বিদ্যাস্তর থেকে উচ্চ বিদ্যাস্তর পর্যন্ত শিক্ষার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদন করে। শিক্ষক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ক মূল ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ সংগঠন, বিদ্যালয় স্তরে পুস্তক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশনা করে।

২। CIET-এটি শিক্ষামূলক মাধ্যম সম্পর্কিত গবেষণা, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, উৎপাদন এবং প্রসারণমূলক কার্য সম্পাদন করে। স্টেট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি (SIETS) কে পুঁথিগত বা প্রযুক্তিগত সাহায্যের বন্দোবস্ত করে।

৩। PSSCIVE-বিদ্যালয় স্তরে পেশাগত শিক্ষামূলক গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করে।

৪। RIES-এর চারটি RIE প্রাক শিক্ষক পর্যায়ে এবং উচ্চ-পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আলোচনাচক্র, ও গবেষণামূলক কার্য সম্পাদন করে।

৫। ফিল্ড অ্যাডভাইসর অফিস—অধিকাংশ রাজধানী শহরস্থিত অফিসগুলি SCERT-এর কর্মসূচি সংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ে শিক্ষাদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে।

২.৯ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NIEPA)

বিল্লিস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NIEPA) একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। নীতি, পরিকল্পনা এবং পরিচালনা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে অনুমোদিত এটি একটি সরকারি পেশাদারি সংস্থা।

১৯৬১-৬২ তে ইউনেসকো রিজিওনাল সেণ্টার ফর এডুকেশনাল প্ল্যানার এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এ এটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এটির পুনর্নামকরণ করা হয় এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ইউনেসকোর সঙ্গে দশ বছরের একটি চুক্তির পর ১৯৭০ সালে ভারত সরকার এটি অধিগ্রহণ করেন এবং পুনরায় নামকরণ করেন ন্যাশনাল স্টাফ কলেজ ফর এডুকেশনাল প্ল্যানারস এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস। ১৯৭৯ এ সংস্থাটির এই নামকরণটি করা হয়।

২.৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুসেশনাল প্ল্যানিং এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর উদ্দেশ্যগুলি:

- শিক্ষাগত পরিকল্পনা ও প্রশাসনের একটি সর্বোৎকৃষ্ট কেন্দ্র হওয়া।
- প্রাক ও চলাকালীন স্তরে কার্যসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সভা, আলোচনাচক্র, সম্মেলন ইত্যাদি সংগঠন করা।
- এই ধরনের সংস্থাগুলির সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ এবং তাদের সাহায্য করা বা সহযোগী হিসাবে কাজ করা।
- আইন প্রণেতা, নীতি প্রণেতা সহ উচ্চপর্যায় ব্যক্তিবর্গের জন্য আলোচনা চক্র অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা।
- ভারতবর্ষ এবং বিদেশে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা এবং প্রশাসন সংক্রান্ত গবেষণাদিতে সাহায্য করা, উন্নতি বিধান করা।

২.৯.২ কার্যকলাপ (Functions)

NIEPA-র প্রধান কার্যকলাপগুলি তালিকা নীচে দেওয়া হল—

(ক) শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির যাঁরা পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করেন তাদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা;

(খ) শিক্ষার পরিকল্পনা এবং প্রশাসন সম্পর্কিত গবেষণা করা।

(গ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উপদেষ্টা নিয়োগ করা।

(ঘ) সাম্প্রতিক জ্ঞান ও তথ্যাবলী প্রচার কার্যালয় হওয়া;

(ঙ) শিক্ষার পরিকল্পনা, প্রশাসন সংক্রান্ত আলোচনাচক্র কর্মশালা ইত্যাদি সংগঠন করা।

(চ) কার্যরত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসক, পরিকল্পক শিক্ষাবিদ তাদের মতাদর্শ এবং ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা পারস্পরিক বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মজলিশ এর আয়োজন করা।

২.৯.৩ উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিসমূহ

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে জাতীয়স্তর পর্যন্ত সমস্ত স্তরে পরিকল্পনা ও প্রশাসনের উপর NIEPA প্রভাব বিস্তার করেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে এটির নিজস্ব একটি ভাবমূর্তি আছে। দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম এশীয় দেশগুলি থেকে, সুদূর পূর্ব থেকে ল্যাটিন আমেরিকা, প্যাসিফিক, প্যাসিফিক, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশ্বের সর্বত্র থেকে বিদেশিরা আসে শিক্ষা গ্রহণ করতে।

২.১০ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন (NCTE)

শিক্ষকদের শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ (NCTE) ১৯৭৩ সালে উপদেষ্টামণ্ডলী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির সম্পাদকীয় দফতরটি NCERT-র অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে এটি প্রশংসনীয় কার্য করেছিল। উপদেষ্টা মণ্ডলী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার ফলে আইনমাফিক কার্যকলাপগুলি যেমন শিক্ষকের শিক্ষার মান স্থিরীকরণ ইত্যাদি করার জন্য সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা এটির ছিল না। নিম্নমানের শিক্ষক শিক্ষার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলি সংগঠনে এটি বাধা দিতে পারত না।

১৯৮৬ সালের শিক্ষার জাতীয় নীতি এবং কর্মসূচি অনুযায়ী ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং ভারতবর্ষে শিক্ষক শিক্ষার পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে দেখাশোনা করার সংস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়।

ফলস্বরূপ, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৩ (নং ৭৩, ১৯৯৩) অনুযায়ী ১৭ই আগস্ট ১৯৯৫ সালে NCTE সংবিধিবিদ্ধ মণ্ডলী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়।

নিউদিল্লিস্থিত NCTE-র প্রধান কার্যলয়টির চারটি আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী সমিতি আছে।

- ইস্টার্ন রিজিওনাল কমিটি, ভুবনেশ্বর
- নর্দার্ন রিজিওনাল কমিটি, জয়পুর
- সাউদার্ন রিজিওনাল কমিটি, বাঙ্গালোর এবং
- ওয়েস্টার্ন রিজিওনাল কমিটি, ভূপাল।

NCTE-র প্রধান কার্যালয়টি 'চেয়ারপার্সন' এবং আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী সমিতিগুলি রিজিওনাল ডিরেক্টর এর অধীনস্থ।

NCTE-র দিল্লিস্থিত কার্যালয়টির এবং চারটি আঞ্চলিক সমিতির প্রত্যেকের দুটি করে বিভাগ আছে। প্রশাসনিক বিভাগটির অধীনের অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং আইনী বিষয়সমূহ এবং শিক্ষাবিষয়ক নীতিগত পরিকল্পনা, পরিচালনা, উদ্ভাবন, গবেষণা, গ্রন্থাগার এবং তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং কার্যসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানাদি এ সমস্তই শিক্ষাবিভাগটির অধীনস্থ।

২.১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

সারা ভারতবর্ষের শিক্ষক শিক্ষার সুসংবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত উন্নয়ন লাভ করাই NCTE-র প্রধান উদ্দেশ্য।

আইন শৃঙ্খলা এবং শিক্ষক শিক্ষা পদ্ধতির মান যথাযথ বজায় রাখাও এটির আরও একটি লক্ষ্য।

তার ওপর যেহেতু NCTE সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেইহেতু শিক্ষক শিক্ষার ব্যাপ্তির সম্পূর্ণটাই এটির অধীনে। বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিকোত্তর স্তর পর্যন্ত এবং অপ্রচলিত শিক্ষা, খণ্ডকালীন শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং দূরসঞ্চারী শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান এবং প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রয়োজনমত প্রস্তুত করাও এটির অন্তর্গত।

২.১১ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (RCI)

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সময় থেকে অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাটি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। জেনারেল অ্যাসেম্বলি অফ্ দ্য ইউনাইটেড নেশন কর্তৃক ১৯৮১ সালটি অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি জনগণকে বোঝানোর এবং তাদের সচেতন করার পক্ষে সুন্দর শুরু ছিল।

অক্ষম ব্যক্তির প্রয়োজনগুলি একত্রীকরণ করে নীচে চারটি উল্লেখ্য দেওয়া হল—

- দয়া নয়, মর্যাদা
- দাতব্য নয়, অধিকার
- নির্ভরতা নয় সমতা
- পৃথকীকরণ নয়, অংশগ্রহণ

RCI-এর নিজস্ব কোন কর্মসূচি নেই। এর জন্য সারা দেশে RCI অনুমোদিত কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। জ্ঞানোন্নয়নে স্বার্থে RCI নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনাচক্র, শিক্ষামূলক আলোচনাচক্রও কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমন্বিত সমিতির সাহায্যে পরিষদটি কার্যকলাপ করে। বিশেষজ্ঞ সমিতিগুলি হল:

- চলৎশক্তিহীনতা
- শ্রবণশক্তিহীনতা
- জড়বুদ্ধি সম্পন্নতা
- এবং দৃষ্টিশক্তি হীনতা সংক্রান্ত
- মূল্যায়ন এবং সক্ষমতা বিবেচনা করা

সর্বাপেক্ষা কম মান বজায় রেখে কর্মসূচির কার্যকারিতা সামগ্রিকতা বিবেচনার জন্য সমিতি নিয়মিত মিলিত হয়। সাংগঠনিক সুবিধা, শিক্ষকবর্গের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংক্রান্ত নির্দেশ তারা দেয়।

RCI উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে মূল শিক্ষাটি দেয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠ এবং সমতা বজায় রেখে চলতে পারে তার জন্য পরিদর্শনকারী বিশেষজ্ঞ পাঠায় যারা গঠনগত সুবিধা, শিক্ষকবর্গ, পাঠ্যক্রম ইত্যাদির মূল্যায়ন করেন।

২.১২ ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (UNESCO)

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডন কনফারেন্স কর্তৃক UNESCO-র সংবিধানটি আরোপিত হয় এবং যখন ২০টি দেশ সমর্থন সম্পর্কিত দলিল পেশ করে তখন ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর এটি কার্যকরী হয়।

প্যারিসে প্রধান কার্যালয় সহ UNESCO-র মোট ১৮৮টি সদস্য দেশ আছে।

২.২১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা UNESCO-র প্রধান উদ্দেশ্য যাতে করে সম মর্যাদা, মানবাধিকার, আইনি সাহচর্য এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে জাতি, ধর্ম, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কেউ বঞ্চিত না হয়।

২.১২.২ কার্যকলাপ (Functions)

আরোপিত নিয়মকানুন আদেশ ইত্যাদি বজায় রাখতে UNESCO-র পাঁচটি মুখ্য কার্যকলাপ হল—

(ক) উন্নতিমূলক শিক্ষা : আগামী দিনে বিশ্বে কি ধরনের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং জনসংযোগ মূলক কর্ম হবে।

(খ) জ্ঞানের প্রগতি স্থানান্তরকরণ এবং বণ্টন : প্রাথমিকভাবে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কার্যকলাপের উপর আস্থা রেখে।

(গ) মান নির্দ্ধারন ক্রিয়া : আন্তর্জাতিক স্তরের দলিল এবং বিধিসম্মত সুপারিশগুলি প্রস্তুত করা এবং আরোপ করা।

(ঘ) দক্ষতা : নীতিগত বা প্রকল্পগত উন্নয়নের স্বার্থে সদস্য দেশগুলিকে কারিগরি সহযোগিতার বন্দোবস্ত করা।

(ঙ) বিশেষ তথ্যাদির বিনিময়।

২.১২.৩ ইউনেসকো এবং শিক্ষা (UNSCO and Education)

শিক্ষাক্ষেত্রে ইউনেসকোর মুখ্য কার্যকলাপগুলি হল :

(ক) **সঠিক শিক্ষা** : ইউনেসকো কর্মধারাটিকে এমনভাবে পরিকল্পনা করে যাতে সকল স্ত্রী পুরুষ এমনকি যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছেন তারাও শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পায়।

(খ) **জীবনব্যাপী শিক্ষা** : সদস্য দেশগুলিতে জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণাটির ব্যাপকতা আনতে ইউনেসকো পরীক্ষামূলক শিক্ষা ও ক্রিয়াকলাপ অধিগ্রহণ করে।

(গ) **উদ্বাস্তুদের শিক্ষা সংক্রান্ত সাহায্য দান** : উদ্বাস্তুদের শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা, কার্যকরী করা এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য আন্তর্জাতিক জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিনিধি সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা করে।

(ঘ) **শিক্ষার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কৌশলের উন্নয়নের স্বার্থে সাহায্যদান** : বিশ্বে শিক্ষামূলক উন্নয়নের উন্নয়নের মূলধারাটির উপর শিক্ষার ব্যবস্থা সেই সম্পর্কিত প্রকাশনার ব্যবস্থা করে। সারা বিশ্বে শিক্ষামূলক গবেষণা সংক্রান্ত

প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ আছে হামবুর্গের যে ইউনেসকো ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন সেটিকে সহযোগিতা করে।

(ঙ) **শিক্ষামূলক আলোচনাচক্র** : শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পে নীতি প্রণয়ন এবং পরিকল্পনাগত কৌশল সুবিন্যাস এর জন্য সদস্য দেশগুলিতে আঞ্চলিক আলোচনাচক্র ইউনেসকো সংগঠন করে।

(চ) **শিক্ষক শিক্ষা** : শিক্ষক শিক্ষা অনুষ্ঠানটিতে নতুন ধাঁচের পদ্ধতি উন্নতি করে। উন্নয়ন ও প্রসারণের জন্য কারিগরি সহায়তা করে আন্তঃশৃঙ্খলার উন্নতির আবেদন করে ইউনেসকো তার সদস্য দেশগুলিকে সাহায্য করে।

(ছ) **শিক্ষা পদ্ধতি, উপাদান এক-কৌশল** : এই সংস্থাটি শিক্ষা পদ্ধতি, উপাদান এবং কৌশল ইত্যাদির উন্নয়নের উদ্যোগ নেয় এবং সহায়তা করে। প্রকাশনা, অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যম, দূরসঞ্চারী শিক্ষা, উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি, দলগত শিক্ষা, শিক্ষার সহায়তায় কম্প্যুটারের ব্যবহার ইত্যাদি এই কর্মসূচির অন্তর্গত। সাম্প্রতিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, যোগাযোগ এবং সাইবারনেটিকস-এর উন্নতিসূচক পদ্ধতিগুলি শিক্ষার পূর্ণতার সহায়ক বিবেচনা করে ইউনেসকো এগুলির উপর গুরুত্ব দেয়।

(জ) **শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠন** : লোক সমাজের এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের স্বার্থে ইউনেসকো মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনে উৎসাহী হয় এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার উপযোগী শিক্ষামূলক কাঠামোর গঠন এবং উন্নয়নে সহযোগিতা করে।

(ঝ) **শিক্ষামূলক পরিকল্পনা এবং অর্থ সাহায্য** : শিক্ষার পুর্ণতাকল্পে সদস্য দেশগুলির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গঠনে সংস্থাটি সহায়তা করে। প্রকল্পটি চিহ্নিতকরণে এবং বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে।

২.১৩ ইউনাটেড নেশনস ইন্টার ন্যাশনাল চিলড্রেন ইমার্জেন্সী ফান্ড (UNICEF)

ইউনাইটেড নেশন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ইউনিসেফ। এটির নিজস্ব পরিচালন মণ্ডলী এবং কার্যনির্বাহী মণ্ডলী আছে যারা নীতিগঠন, কর্মসূচি পর্যালোচনা এবং অর্থসাহায্য অনুমোদন করেন। ১৬১ দেশ ও অঞ্চলের জাতীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য ইউনাইটেড নেশনের প্রতিনিধি সংস্থাগুলিকে ইউনিসেফ সহযোগিতা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিশ্বের নিপীড়িত শিশুদের সাহায্যকল্পে ইউনিসেফ নিউইয়র্কে প্রধান কার্যালয়সহ গঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে বলা হয় ইউনাইটেড নেশনস ইনটারন্যশনাল চিলড্রেনস ইমারজেনসি ফাণ্ড। ১৯৮৩ সালে এটির নতুন নামকরণ ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন ফাণ্ড হলেও মূল ইউনিসেফটি থেকেই যায়।

শিশুদের মঙ্গল সাধনের জন্য রোগ প্রতিরোধ প্রকল্প চালু করে, শিক্ষার এবং পুষ্টিকর খাদ্যের বন্দোবস্ত করে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ শেষে পেশাগত সুবিধাদান করে ইউনিসেফ কার্য করে থাকে। নিউদিল্লিস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়টির অন্তর্গত শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভারত ও মঙ্গোলিয়া। ভারতে পোলিও নির্মূলকরণ কর্মসূচিটি ইউনিসেফই পরিচালন করে।

২.১৩.১ লক্ষ্য (Mission)

শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে এবং তাদের প্রতিষ্ঠার সুযোগের প্রসারণ ঘটাতে ইউনাইটেড জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইউনিসেফকে নির্দেশ দিয়েছে। শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত সম্মেলন কর্তৃক এটি

নির্দেশিত হয়ে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা করে। এটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে মানবজাতির উন্নতির স্বার্থে শিশুদের সুরক্ষিতভাবে বেঁচে থাকা এবং তাদের উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন। যুদ্ধ কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত, দারিদ্রপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত এবং অক্ষম শিশুদের বিশেষ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় ইউনিসেফ। ইউনিসেফ চরিত্রগত দিক দিয়ে অবিভক্তি এবং ভেদাভেদ নির্বিশেষে সুযোগসুবিধা বঞ্চিত শিশুদের এবং দেশের প্রয়োজনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। লোকসমাজে রাজনীতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে সমস্ত কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করাকে সমর্থন জানায় ইউনিসেফ এবং তাদের সমান অধিকার অর্জন করতে উদ্যোগী হয়।

২.১৩.২ শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইউনিসেফের কর্মসূচি (UNICEF's Strategies in Education)

শিক্ষার উন্নতি সাধনে ইউনিসেফ যে কর্মসূচিটির পরিকল্পনা করে—

(১) শিক্ষার মানের উন্নতি : ইউনিসেফ সেই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি সংগঠন করে যেগুলির দ্বারা মানের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে।

- শিক্ষার্থীর মান : শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের উন্নতির স্বার্থে ইউনিসেফ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠান সংগঠন করে কারণ সুস্থ শিক্ষার্থী যে কোন অনুষ্ঠানে এবং শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম।
- শিক্ষণীয় বিষয়সূচির মান : সাহিত্য এবং গাণিতিক বিষয়সূচির পর্যাপ্ততা এবং আনুষঙ্গিকতা থাকে যাতে শিক্ষার্থী যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
- শিক্ষাদানের মান : দক্ষতা ভিত্তিক, লিঙ্গ সচেতনতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের স্বার্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান।
- শিক্ষার পরিবেশের মান : নাচার না হওয়া, হীনতা, হিংস্রতা, শারীরিক শাস্তি, অন্যায় সুবিধা বা গালি দেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে নীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করা, পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, পানীয়জল, শৌচাগার, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা, শারিরীক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা।
- প্রাপ্ত শিক্ষার মান : লব্ধ শিক্ষার (জ্ঞান, প্রবণতা এবং দক্ষতা) বর্ণনা এবং বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তার মূল্যায়ন করা।

(২) বাড়ন্ত শিশুদের উন্নতির পরিবর্দ্ধন : বাড়ন্ত শিশুরা নিরাপত্তা সুস্থ পরিবেশে এবং সুস্থ শরীরে শিক্ষালাভ করে তার জন্য ইউনিসেফ যেগুলি আরোপ করে—

- জাতীয়তাবাদী প্রচার, নীতি এবং অনুষ্ঠান
- শিশুকালে যথাযথ যত্নকরন হওয়া এবং বিদ্যালয় যাওয়ার পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান সূচি
- বয়ঃ সন্ধিক্ষণের যারা তাদের এবং অভিভাবকদের শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান

(৩) অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভুক্ত শিশু : যারা বয়ঃসন্ধিক্ষণে, বালিকা, কর্মী শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু, যারা দাঙ্গাহাঙ্গামায় পর্যুদস্ত, অক্ষম, যারা দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত শিক্ষা বহির্ভুক্ত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে ইউনিসেফ উদ্যোগ নেয়।

- জন্ম নথিভুক্ত করা এবং সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।
- বহির্ভুক্ত শিশু এবং ঝুঁকি সম্বলিত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সমাজের কার্যকরী ব্যবস্থা।

- নমনীয় অপ্রচলিত প্রস্তাবনা যেমন বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা, কর্মী শিশুদের সুবিধামত সময় নির্দ্ধারণ, বয়স্ক শিক্ষা, মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষায় শিক্ষা দান।

(৪) বালিকাদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ : বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের পূর্ণ ও সমান অধিকার থাকা উচিত। পুরুষ ও মহিলা ভেদাভেদ তুলে দেওয়া উচিত। এটি বাস্তবায়িত করার জন্য ইউনিসেফ উদ্যোগী হয়—

- নারী শিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা আনতে।
- নারী শিক্ষার বাধাগুলি অপসারণ করতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে।
- নারী-পুরুষ ভেদাভেদের ভিত্তিতে পাঠক্রম। পাঠ্য উপাদান এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির পার্থক্য অপসারণ করার নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে।
- বয়ঃ সন্ধিক্ষণস্থিত নারীর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটি ত্বরান্বিত করতে।

৫। যে সমস্ত শিশুরা দাঙ্গাহাঙ্গামা, বিপদসঙ্কুল চঞ্চল অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করছে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে।

৬। দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন—এইচ. আই. ভি.। এইডস তে আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে।

২.১৪ ইউনাইটেড নেশনস ফান্ড ফর পপুলেশন অ্যাক্টিভিটিস (UNFPA)

ইউনাইটেড নেশনস ফান্ড ফর পপুলেশন অ্যাক্টিভিটিস (UNFPA)-র কার্য শুরু হয় ১৬০৯ সালে। এটি আন্তর্জাতিক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনগণের সহযোগিতার উৎস। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনগণের সমস্যা সমাধানে এটি সাহায্য করে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কি ধরণের সমস্যা উদ্ভব হয় এবং কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তবুও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করা যায় না (উচিত নয়)। পরিবারের আকার এবং স্থান নির্বাচনের স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত। যে কোন ধরনের বলপূর্বক কার্য করানো মানবিক অধিকার ভঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং UNFPA জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যকলাপ সমর্থন করে মাত্র।

২.১৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনগণের ব্যক্তিগত পছন্দমত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সংগঠন করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিটি সমর্থন করা।
- ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কর্তৃক অনুমোদিত এবং ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড নেশনস-এর সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক পুনর্বিবেচিত কৌশলগুলির উন্নতি সাধন করা। এই কৌশলগুলি প্রতিটি পুরুষ ও নারীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করে। এই প্রস্তাবনাটি মূলত নারীসমাজকে শিক্ষা লাভ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে শক্তিশালী করে।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, প্রজনন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমতা এবং নারী সমাজকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি প্রচার এর স্বার্থে ইউনাইটেড নেশনস অরগানাইজেশন, দ্বিদলীয় প্রতিনিধি সংস্থা, সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এইগুলিকে সমন্বিত এবং সহযোগিতা করা।

২.১৪.২ কার্যকলাপ (Functions)

ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফাণ্ড-এর মুখ্য কার্যকলাপগুলি :

(ক) প্রজনন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য—UNFPA প্রজনন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সচেতনাকে সমর্থন করে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ, মায়ের গর্ভকালীন নিরাপত্তা, অনুর্বরতা নিবরণ, প্রজনন পরিবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা এবং নিরাপত্তাহীন গর্ভপাত এটির অন্তর্গত।

(খ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, নীতি আরোপ এবং নীতির মূল্যায়ন ইত্যাদি কর্মে UNFPA দেশগুলিকে সহায়তা করে যাতে তারা উন্নতির কৌশলগুলি বজায় রাখতে পারে।

(গ) ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন পপুলেশন এণ্ড ডেভেলপমেন্টকে সমর্থন জানানো (ICPD)

২.১৪.৩ উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিসমূহ (Major Achievements)

প্রজনন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও অধিকার, নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্নতি, দীর্ঘায়ু কামনা, নিম্নতর শৈশব আদর্শ, নিম্নতর মাতৃ আদর্শ, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ হীনতা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সম্বলিত ICPD এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেশগুলিকে UNFPA সহায়তা করে। ১৯৬৯ পর্যন্ত উন্নয়শীল দেশগুলিতে জন্মের হার প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে যায়। নারীর বিরুদ্ধে পার্থক্য সংক্রান্ত কার্যকলাপ অপসারণ করা এবং নারীর অধিকার বোধ এবং প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত ICPD কর্মসূচি। ১৯৯৯ সালের UN-এর সাধারণ অধিবেশন এবং নারী সমাজের উপর ১৯৯৪ সালের ৪ঠা বিশ্ব সম্মেলন ICPD-এর আহ্বানটির পুনরাবৃত্তি করে যেগুলির জন্য—

- ২০১৫ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্য পরিসেবার.
- প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের দায়িত্ব সমানিকরণ।
- জমি, ঋণ, কর্মনিযুক্তি এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে নারীর সমান অধিকার মঞ্জুরীকরণ।
- নারী জাতির প্রতি অত্যাচারের পরিশেষ।

২.১৫ ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম (UNEP)

আমরা সকলেই অবগত আছি যে সারা বিশ্ব বর্তমানে পরিবেশগত অমঙ্গলের কিনারায় অবস্থান করছে। মানুষের অন্যান্য জীবনের উপর আধিপত্যই মনুষকে জীবনের সব থেকে বড় শত্রু করে তুলেছে এবং যে পদ্ধতিটি এটিকে সমর্থন করে সেটি হল পরিবেশ। বিশ্বের দেশগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যারা দুটি ভিন্নভাবে পরিবেশ ধ্বংসের কাজ করে চলেছে।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত দেশগুলিকে উন্নত দেশ বলা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল। দৈনন্দিন জীবনে তারা প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য এবং বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করে। কলকারখানা ও গাঁড়ির ধোঁয়ার আধিক্যে বাতাসের দুষণ হচ্ছে এবং ওজোন স্তরটি ক্রমশ কমে আসছে। অপরদিকে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ মনে করা যেতে পারে পৃথিবী থেকে কিছু প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির পথে। জীবনধারার এই নীতি বজায় রাখাই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়— এই সবগুলি ঘটার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত দেশগুলিকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশগুলির বিশাল বনভূমি উন্নত দেশগুলির তুলনায় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে কিন্তু আর্থ সামাজিক কারণ বর্তমানে তাদের বনভূমি শূন্য করতে বাধ্য করছে.

পরিবেশ বিশ্বব্যপী, এটির অবনতি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দু ধরনের দেশগুলিকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি এবং সেটি আমাদের সাথে সমভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেঁচে থাকার স্বার্থে। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম একটি বৃহৎ পদক্ষেপ সেটিকে বিশ্বের জনগণ সেই প্রয়োজনটিকে পূর্ণ করতে গ্রহণ করেছে। ইউ এন জেনারেল অ্যাসেম্বলি রেজলিউশন ২৯৯৭ (XXVII) অনুযায়ী UNEP-র পরিচালন পরিষদটি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে এটি সাধারণ পরিষদকে প্রতিবেদন জানায়।

২.১৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল প্রোগ্রাম বিশ্বের সমস্ত জাতির জনগণকে অনুপ্রেরণা, তথ্যাদি স্থাপন এবং সমর্থনের মাধ্যমে জীবনধারার মান উন্নত করতে উৎসাহী করে পরিবেশের প্রতি যত্ন নেওয়ার স্বার্থে যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিপদগ্রস্ত না হয়। সেই কারণে এটির লক্ষ্য উপযুক্ত এবং সক্রিয় কর্মীর জোগান দেওয়া.

২.১৫.২ কার্যকলাপ (Functions)

দ্য ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগামটির মুখ্য কার্যকলাপগুলি হল :

(ক) পরিবেশ এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং পরিশেষে যথাযথ নীতি গ্রহণ।

(খ) ইউনাইটেড নেশনস সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত পরিবেশের দিক ও সমন্বয়তা সংক্রান্ত সাধারণ নীতি নির্দেশনা।

(গ) ইউনাইটেড নেশনস সিস্টেমের সঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচির আরোপ বিষয়ক UNEP-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের সাময়িক প্রতিবেদনগুলি গ্রহণ এবং পুনর্বিবেচনা করা।

(ঘ) আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্ভুত পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি যাতে যথাযথ এবং যথেষ্টভাবে সরকার কর্তৃক বিবেচিত হয় তার জন্য বিশ্বের পরিবেশ পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনাধীনে রাখা।

(ঙ) পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন, মূল্যায়ন এবং বিনিময় লব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে ইউনাইটেড নেশনস সিস্টেমের সঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মসূচির পরিকল্পনা ও আরোপ করার জন্য আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক এবং পেশাদারি সংস্থার বন্দোবস্ত করা।

(চ) এনভায়রন ফাণ্ডের অর্থানুকূল্যে যে কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হয় তার প্রতিবেদনগুলি পুনর্বিবেচনা এবং অনুমোদন করা প্রতি দু বছর অন্তর।

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থার ফল সাথে সাথে পরিবেশ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান, প্রকল্প ইত্যাদি বাবদ সম্ভাব্য অতিরিক্ত ব্যয় এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান, প্রকল্প ঐ দেশগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও গুরুত্ব এর সুসঙ্গত কিনা ইত্যাদির পুনর্বিবেচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

২.১৬ অ্যাকশন এইড (ACTION AID)

এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউনাইটেড কিংডম এর প্রায় ত্রিশটির বেশি দেশের প্রায় ৫০ লাখ অতি দরিদ্র মানুষের সঙ্গে অ্যাকশন এইড কাজ করে। ফ্রান্স, গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ইটালী এবং স্পেনে সংগঠনসহ অ্যাকশন এইড অ্যালায়েন্সের সদস্য। ভারতবর্ষে এই সংস্থা ১৯৭২ সাল থেকে কাজ করে।

২.১৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

দারিদ্রহীন বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যেন মর্যাদার সঙ্গে তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এই লক্ষ্যমুখী অ্যাকশন এইড-এর উদ্দেশ্যগুলি :

- সমস্ত শিশু এবং বয়স্কদের সুসংগত, সুগম এবং উচ্চমানের মুক্ত শিক্ষা লাভের আহ্বান জানানো;
- স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো।
- শিশু এবং মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।
- দরিদ্র মানুষদের খাদ্য সংস্থানের অধিকার সুরক্ষিত করা।
- যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও রোগাক্রান্ত মানুষের সাহায্যের বন্দোবস্ত করা।
- এইচ আই ভি/এইডস বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো।
- গৃহহীন অসুরক্ষিত শিশুদের প্রতিপালন করা।
- স্ত্রী-পুরুষ সমতা সম্পর্কিত ধারণাটির উন্নতি সাধন করা।
- জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ মানুষের অধিকার—এটির উন্নত করা।

২.১৬.২ কার্যকলাপ (Functions)

অ্যাকশন এইড এর মুখ্য কার্যকলাপগুলি হল—

(ক) পরিবর্তনে উৎসাহ দেওয়া : যে নীতি ও প্রয়োগগুলির প্রভাব সমাজস্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত দরিদ্র মানুষের উপর পড়ে সেগুলির পরিবর্তনে এটি উৎসাহ দেয়।

(খ) সর্বজনীন শিক্ষা : প্রাক বিদ্যালয়, প্রাথমিক এবং বয়স্ক তিনটি স্তরে অ্যাকশন এইড শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য করে।

(গ) শারীরিক ক্ষমতা : এটি মূলত লোকসমাজ ভিত্তিক পুনর্বাসন করে যেটি শারীরিক অক্ষম মানুষকে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে একত্রীকরণ করে।

(ঘ) অর্থনৈতিক সেবা : লোকসমাজের কর্ম পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতে জনগণকে বিশেষত নারীদের যাদের বেঁচে থাকার জন্য সামান্য অর্থবল আছে তাদেরকে সাধ্যমত ব্যঙ্ক ঋণ এবং বিশ্বাসপূর্বক ঋণ প্রদান করে সহায়তা করে।

(ঙ) শহুরে দারিদ্রতা : শহরের ফুটপাতে বসবাসকারি বা কর্মে নিযুক্ত শিশু, বস্তিবাসী, ফুটপাতবাসী সকলেরই জমিগত, গৃহগত ও আইনগত অধিকার অর্জন করার স্বার্থে এটি কার্য করে।

(চ) স্বাস্থ্য : রোগ ব্যাধির প্রতিরোধমূলক এবং রোগব্যাধি থেকে অব্যাহত প্রাপ্তিমূলক, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানীয় জল ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যমূলক এবং এইচ আই ভি, এইডস রোগাদির সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে এটি উৎসাহ দেয়।

(ছ) খাদ্য এবং কৃষিকাজ : যে সমস্ত কৃষক পরিবারে সামান্য জমিটুকুই সম্বল এবং যারা জীবনধারণের জন্য চাষআবাদ এর উপর নির্ভরশীল তাদের স্থানীয় গ্রামীণ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উন্নত কৃষিকার্যের কৌশলাদি বা কীটপতঙ্গাদির কবল থেকে ফসল রক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং চাষ আবাদির সুবিধার্থে খাল খননের ব্যবস্থা করে অ্যাকশন এইড সহায়তা করে।

(জ) জরুরী সংকটব্যবস্থা : আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বা মহামারী আক্রান্ত এলাকায় এটি অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা করে। খরা, বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকার উন্নতিকল্পে এবং এগুলির প্রতিরোধকল্পে উন্নত সমাজগঠনে সরকারকে এটি সহায়তা করে।

২.১৬.৩ উল্লেখযোগ্য কৃতীসমূহ (MajorAchievements)

শিক্ষার সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসেবা এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে বিশ্বে অভাব অনটন দূরীকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচির সাফল্যতার ফলস্বরূপ বিশ্বে পরিবর্তন আসে এবং তার ক্রমশ উন্নতি হয়। অ্যাকশন এইড বিশ্বে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

প্রায় ১,২০,০০০ জনগণ সমর্থিত অ্যাকশন এইড বিশ্বের ৩০টির বেশি দেশে কার্য করে। জাতীয় সরকার, আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি সংস্থা বা অনুদানকারি সংস্থা যেগুলির নীতি দরিদ্রমানুষের জীবনধারার উপর বর্তায় সেগুলিকে এটি প্রভাবিত করে।

প্রায় ৯ লাখ জনসমন্বয়ে ভারতের দাতব্য সংক্রান্ত কর্মসূচিটি বিশ্বের বৃহত্তম। নিম্নজাতি, উপজাতি শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ ও শারিরীক অক্ষম ব্যক্তিবর্গের অধিকার এবং সাধারণ প্রয়োজনীয়তাগুলি অ্যাকশন এইড সমর্থন করে। এটি সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সমর্থন করে এবং ২৭৫টি স্থানীয় সংস্থা ও সমাজসেবী দলগুলির মাধ্যমে এটি প্রকল্পগুলি সংগঠন করে। ৬৯টি উন্নয়নমূলক এবং ১৬টি অক্ষমতা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিতে এটি অংশগ্রহণ করছে।

উপজাতি কোল সমন্বয় সংক্রান্ত চুক্তিতে আবদ্ধ শ্রমিকদের, যৌন নিপীড়ন, অবৈধ জমি দখলীকরণ ইত্যাদি কারণে পর্যুদস্ত অসহায় মানুষকে সহায়তা করছে। ১৯৮৮ সালে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত আরবার স্লাম আউটরীচ অনুষ্ঠানে প্রায় ২১০ জন শারীরিক অক্ষম শিশুকে অক্ষমতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়। ঐ বছরেই ৫৩,০০০ পরিবার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসেবা লাভ করেন ২১,৭৪৪ জন শিশু রোগ থেকে অব্যাহতি মূলক পরিসেবা এবং ১৩,৩০০ এর বেশি মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিসেবা লাভ করে।

২.১৭ ওয়ার্লড হেলথ অরগানাইজেশন (WHO)

জেনেভাস্থিত প্রধান কার্যালয় সহ ওয়ার্লড হেলথ অরগানাইজেশন ইউনাইটেড নেশনের একটি বিশেষ সংস্থা যেটি রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং দূরীকরণ করে মানুষের জীবনধারা উন্নয়নকল্পে প্রকল্পগুলি সঞ্চালন করে। বিজ্ঞানমূলক এবং গবেষণামূলক কর্মই শুধু নয় এটি বিশ্বের মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে এবং তথ্যাদি অবগত করতে শিক্ষা প্রদানও করে।

২.১৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

মানুষকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এটির উদ্দেশ্যগুলি হল :

- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসেবামূলক কর্মে সরকারকে আগ্রহী করা এবং সহায়তা করা।
- ব্যাপকতা এবং পরিসংখ্যা সংক্রান্ত কর্মসহ প্রশাসন এবং বিজ্ঞান কুশলতামূলক পরিসেবার প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিচালনা করা।
- পুষ্টি, আবাসন, স্বাস্থ্যবিধি, কর্মপরিবেশ এবং অন্যান্য পরিবেশ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উন্নয়ন করা।
- স্বাস্থ্যের যোগসাধনকল্পে বৈজ্ঞানিক ও পেশাদারি দুটি দলের মধ্যে সহযোগিতার উন্নয়ন করা।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সম্মেলন ও চুক্তির প্রস্তাবনা করা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণার পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা।
- খাদ্য, জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় ও ভেষজবিদ্যা সম্বন্ধীয় সামগ্রীসমূহের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা। এবং
- স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞাত জনমত জনগণকে প্রভাবিত যাতে করে তার সহায়তা করা।

২.১৭.২ কার্যকলাপ (Functions)

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মুখ্য কার্যকলাপগুলি—

(ক) সারা বিশ্বব্যাপি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপদেশ দেওয়া।

(খ) স্বাস্থ্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা।

(গ) জাতীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রকল্পগুলি শক্তিশালী করতে সরকারকে সহযোগিতা করা।

(ঘ) যথাযথ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রযুক্তি বিদ্যা, তথ্যাদি এবং আদর্শ উন্নয়ন করা এবং বহন করা।

২.১৭.৩ উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি সমূহ (Major Achievements)

১৯৮০ সালে যে রোগটি লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ এবং লক্ষাধিক মানুষের জীবনের আশংকার কারণ সেই বসন্ত রোগটির উচ্ছেদ হওয়ার সংবাদটি প্রচারিত হয়। ফলস্বরূপ বলা যায় এটি যে শুধু বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোগান্তির অবসান ঘটিয়েছে তা নয় চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী খাতে যে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয়িত হয় সেটির সাশ্রয়ও করেছে।

পোলিও এবং গিনি ওয়ার্ম এর মত রোগও বর্তমানে উচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে এবং অনুকূল জনমতের সহায়তায় কুষ্ঠ ব্যাধিও উচ্ছেদ হতে চলেছে।

গবেষণা, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোন এবং নতুন সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধে WHO-র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক অনুমোদিত মুখ্য অভিযানগুলির মাধ্যমে এটি সুস্থ জীবনধারা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি এবং গবেষণামূলক কর্মে উৎসাহ দেয়। পরিবেশে নিরাপদ পানীয় জল পাবার সুবিধা এবং সাথে সাথে ওজোন স্তর ক্ষয়বৃদ্ধি ত্রুটির সংশ্লিষ্ট কারণ।

২.১৭.৪ ভিশন ২০৫০

৫০ বছর কোন মানুষের কাছে দীর্ঘ সময় মনে হলেও মানব ইতিহাসে এটি স্বল্পকাল মাত্র। দুশতক যাবৎ জানা ছিল স্মলপক্স প্রতিরোধ করা যেতে পারে কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে ওয়ার্লড হেলথ অরগানাইজেশন এটিকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়। পরিস্থিতির অবনতির কিছু সময় পরে ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য পুনর্নির্গমন রোগ ব্যাধির প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছু ঔষধ, অ্যান্টিবায়োটিক কম কার্যকরী হয়ে পড়ে। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, পরিবেশ দূষণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, নির্বনীকরণ গ্রীন হাউস এফেক্ট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয় সারা বিশ্ব।

২.১৮. প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধাদান (Concession And Facilities for the Disabled)

The person with Disabilities (Eqdual opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিবন্ধী শিশু উপযুক্ত সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবে এবং প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর ১৮ বছর বয়সকাল পর্যন্ত যথাযথ পরিবেশে বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করার অধিকার আছে। এই ধারাতে আরও উল্লেখ করা যয় যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাভাবিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই সঙ্গে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন তাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে যাতে দেশের যে কোন অঞ্চলের এই ধরনের শিক্ষার্থীরা এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশাধিকার পায় এটি এই ধারা সমর্থিত। এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিবন্ধীদের পেশাদার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা থাকা উচিত। এই ধারাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যারা পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ পর্যন্ত করার পর আর পূর্ণ সময় বিদ্যালয় শিক্ষা বজায় রাখতে পারবে না তাদের জন্য আংশিক সময় শিক্ষার প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে চালু করতে হবে; এই ধরণের শিক্ষার্থী যাদের বয়স ১৬ বছরের উর্ধ্বে তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিক্ষার করতে হবে এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি এবং শিক্ষাসামগ্রী বিনামূল্যে দিতে হবে।

এই ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন সাহায্যকারি সামগ্রীর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং শিক্ষা সহায়ক উদ্ভাবনাকল্পে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলিকে বলা হয় তারা যেন যাতায়াতের সুবিধা, পুস্তক সরবরাহ, ইউনিফর্ম সরবরাহ এবং প্রতিবন্ধীদের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা প্রকল্পের পরিকল্পনা করতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইমারতি বাধাসমূহ অপসারণ করতে এবং প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে পাঠক্রমের পুনর্গঠন করতে।

বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের পরীক্ষার সময় বিশেষ সুবিধা দেয়। যেমন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা দৃষ্টিশক্তিহীন পরীক্ষার্থীকে উত্তর লেখার জন্য একজন সাহায্যকারী দেওয়া হয় অথবা পরীক্ষার সময়সীমা অতিরিক্ত দেওয়া হয়।

ভারত সরকারের দ্য ইনটিগ্রেটেড এডুকেশন অফ দ্য ডিসেব্লড চিলড্রেন (IEDC) প্রকল্পটিতে নীচের সুবিধাগুলি দেওয়া হয়।

প্রতিবন্ধী শিশুকে স্টেট/রাষ্ট্র/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রচলিত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। যেখানে এরকম সুবিধা নেই সেখানে নীচের হার ধার্য করা হয়।

১। পুস্তক এবং ষ্টেশনারি সংক্রান্ত প্রকৃত ব্যয় (সর্বাধিক ৪০০টা প্রতি বছর)

২। ইউনিফর্ম বাবদ প্রকৃত ব্যয় (সর্বাধিক ২০০টা প্রতি বছর)

৩। ট্রান্সপোর্ট ভাতা মাসিক ৫০ টাকা (হষ্টেলবাসীরা পান না)

৪। রিডার ভাতা ৫০ টাকা প্রতি মাসে (শুধুমাত্র দৃষ্টিহীনদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত)

৫। অক্ষমদের জন্য এসকর্ট ভাতা মাসিক ৭৫ টাকা

৬। প্রকৃত সাজ সরঞ্জাম বাবদ খরচ (৫ বছরের জন্য সর্বাধিক ২০০০ টাকা)

২.১৮.১ যোগাযোগের জন্য মূল সুপারিশ সমূহ (Key References for Contact)

ইনষ্টিটিউশন :

- ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড (NIMH)। মনোবিকাশ নগর সেকেন্দ্রাবাদ
- দিগদর্শিকা ইনষ্টিটিউট অফ রিহ্যাবিলিটেশন রিসার্চ, গান্ধীভবন, সিমলা হিলস্ ভূপাল
- রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টার, ডিপার্টমেন্ট অফ্ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, গভঃ অফ রাজস্থান, জয়পুর
- মেডিক্যাল সেন্টার ট্রাস্ট, চিলড্রেন হসপিটাল, কারেলী বাগ, ভাদোদারা
- ওয়াই অ্যাকসার ইনষ্টিটিউড, ৪১০ গণপতি আলে, ওয়াই (সাটারা), মহারাষ্ট্র

ইনিভার্সিটি কোর্স

- মণিপুর ইউনিভারসিটি, কাঞ্চিপুর, ইম্ফল
- জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জামিয়ানগর, নিউ দিল্লি
- মহাত্মা গান্ধী গ্রামোদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়, সাতনা
- বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি, বারাণসী
- ইউনিভারসিটি অফ পুনে, গণেশখিন্দ, পুণে
- ইউনিভারসিটি অফ বম্বে, এম. জি রোড, ফোর্ট মুম্বাই
- আলি জাভর সাং ইনষ্টিটিউড ফর হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, মুম্বা
- ইউনিভারসিটি অফ মাইশোর, কারিয়া সৌধা, ক্রাফোর্ড হল, মাইশোর
- অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউড অফ স্পীচ এণ্ড হিয়ারিং, মানাসাগোত্রী, মাইশোর
- গুজরাট ইউনিভারসিটি, নভরাংপুরা, আহমেদাবাদ
- ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর ভিসুয়্যালি হ্যাণ্ডিক্যাপড, ১১৬ রাজপুর রোড, দেরাদুন
- অভিনাশীলিঙ্গম ইনষ্টিটিউট ফর হোমসায়েন্স এণ্ড হায়ার এডুকেশন ফর উওমেন, কোয়েম্বাটোর
- স্প্যাসটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, অপ. আফগান চার্চ, আপার কোলাবা রোড, মুম্বাই

- অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকাল সায়েন্সেস, আনসারি নগর, নিউদিল্লি
- অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এণ্ড হিরহ্যাবিলিটেশন, হাজী আলি পার্ক, খা দাই মার্গ মহালক্ষ্মী, মুম্বাই।

২.১৯ সারাংশ : স্মরণীয় বিষয়সমূহ (Unit Summary : Things to Remember)

- গৃহ শিশুর প্রথম বিদ্যালয়
- বিদ্যালয় শিশুর প্রচলিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান
- লোকসমাজ শিশুর ব্যতিক্রমী শিক্ষা পদ্ধতির বন্দোবস্ত করে
- জনসংযোগ মাধ্যম সময় এবং দূরত্বের শূন্যস্থান পূরণ করে এবং সাম্প্রতিক সংবাদ তথ্যাদি পরিবেশন করে
- সি.এ.বি.ই শিক্ষার প্রাচীনতম সর্বোচ্চ উপদেষ্টামণ্ডলী
- এন.সি.ই.আর.টি বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত উপদেশ দেয় এবং সহায়তা করে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে।
- এন.আই.পি.এ ভারত সরকারের একটি পেশাদারি সংস্থা শিক্ষার নীতি এবং পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে
- এন.সি.টি.ই শিক্ষক প্রশিক্ষণে একটি বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠান
- আর.সি.আই বিশেষ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারি বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠান
- ইউনেসকো বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে
- ইউনিসেফ বিশ্বের অসুবিধাভোগী শিশুদের উন্নয়নকল্পে কার্য করে
- ইউ. এন. এফ. পি. এ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকারি সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থা
- ইউ.এন.ই.পি পরিবেশ বিপদমুক্ত রেখে মানুষের জীবনধারার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা করে
- অ্যাকশন এইডের লক্ষ্য দারিদ্রতাহীন বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যেন মর্যাদাসহ মানবাধিকার অর্জন করে
- হু-এর লক্ষ্য বিশ্বে মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসেবার আন্তর্জাতিক মান

২.২০ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উদ্দেশ্যগুলি লিখুন—

(ক) UNESCO, (খ) UNFPA, (গ) Action-Aid

২। গৃহ, বিদ্যালয় এবং লোকসমাজের মধ্যে সম্পর্কটি ১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

৩। কেমন করে জনসংযোগ মাধ্যম সাম্প্রতিক তথ্যাদি পরিবেশন করে? ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

২.২১ বাড়ীর কাজ (Assignment)

জেলার সরকারি/রাজ্য/জেলার ইনষ্টিটিউটগুলি পরিদর্শন করুন।

সংস্থা/ইনষ্টিটিউশনটির বিগত ৩ বছরের কার্যকলাপ এর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিফল সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

২.২২ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion Classification)

এই এককটি পাঠ করার পর আপনার কোন বিষয় সম্বন্ধে আরও আলোচনা করার এবং অন্যগুলির ব্যাখ্যাকরণের ইচ্ছা হতে পারে নীচের স্থানে বিষয়গুলি লিখুন।

২.২২.১ আলোচনীয় বিষয় (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

২.২২.৩ ব্যাখ্যাকরণের বিষয় (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

২.২৩ উৎস (Reference)

1. Chandra, S.S. And Sharma, R.K: Principles of Education; (1996)–Atlantic Publishers. New Delhi.
2. Pandey, R.S: Education in Emerging Indian Society; (1997)–Vino Pustak Mandir, Agra.
3. Agarwal, J.C. and Agarwal, S.P: Role of UNESCO in Education; 1982, Vikas Publishing House (P) Ltd. New Delhi.
4. Bhatnagar, R.P. and Vidya Agarwal; Educational Administration; (1997), R. Lall Book Depot, Meerut.

একক ৩ ❑ শিক্ষাগত পরিকাঠামো (Educational Set Up)

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ শিক্ষাগত সোপান

৩.৪ গ্রাম এবং শহর স্তরের পরিকাঠামো

- ৩.৪.১ পৌর নিগম সমূহ
- ৩.৪.২ পৌর সংঘ সমূহ
- ৩.৪.৩ পঞ্চায়েত সমূহ
- ৩.৪.৪ লোকসমাজ স্তরে অংশগ্রহণ
  - ৩.৪.৪.১ লোকসমাজকে বিদ্যালয়ের সমীপবর্তীকরণ
  - ৩.৪.৪.১ বিদ্যালয়কে লোকসমাজের সমীপবর্তীকরণ
- ৩.৪.৫ পিতামাতা-শিক্ষক সংঘ
- ৩.৪.৬ মিশ্র বিদ্যালয়

৩.৫ জেলা স্তরে পরিকাঠামো

- ৩.৫.১ জেলার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
- ৩.৫.২ জেলার শিক্ষা পর্ষদ

৩.৬ রাজ্যস্তরে পরিকাঠামো

- ৩.৬.১ ঐকিক পরিকাঠামো
- ৩.৬.২ দ্বিস্তর পরিকাঠামো
- ৩.৬.৩ ত্রিস্তর পরিকাঠামো
- ৩.৬.৪ চতুর্থ স্তর পরিকাঠামো
- ৩.৬.৫ রাজ্য স্তরে পরিষদ

৩.৭. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ

৩.৮ সারাংশ : স্মরণীয় বিষয় সমূহ

৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৩.১০ বাড়ীর কাজ

৩.১১. আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.১২. উৎস

৩.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্রময় দেশ। এটির জাতিগত, ভাষাগত এবং ঐতিহ্যগত বিবিধত্ব উল্লেখযোগ্য। এই দেশে গভীর বনভূমি আছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে আবার আছে উচ্চতম পর্বতমালা এবং দূরপ্রসারী সমুদ্রতট। একইভাবে, ভারতবর্ষের শিক্ষাগত পরিকাঠামোটিও পরিবর্তনীয় নমুনা-ভিত্তিক গঠিত হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের নমুনার সমন্বয়ে গঠিত পরিকাঠামোটি ঠিক ক্যালিডিওস্কোপ দিয়ে দেখার মতই কৌতূহলজনক। অধিকাংশ রাজ্যেই শিক্ষাতগত পরিকাঠামোটির পুরোভাগে আছে 'ডিরেক্টর অফ এডুকেশন'— যেটিকে কোন কোন রাজ্যে বলা হয়— 'ডিকেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন'। দুটির মধ্যে কিছু প্রভেদ লক্ষ্যণীয়। যেমন— জম্মু এবং কাশ্মীরে 'ডিরেক্টর অফ এডুকেশন' দুজন— একজন ছেলেদের অপরজন মেয়েদের; গুজরাটে একজন প্রাথমিক শিক্ষার অপরজন বয়স্ক শিক্ষার। সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গে যিনি ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন' তিনি আবার 'এক্স অফিসিও সেক্রেটারী ফ এডুকেশন'।

জীব এর বিবর্তনবাদে যেমন একটি মাত্র কোষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন চরিত্র বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রজাতির জীব তেমনই শিক্ষাগত পরিকাঠামোটির সঙ্গে একটি সাদৃশ্য আপনি লক্ষ্য করবেন। যেহেতু শিক্ষা দীর্ঘ সময়কালীন সেইজন্য পরিবেশের মানানসইতর কারণে নমুনার এই বৈচিত্র। বর্তমানে এটিকে সমরূপ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তথাপি অধিকাংশ রাজ্যেই শিক্ষার সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে। সুতরাং রাজ্যগুলির শিক্ষা নমুনার বিচিত্রতার কার সংস্থানিক, ঐতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক হতে পারে বলা যায়।

এই এককটিতে আপনি পাঠ করবেন গ্রাম, শহর, লোকসমাজ, জেলা এবং রাজ্য স্তরে বিভিন্ন পরিকাঠামো এবং এটি সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থগুলির ভূমিকা।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে আপনি পারবেন :

- ঐকিক, দ্বিস্তর, ত্রিস্তর এবং চতুর্স্তর বিশিষ্ট পরিকাঠামোগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে।
- পিতা-মাতা-শিক্ষক সংঘের কার্যকলাপ বলতে;
- শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় সংগঠনগুলির ভূমিকা লিখতে;
- শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যস্তরে সংগঠনগুলির ভূমিকা লখতে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনগুলির ভূমিকা বিশদভাবে বলতে।

৩.৩ শিক্ষাগত সোপান (The Educational Ladder)

আপনারা অনেকেই অবগত আছেন যে মধ্যপ্রদেশে একাদশ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করে অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার্থীরা স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েছিল। আপনি হয়তো এটিও স্মরণ করতে পারবেন যে আপনার গুরুজনেরা কলেজে ভর্তির পূর্বে ইন্টার কলেজে প্রবেশ করে ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সর্বোপরি আপনারা সকলেই অবগত আছেন 'হায়ার সেকেন্ডারি'র অর্থ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী। অপর দিকে আপনি

কিংবা আপনাদের মধ্যে কেউ প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তির পূর্বে হয়তো নার্সারি, কেজি ১ ও ২ অর্থাৎ প্রিনার্সারি স্তরের পাঠক্রম সমাপ্তি করেছিলেন।

এগুলির মধ্যে আপনি হয়তো শুনে থাকবেন প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি, লোয়ার প্রাইমারি, লোয়ার সেকেন্ডারি ইত্যাদি। এই পরিপ্রেক্ষতে বলা যায়— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশ সহজ। সেখানে আছে— তিন বছর মেয়াদী প্রথম ডিগ্রি কোর্স— যেটকে বলা হয় গ্রাজুয়েশন এবং চার/পাঁচ বছর মেয়াদী পেশাদারি এবং শিল্প প্রযুক্তি কোর্স। দুবছর মেয়াদী পোষ্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সটি গ্রাজুয়েশনের অনুগামী।

একটি সহজ চিত্র যেটিকে বলা হয় শিক্ষাগত সোপান নীচে দেওয়া হল যার সাহায্যে উপরলিখিত শব্দগুলি সৃষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থাটির অবসান ঘটে। (৩.২ টেবিল ৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) (Set Up)

৩.৪ গ্রাম এবং শহর স্তরের পরিকাঠামো (Village and Town Level Set Up)

ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং পঞ্চায়েত রাজ শক্তিশালী সেখানে স্থানীয় সংগঠনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্প্রতি সেইগুলির সমর্থন কার্যকরী হচ্ছে। স্থানীয় সংগঠকটির গুরুত্ব পেয়েছে একটি কারণে সেটি হল 'স্থনীয়' অর্থাৎ স্থানীয় স্তরের সমস্যাগুলির সঙ্গে এই সংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ সহজ যোগাযোগ অপরপক্ষে দূরত্ব বেশি থাকায় উচ্চতর সংগঠনের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের অভাব থাকে।

ইউ.এস.এ, ইউ.কে, এবং ফ্রান্সের মত উন্নত দেশগুলিতে স্থনীয় সংগঠনগুলি (ফ্রান্সে কমিউনস এবং ইউ.কে.তে লী) সক্রিয়ভাবে শিক্ষার পরিচালনা করে। সাম্প্রতিককালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ভারতেও স্থানীয় সংগঠনগুলি শিক্ষা এবং শিক্ষার উন্নয়নকল্পে স্থানীয় প্রতিভা, লোকসমাজের আগ্রহ যথোপযুক্ত ক্ষমতা এবং ভূমিকাটির প্রাধিকার ইত্যাদির সাহায্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতবর্ষে দুধরনের স্থানীয় সংগঠন কার্য করে। জনপদ, পঞ্চায়েত এই ধরনের স্থানীয় সংগঠনগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, যারা গ্রাম্য এলাকায় এবং পৌর সংঘ, পৌরনিগম দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত যারা শহর এলাকায় কর্য করে। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব গ্রাম ও শহর স্তরে ব্লক এবং জেলা স্তরের স্থানীয় সংগঠনগুলি উপর অর্জন করা হয়।

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির আড়ষ্টতার পাশাপাশি ব্যতিক্রমী শিক্ষা পদ্ধতির অসংবদ্ধতা বিবেচিত হওয়ার ফলে কিছু মানুষের কাছে অপ্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নমনীয়তা ক্রমশ বিকশিত হয়। মনে করা হয় অপ্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিটি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিটির পরিপূরক। অনেকের কাছে এটি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বিকল্প। ১৯৭৩ সালে কুম্ব মনে করেন অপ্রচলিত শিক্ষার অর্থ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির কাঠামোর বাইরে এটি একটি সুবাবস্থিত, রীতিসঙ্গত শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং এটিকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যা কেবলমাত্র নির্বাচিত পাঠ্যবিষয়বস্তু সীমিত সংখ্যক জনগণ শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সবার মধ্যে সরবরাহ করে। অন্যভাবে বলা যায় এটি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বহির্ভূত এক সুসংগঠিত পদ্ধতি। অপ্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি মনোমত বহু নিয়মশৃঙ্খল অনুগামী। এটি অনেক কম খরচ সাপেক্ষ, প্রয়োজনানুরূপ, কার্যকরী এবং প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।

৩.৪.১ পৌর নিগম (Municipal Corporation)

বিভিন্ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সমর্থিত পৌর প্রধান পৌরনিগম পরিচালনা করেন। নিগমের প্রশাসনিক কার্য এই পরিষদগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র-এর মত রাজ্যগুলিতে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিষদ শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে।

শিক্ষাকর ধার্য করে কিছু পৌরনিগম শিক্ষার জন্য অর্থেরসংস্থান করে। পৌর নিগমগুলি কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষারই যে দায়িত্ব গ্রহণ করে তা নয় কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাও দেখাশোনা করে।

৩.৪.২ পৌর সভা (Municipalities)

ভারতে দু ধরনের পৌর সভা আছে যাদের নগর পালিকা বলা হয়। এদের মধ্যে যারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বছরে ১ লাখ টাকা ব্যয় করে তাদের অনুমোদিত পৌরসংঘ এবং বাকি যারা তাদের অননুমত পৌর সভা বলে।

অনুমোদিত পৌর সভাগুলিকে তাদের নিজেদের শিক্ষা পরিষদ অথবা বিদ্যালয়ের বোর্ড বিধিমত গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। নিজ অধিক্ষেত্রে শিক্ষার প্রশাসনে তাদের প্রায় পূর্ণ অধিকার থাকে। অননুমত পৌর সংঘের প্রাথমিক শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব থাকলেও শিক্ষার প্রশাসনমূলক কর্তৃত্ব করার অধিকার তাদের নেই।

পৌর নিগম এবং পৌর সভা প্রত্যেকেই তাদের নিজ অধিক্ষেত্রে পাঠাগার এবং পাঠকদের বন্দোবস্ত করে।

৩.৪.৩ পঞ্চায়েত (Panchayats)

পঞ্চায়েত রাজ শিক্ষাক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে। বহু রাজ্যে পঞ্চায়েত রাজ আইন আরোপিত হয়েছে যেগুলি পঞ্চায়েতকে শিক্ষা সংক্রান্ত বেশির ভাগ দায়িত্বভার দিয়েছে। স্থানীয় স্তরে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব নতুন দায়িত্বভারের অন্যতম এবং অবশ্য তা কঠোর নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্দেশের মাধ্যমে।

৩.৪.৪ লোকসমাজ স্তরে অংশগ্রহণ (Community Level Participation)

অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের মতে লোকসমাজের জীবনধারার প্রতিফলন বিদ্যালয়ে হওয়া উচিত। লোকসমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, নিজেদের স্থায়িত্ব এবং উন্নয়নের স্বার্থে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সফল হতে পারে তখনই যখন লোকসমাজের সঙ্গে তার সক্রিয় সম্পর্ক থাকে কারণ বৃহত্তর লোকসমাজে এটি একটি ক্ষুদ্র সমাজ।

সুতরাং যে কোন স্তরে যে কোন শিক্ষাগত পরিকাঠামো গঠনে লোকসমাজের অংশগ্রহণ একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবেকাম্য। এই অংশগ্রহণ বিদ্যালয় স্তরে দুভাবে লাভ করা যেতে পারে।

(ক) লোকসমাজকে বিদ্যালয়ের সমীপবর্তী করে

(খ) বিদ্যালয়কে লোকসমাজের নিকট ঘনিষ্ঠতর করে

৩.৪.৪.১ লোকসমাজকে বিদ্যালয়ের সমীপবর্তীকরণ (Bringing the Community Closer to the School)

লোক সমাজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের লাভ্যাংশের ভাগীদার বিদ্যালয় হতে পারে। এই ভাণ্ডারে আছে চিকিৎসক,

প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, কবি, লেখক, নাট্যকার, ভাস্কর, শিল্পী, গায়ক, সংবাদপাঠক, নৃত্যশিল্প, কৃষক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী প্রভৃতি।

এই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি নিম্নলিখিত উপায়ে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) আমন্ত্রণ দ্বারা : যে কোন ক্ষেত্রে যে কর্মপ্রিয়াটি সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা লাভের নিকটতম হয় সেটি হল সম্ভবত সর্বাগ্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার অংশ। সমাজের কোন বিশেষজ্ঞ সদস্যকে পেশাটির উন্নতিকল্পে তার পেশাগত ব্যাপক অভিজ্ঞতা, নীতি, ইত্যাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে কিংবা তাদের এবং শিক্ষাবিভাগকে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জীবনে সমস্যা ও তার প্রতিকার ইত্যাদি জানতে পারে।

(খ) সামাজিক উৎসব এবং বিদ্যালয়ের উৎসব : গৃহবধূ যাদের বলা হয় সমাজের অবিশেষজ্ঞ তারা এবং সমাজের হতচেতন সদস্যরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দ্বারা আয়োজিত বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। বাৎসরিক উৎসব, পুরস্কার বিতরণী উৎসব, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠান এগুলি তাদের কাছে আগ্রহসূচক এবং যোগাযোগ মাধ্যম হতে পারে। এইভাবে শুরু হওয়া সম্পর্ক বিদ্যালয় এবং সমাজের স্বার্থে বজায় থাকতে পারে।

(গ) পিতামাতার-শিক্ষক সমিতি : অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের বহু সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারেন এবং এইভাবে তারা নিজেদেরও সাহায্য করেন। এই সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য ৩.৪.৬ দেখুন।

৩.৪.৪.২ বিদ্যালয়কে লোকসমাজের সমীপবর্তীকরণ (Taking the School Closer to the Community)

সমাজসেবা একটি পথ যেটির সাহায্যে বিদ্যালয় এবং লোকসমাজকে একত্রীকরণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থী নিরীক্ষণ সংঘের মাধ্যমে সমাজের সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্মত টীকাকরণ এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যা যেগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সমাজের একটি অংশ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের চারপাশের সমস্যাগুলি জানা শুধুমাত্র নয় তাদের এটা জানাও কাম্য যে কিভাবে নিজেদের সময় ও শক্তি ব্যবহার করে যেগুলির সমাধান করা যায়। বিদ্যালয়ের সংঘগুলি সমাজ উন্নয়নকল্পে সাহায্যের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। এগুলির কার্যকলাপ প্রশংসনীয় বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী সময়কালীন সেবার জন্য।

৩.৪.৫ পিতামাতা-শিক্ষক সমিতি (Parent-Teacher Association)

শিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বের অংশীদার হিসাবে গৃহ এবং বিদ্যালয় উভয়েই এই আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পিতামাতা-শিক্ষক সমিতি (PTA) গঠনের চিন্তাটি উদ্ভূত হয়। শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির স্বার্থে শিক্ষকের জানা প্রয়োজন শিশুর বিশেষ আগ্রহ, অভ্যাস, বিশেষভাবে সক্ষমতা, শক্তি এবং দুর্বলতা সম্বন্ধে যাতে করে সে গৃহ থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিদান পেতে পারে।

অপরদিকে, পিতামাতার অবগত হওয়া প্রয়োজন যে বিদ্যালয়ে শিশুর কার্যকলাপ কেমন— তার কোন আচরণগত সমস্যা বা কোন বিষয়ে দুর্বলতা আছে কিনা। অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ে বা সহযোগী কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানাও প্রয়োজন।

সুতরাং শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্যাবলি বিনিময়ের প্রয়োজনীয় স্বার্থে গৃহ এবং বিদ্যালয়ের সম্পর্কের মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।

৩.৪.৫.১ PTA-র কার্যকলাপ (Functions of PTA)

(ক) শিশুর বিদ্যালয়ে থাকাকালীন কার্যকলাপ সম্পর্কে পিতামাতাকে বুঝতে সাহায্য করা।

(খ) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষককে প্রশংসা জানাতে অভিভাবকের সাহায্য করা।

(গ) শিশুর বিশেষ কোন সমস্যা বা দুর্বলতা বুঝতে অভিভাবককে সাহায্য করা।

(ঘ) সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা।

(ঙ) বিদ্যালয়ের কার্যকলাপে সক্রিয় করতে অভিভাবকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং

(চ) বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করতে শিক্ষক এবং অভিভাবকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা;

৩.৪.৬ মিশ্র বিদ্যালয় (School Complex)

শিক্ষা পদ্ধতিটি মূল্যবান। উপাদান এবং মানবিক উৎস দুইই ব্যয়সাপেক্ষ। বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার স্বার্থে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যয়ভার বহন করে। এই ব্যয়িত অর্থ পরোক্ষভাবে কর হিসাবে আমাদের থেকেই সংগৃহীত হয়।

(পাবলিক) বেসরকারি বিদ্যালয়ের অত্যাধিক বেতন সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত আছি। যতটুকু সুবিধা দেওয়া হয় তার থেকে অধিক বেতন নেওয়া হয়। আমরা দেখেছি একদিকে কোন কোন বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, পাঠাগার, পরীক্ষাগার শিক্ষার্থীদের আবাস, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি অন্যদিকে এমনও বিদ্যালয় আছে যেখানে সাধারণ প্রয়োজনীয় যেমন শ্রেণীকক্ষ, বোর্ড, শৌচাগার, পানীয়জল ইত্যাদির অভাব।

উৎসগুলি অংশীকরণের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকার ৮-১০টি বিদ্যালয়কে একত্র করা যেটিকে আমরা বলি মিশ্র বিদ্যালয়। বিনিময়ের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলি চালু রাখে।

- উৎস
- নির্দিষ্ট অফিস
- উপাদান
- শিক্ষা সম্পর্কিত সাহায্য

মিশ্র বিদ্যালয় নমনীয় নমুনা বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির একটি যোগ সমন্বয়।

মৈত্রীবন্ধনের মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে পেশাদারী মনোভাবের উন্নতি সাধন করে। শিক্ষার্থীদের আচার আচরণের উপর লক্ষ্য রাখে।

উৎসগুলির অংশীকরণ সকলের পক্ষেই লাভজনক। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক, যে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য যথেষ্ট স্থান আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম, দ্রব্যাদি সহ সুসজ্জিত বিজ্ঞান পরীক্ষাগার নেই সেই বিদ্যালয় অপর একটি বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের সুবিধা পেতে পারে কিংবা তৃতীয় কোন বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে পুস্তক নেওয়ার সুবিধা পেতে পারে। একইভাবে মিশ্র বিদ্যালয় এবং অংশগুলির মধ্যে শিক্ষকদেরও অংশ করা যেতে পারে।

৩.৫ জেলা স্তরে পরিকাঠামো (District Level Set Up)

শিক্ষাগত পরিকাঠামোয় বিশেষত শিক্ষার ক্ষেত্রে জেলা একটি প্রয়োজনীয় একক। শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশাসন এবং পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান, উন্নতিসাধন এমনকি শিক্ষক প্রশিক্ষণ সব কিছু দেখাশোনার দায়িত্বভার জেলার গ্রহণ করা উচিত। ডিসট্রিক বোর্ড অফ এডুকেশন (DBES) প্রথম চারটির এবং ডিসট্রিক্স ইনষ্টিটিউটস অফ এডুকেশন এণ্ড ট্রেনিং (DIETS) গবেষণামূলক কার্য এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বভারটি গ্রহণ করে।

৩.৫.১ জেলার শিক্ষা এবং শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (District Institute of Education and Training)

১৯৮৬ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত জাতীয় নীতি প্রতি জেলায় একটি করে ডিসট্রিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (DIET) স্থাপন করা বিবেচনা করে। DIET-র উদ্দেশ্যগুলি হল—

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অপ্রচলিত শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত যারা তাদের সকলের জন্য উচ্চমানের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

২। শিক্ষা পদ্ধতির সংশ্লিষ্ট মূল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

৩। নিম্নস্তরের কর্মচারীদের পেশাদারি দক্ষতার উন্নতিকল্পে সুবিধা প্রদান করা।

৪। সমাজের যে সমস্ত শিশু বঞ্চিত, বয়স্ক এবং যারা অবহেলিত তাদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৫। শিক্ষাগত, পদ্ধতিগত এবং প্রযুক্তিগত সর্বাধুনিক অগ্রগতি সংক্রান্ত উন্নতিসাধন করা।

৬। দূরত্ব ও বাধা সম্পর্কিত বাধা ব্যতিরেকে নিম্নতম শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের শিক্ষার উন্নতিসূচক ফল লাভ গ্রহণ করার বন্দোবস্ত করা।

সুতরাং DIET, পেশাদারি অগ্রগতির সুযোগ অভিমুখী বিকেন্দ্রীকরণের সোপান। এটি শহর থেকে গ্রাম, সর্বোৎকৃষ্ট থেকে নিম্নতম, শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষার উচ্চতম থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সুন্দর প্রসারণ। এটি শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পক, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদের মৈত্রীবন্ধনের মাধ্যম।

DIET-র নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা উচিত—

১। জেলার শিক্ষামূলক আবহাওয়ার উন্নয়নের জন্য এটি দায়ী। সুতরাং এটি সর্বোচ্চ মানবিক এবং পার্থিব সম্পদ এর কেন্দ্রবিন্দু। জেলার মূল উৎস হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এটিকে উপাদান, গঠন কৌশল, প্রযুক্তগত বিশেষজ্ঞতার ভাণ্ডার হতে হবে।

২। বাধাইনভাবে কার্য করার জন্য DIET কে শাসন স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং হিসাব সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

৩। শিক্ষকতার পূর্ব এবং শিক্ষকতা চলাকালীন শুধুমাত্র প্রচলিত ক্ষেত্র নয় যারা অপ্রচলিত এবং বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তাদের জন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচি সংগঠন করা।

৪। DEET ডিসকট্রিক বোর্ড অফ এডুকেশনের প্রয়োগমূলক সংস্থা।

৫। জাতীয়, রাজ্য এবং আঞ্চলিক স্তরের প্রতিনিধি সংস্থাগুলির NCERT, NIEP, SCERT, ডিরেক্টরেট অফ এডুকেশন DIET কে সমর্থন করে।

৩.৫.২ জেলার শিক্ষা পর্ষদ (District Board of Education)

জেলার শিক্ষা পর্ষদ, ডিসট্রিক্ট বোর্ড অফ এডুকেশন (DBE) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও সমন্বয়সাধন করে থাকে। কতকগুলি পরিষদের সাহায্যে একজন চেয়ারপার্সনের অধীনস্থ পর্ষদটি কর্ম সম্পাদন করে। বিদ্যালয়, অপ্রচলিত শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচিগুলি সম্পাদন করে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা, স্থানগত পরিকল্পনা, ইনষ্টিটিউশন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, প্রশাসনিক এবং অর্থকরী নিয়ন্ত্রণ এইগুলির দায়িত্ব পর্ষদের।

সারা জেলার শিক্ষাগত গঠন নীতি এবং শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যকলাপের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা পর্ষদের (DBE) করা উচিত। রীতিগত নমুনা নির্ধারণ, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বণ্টন, রেখাচিত্র এবং প্রকল্প ভিত্তি নির্ভর এই পরিকল্পনাগুলি।

যে সমস্ত রাজ্যে পঞ্চায়েত রাজ আরোপিত হয়েছে সেই সমস্ত রাজ্যে DBE-র গঠনটি পঞ্চায়েত রাজ গোষ্ঠীর বিদ্যমান পরিচালকবর্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যান্য রাজ্যে DBE গঠনের সময় শিক্ষাবিদ, মহিলা, অভিভাবক, তফসিলি জাতি/ উপজাতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সকলের প্রতিনিধিত্ব বিবেচিত হয়।

DBE জেলাস্তরে বিভিন্ন আরোপিত শিক্ষামূলক কর্মসূচিগুলির তত্ত্বাবধায়ক এবং উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে। জেলাস্তরে শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে বোর্ডের অধিনস্থ DIET মূল অংশ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ এবং বয়স্কশিক্ষা সহ কর্মসূচিগুলির সমর্থক উৎসের বন্দোবস্ত করে DIET।

৩.৬ রাজ্যস্তরে পরিকাঠামো (State Level Set-Up)

যেহেতু এককটির প্রস্তাবনা পর্বে (3.1) আপনারা পাঠ করেছেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এবং সংযুক্ত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন নমুনা অনুসরণ করা হয়। আপনারা এটিও জানেন যে কোন শ্রেণীবিভাগ বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে হয় এমনকি ব্যাপক বিষয়গুলিরও যেমন মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী; তৃণভোজী, মাংসাশী, সর্বভুক;

fig. 3.1: Classification of Indian States and UTs by structural layers.

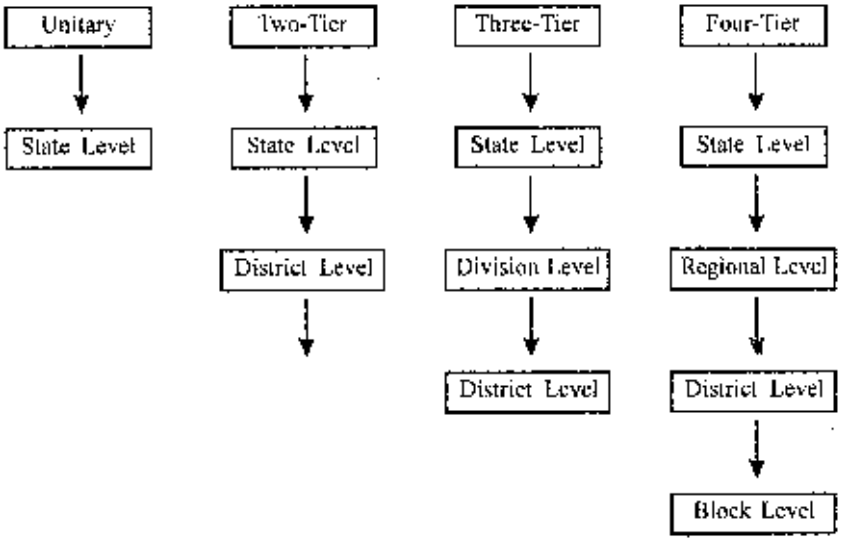

জলজ, স্থলজ, উভচর এবং বৃক্ষসংক্রান্ত। পরিকাঠামোগত স্তরের ভিত্তিতে দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভারতীয় রাজ্যগুলি এবং সংযুক্ত অঞ্চলগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে।

৩.৬.১ ঐকিক পরিকাঠামো (Unitary Set Up)

চণ্ডীগড়, লাক্ষাদ্বীপ এবং দাদরা-নগর হাভেলি এই তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে একজন শিক্ষাকর্তার অধীনে ঐকিক পরিকাঠামো আছে। চণ্ডীগড়ে ডিসট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার তাকে সাহায্য করেন এবং বাকি দুটিতে সাহায্য করেন এডুকেশন অফিসার এবং তার সহযোগি।

৩.৬.২ দ্বিস্তর পরিকাঠামো (Two-Tier Set Up)

এই ধরণের পরিকাঠামোতে দুটি স্তর আছে—রাজ্যস্তর এবং জেলাস্তর। রাজ্যস্তরটি ডিরেক্টর অফ এডুকেশন অথবা ডিরেক্ট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এর অধীনস্থ। জেলাস্তরে ডিসট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার অথবা ডিসট্রিক্ট ইনসপেক্টর অফ স্কুল অথবা ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এডুকেশন আছেন।

মণিপুর রাজ্য, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরা এবং গোয়া ও পণ্ডিচেরির কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে দ্বিস্তর পরিকাঠামো আছে।

৩.৬.৩ ত্রিস্তর পরিকাঠামো (Three-Tier Set Up)

ত্রিস্তর পরিকাঠামোতে ডিভিশনাল স্তরের একজন ডিভিশনাল অফিসার অনুসৃত রাজ্য স্তরের একজন ডিরেক্টর আছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, হরিয়ানা, গুজরাত, পাঞ্জাব, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান নিকোবর, দিল্লি এবং মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ত্রিস্তর পরিকাঠামোটি অনুসরণ করে।

৩.৬.৪ চারস্তর পরিকাঠামো (Four-Tier Set Up)

রাজ্যস্তর, রিজিওনাল অথবা ডিভিশনাল স্তর, জেলাস্তর, ব্লকস্তর, এই চারটি স্তর।

বিহার, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ওড়িশা, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যগুলি চারস্তর পরিকাঠামোটি অনুসরণ করে।

চেক পয়েন্ট :

নিম্নলিখিত লাইনগুলি একটু ভেবে দেখুন লিখিত উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

মধ্যপ্রদেশের অবস্থা কি রকম? এটি চার স্তর পরিকাঠামো ত্যাগ করেছে। এটি কি দ্বিস্তর পরিকাঠামো অনুসরণ করছে? রাজ্যস্তরে ডিরেক্টরের সঙ্গে এবং জেলা স্তরে জেলা সরকারের সঙ্গে? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে জনপদ পঞ্চায়েত যার শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে বলার অধিকার আছে তাকে আপনি কোথায় স্থান দেবেন?

৩.৬.৫ রাজ্য স্তরে পরিষদ (State Level Bodies)

রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাসংস্থাগুলিকে সমন্বয় করতে এবং শিক্ষাগত গবেষণামূলক ব্যবস্থার সাহায্যে সমর্থন জানাতে শিক্ষার পরিমাণগত উন্নয়ন স্বার্থে রাজ্য স্তরে পরিষদের প্রয়োজন। বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের বিভিন্ন পরিষদ আছে। স্টেট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন, স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইনস্টিটিউট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যস্তরে পরিষদগুলি আয়োজিত শিক্ষাগত কর্মসূচির বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্গত—

- শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদান কালীন সময়ে প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা প্রদানের পূর্বে প্রশিক্ষণ
- মূল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ
- পাঠক্রম এবং পাঠ্য পুস্তকের উন্নয়ন
- অপ্রচলিত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি
- পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি
- জনসংখ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি
- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা
- অক্ষম শিশুদের একত্রে শিক্ষা
- শিক্ষাগত কৌশল ক্রিয়া
- কম্পিউটার শিক্ষা
- বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি
- শিক্ষাগত পরিসংখ্যান
- মেধাবৃত্তি
- গবেষণা এবং উদ্ভাবন এবং
- পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা

৩.৭ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহ (Voluntary Organisations)

১৯৪৬-৬৬ সময়কালীন শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করে যে আধুনিক ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নয়নে বেসরকারি সংগঠনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। শিক্ষাসংক্রান্ত জাতীয় নীতি (১৯৮৬) ও সুপারিশ ছিল যে সামাজিক কর্মীবৃন্দ সহ বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে যথাযথ পরিচালনা এবং আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে তারা যাতে শিক্ষা উন্নয়নে সক্রিয় হয় তার জন্য উৎসাহিত করা।

আপনারা অবগত আছেন অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। শিক্ষাক্ষেত্রে হতে পারে সেটি প্রচলিত শিক্ষা, অথবা অপ্রচলিত অথবা বয়স্কশিক্ষা সবকটিতেই তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এটি দেখা গেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিতে প্রায়শই বাধ্য কর্মশক্তিপূর্ণ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কর্মী পাওয়া যায়। এইভাবে এই সংস্থাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করে এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কার্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়।

যাইহোক এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন একজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার কারণ NPE আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হতে যেন বাধা দেওয়া হয়।

শিক্ষাবিভাগ বেসরকারি প্রতিনিধি সংস্থাগুলি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রান্ট-ইন-এই নিয়মাবলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করে। বেসরকারি পরিচালনাধীন বিদ্যালয় এবং শিক্ষাসংস্থাগুলিকে শিক্ষার প্রসারণ, ব্যয় এবং উন্নয়নকল্পে গ্রান্ট ইন এইড হিসাবে, সরকারি তহবিল থেকে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট অংশের অর্থ প্রদান করা হয়।

৩.৮ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- রাজ্যস্তরে শিক্ষাগত প্রশাসনটি Directorate of Education-র অধীনস্থ। কেন্দ্রীয় শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে এটিকে Directorate of Public Institution ও বলা হয়।
- শিক্ষার পরিকাঠামো গঠনে বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার নমুনা অনুসরণ করে।
- SCERT, SIERT অথবা SIE-এর অধীনে বিদ্যাগত উৎস সমর্থিত পদ্ধতিটি
- জেলা-স্তরে শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচিগুলি District Board of Education-র অধীনস্থ
- District Institutes of Education and Training জেলাস্তরে গবেষণামূলক ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলি সংগঠন করে
- স্থানীয় স্তরে, পৌর নিগম, পৌর সংঘ এবং পঞ্চায়েত এর শিক্ষা পরিষদটি শিক্ষামূলক কর্মসূচিও নীতিগুলির তত্ত্বাবধান করে
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে

৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। স্তম্ভাকারে সজ্জিত পংক্তিগুলি মেলান

ক	খ
পর্ব	সময়
১। উচ্চ বিদ্যালয়	১-৩ বছর
২। নিম্ন প্রাথমিক ৫	৫ বছর

৩। উচ্চমাধ্যমিক ২ ২ বছর

৪। প্রাক প্রাথমিক ২ বছর

২। আপনার বিদ্যালয় কেমন করে সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন? আপনার প্রস্তাবনা দিন

৩। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে কিভাবে PTA সহায়তা করে?

৪। মিশ্র বিদ্যালয়ে কিভাবে উৎসগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে তার একটি তালিকা দিন।

৫ : আপনার রাজ্যে রাজ্যস্তর পরিষদ-এর সম্পর্কিত কয়েকটি বিদ্যালয়ের নাম লিখুন।

৩.১০ বাড়ীর কাজ (Assignment)

আপনার এলাকায় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করুন। এই সংগঠনগুলির অধীনস্থ শিক্ষা সংস্থায় কর্মরত শিক্ষকদের অন্তত ৭টি সমস্যা নথিভুক্ত করুন।

৩.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Point for Discussion & Classification)

এই এককটি পাঠ করার পর আপনার কোন বিষয় সম্বন্ধে আরও আলোচনার করার এবং অন্যগুলির ব্যাখ্যাকরণের ইচ্ছা হতে পারে নীচের স্থানে বিষয়গুলি লিখুন।

৩.১২ উৎস (References)

1. Khanna, S.E. *et. el* : 1985, Educational Administration, Planning, Supervision and Financing, Doaba House, New Delhi.
2. M.P. SCERT, 1997, Teacher Education in M.P. : Current Status, Isksues and Future Projections, NCTE, New Delhi.
3. Bhatnagar, R.P. and Vidya Agarwal : 1997, Educational Administration, Supervision, Planning and Financing, R. Lall Book Depot, Meerut.
4. Sukia, S.P. : 1985, Educational Adminsitration, Vinod Pustak Mandir, Agra.
5. Bhargava, S.N.L. : 1990, In Service Education, Progress Printers, Bhopal.

পর্ব-৪

উত্থানশীল সমাজের শিক্ষা

[EDUCATION IN EMERGING INDIAN SOCIETY]

পর্ব-৪

একবিংশ শতাব্দীতে ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা (Education for sustainable Development in 21st. Century)

ভূমিকা (Introduction)

নতুন সহস্রাব্দে উন্নয়নের মুখ্য লক্ষ্য হল মানুষ এবং পরিবেশ প্রতিপালন, মানবিকতা এবং মানবিকতা ও প্রকৃতির মধ্যে স্থানীয়, জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী সংহতি বর্ধন।

বর্তমান মানবজাতি পৃথিবীর এক নবযুগের উন্মেষের সাক্ষ্য বহন করছে যা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের স্তরে রয়েছে এবং যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত এই পরিবর্তনের প্রভাব ও মাত্রা এবং গতি অতীব দুরন্ত।

আগামী দশকগুলিতে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা যেকোন রাষ্ট্রের কাছেই একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। মূল কারণগুলি নির্দিষ্টকরণ গভীরভাবে করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা এই সব পরিবেষ্টিত পরিবর্তনের জন্য দায়ী; পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার উন্নয়নের বর্তমান ধারণা, গতিপ্রকৃতি ও সমস্যাগুলি, ভারতীয় আদর্শ ও উন্নয়নের ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ করা, বিশ্বে ভারতের উন্নয়নের অবস্থান ও তার সম্ভাবনা এবং বহনযোগ্যতা; বিশ্বায়নের প্রবণতা যা পরিবেশ ও বিশ্বব্যাপী উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছে তার প্রত্যক্ষকরণ; ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়নের (India's Human Resources Development) মাত্রা নির্ধারণ; নতুন সহস্রাব্দের জন্য শিক্ষার এক প্রসারিত প্রত্যক্ষকরণ উদ্ভূত করা যা উপরিউক্ত সকল কারণগুলিকে, গতি প্রকৃতি ও প্রক্রিয়াকরণকে হিসাবভুক্ত করে এবং প্রধান ও চূড়ান্ত ও পরিসেবা উৎপাদন করতে সক্ষম— যাদের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে বিদ্যমান থাকার সক্ষমতা এবং স্বাধীনতা; সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ; এবং বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক বাজারে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ক্ষমতা— যারা পারে নতুন সহস্রাব্দের দুই দশকের মধ্যে ভারতকে এক আত্মপ্রত্যয়ী, আত্ম-নির্ভর এবং উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে।

উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পড়বার পর আপনি এক প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্প্রসারণ করবেন—

- উন্নয়নের ধারণাকে
- উন্নয়নজনিত গতিপ্রকৃতি যা ধাবিত হচ্ছে মানব-সমাজের ভিতরে এবং মানবিকতা ও পরিবেশের মধ্যে স্থিত অ-অনুমোদনের দিকে
- বিশ্বের প্রবণতা এবং বিশ্বায়ন যা উন্নয়নের প্রয়াসকে প্রভাবিত করছে আঞ্চলিক, জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে
- বিশ্বে ভারতের উন্নয়নের অবস্থান
- ভারতের সম্ভাবনাপূর্ণ উন্নয়ন এবং বহনক্ষমতা
- নতুন সহস্রাব্দের জন্য ভারতের প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি
- সৌরযুগ সভ্যতার বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক গ্রাম একবিংশ শতাব্দীতে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের প্রতিরূপ
- ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়নের (HRD) প্রয়োজনীয় মাত্রা/দিকগুলি
- অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের নিমিত্ত শিক্ষা।

একক ১ ❑ উন্নয়নের ধারণা (Concept of Development)

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ উন্নয়ন কি?

১.৩.১ প্রবণতা ও পরিণতি

১.৪ বিশ্বের প্রবণতা এবং উন্নয়নের ওপর তার প্রভাব

১.৪.১ শিল্পায়নের প্রক্রিয়া, প্রযুক্তিগত পছন্দ এবং অর্থনৈতিক মেরুকরণ

১.৪.২ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও Mechotronics যুগের আবির্ভাব এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পরিবর্তন

১.৪.৩ জনসংখ্যা বৃদ্ধি: পরিবেশগত উৎস এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য

১.৪.৪ পেট্রোলিয়াম যুগের ক্রমোন্নতি এবং একবিংশ শতাব্দীতে এর রূপান্তর

১.৪.৫ বিশ্বায়ন ও বৈষম্য

১.৫ একবিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়ন কাঠামোর ক্রমোত্থান

১.৫.১ গ্রাম স্বরাজ সম্পর্কে গান্ধীজির মতবাদ

১.৫.২ সৌরযুগ সভ্যতায় বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক গ্রাম

১.৫.৩ ভারতে গতিবিধির কার্যের জন্য ব্যবহৃত অনুমোদনযোগ্য উন্নয়ন

১.৬ প্রতিবন্ধকতা এবং আবশ্যকীয়তা

১.৭ সারাংশ

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৯ বাড়ীর কাজ

১.১০ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১১ উৎস

১.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

একটি দেশের উন্নয়নের ধারা বর্তমান পরিভাষায় GDP মাথাপিছু আয়, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবেশগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধেগত পরিকাঠামোর সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের ধারা বিশ্বজনীন বাস্তুতান্ত্রিক চাপ (The planets's ecological stress) এবং মানব বঞ্চনার দিকেই পরিচালিত হচ্ছে যা উন্নয়নের এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। সারা বিশ্বজুড়ে মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভিলক্ষ্যে নির্দেশিত হয় প্রকৃত উন্নয়নের রূপ। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতীয় ধর্ম বিকাশের (holistic development) ধারণাই হল ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধানের উপায়।

১.২ উদ্দেশ্য (objective)

এই এককটি পড়ে আপনি যে বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন, তা হল:

- উন্নয়নের ধারণা
- উন্নয়ন সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা
- উন্নয়নের ভাবনা সম্পর্কিত পরিবর্তন কিভাবে উন্নয়নের গতিকে প্রভাবিত করে
- বিশ্বজনীন প্রবণতাগুলি কি কি এবং পৃথিবীর বাস্তুতান্ত্রিক চাপ কিভাবে মানব বঞ্চনা, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থ বণ্টনকে প্রভাবিত করছে এবং উন্নয়নের ওপর তাদের প্রভাব
- অনুমোদনযোগ্য উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়
- নতুন সহস্রাব্দের অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের প্রতিরূপের উত্থান।

১.৩ উন্নয়ন কি? (What is Development)

১.৩.১ প্রবণতা ও বিচার্য বিষয়সমূহ (Trends and Issues)

তিন বা ততোধিক নিযুত বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব এবং উন্নতি অর্থাৎ আদিমযুগের মানুষ থেকে কৃষিযুগের মানুষ, কৃষিযুগ থেকে শিল্পযুগের মানুষ, শিল্পযুগ থেকে প্রযুক্তিযুগের মানুষ অবধি ক্রমবিবর্তনের যে ইতিহাস তা আসলে শক্তি এবং উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং পরিবেশের 'সৃষ্টি' থেকে পরিবেশ গঠনকারী হিসেবে তার রূপান্তরের মধ্যেই বর্তমান। শিল্প ও প্রযুক্তিবিদরাই হল আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিরই ফসল। অর্থাৎ বলা যায় এটা হচ্ছে মানুষের পার্থিব, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসনের পঠন এবং ব্যবহার প্রয়োগবিধি, যা কিনা আধুনিক সভ্যতার রূপকার। এইভাবে একজন আধুনিক মানুষের পক্ষে একজন ব্যক্তি অথবা দেশের উন্নয়ন আসলে তার উচ্চমানের পণ্য প্রাপ্তির মানদণ্ডেই বিচার্য। অধিক পরিমাণে বস্তু (material) ও ক্ষমতা বা শক্তি (Energy) উপভোক্তারাই হল অধিকতর উন্নত। অর্থাৎ যাদের পরিবেশগত এবং আর্থসামাজিক মূল্য অনেক বেশী। এটা মূল্যায়ন করা হয় মাথাপিছু আয়, GNP, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষাগত মানের মাধ্যমে; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতাসহ একটি আধুনিক গৃহের অধিকার এবং যানবাহন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন দশক ধরে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত নির্বাচন, উপভোগের বা ব্যবহারের প্রকৃতি এবং আয়বণ্টন ভীষণভাবে যুক্ত ছিল বাস্তুতান্ত্রিকচাপ এবং মানব বঞ্চনার সাথে।

The World Commission on Environment and Development (WCED) তাদের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে যে "আমাদের ভবিষ্যৎ এক ... পরিবেশগত উপাদান থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপাদানকে পৃথক করা অসম্ভব।" স্থানভিত্তিক, আঞ্চলিক, দেশভিত্তিক এবং বিশ্বজনীনভাবে বাস্তুবিদ্যা এবং অর্থনীতি আরও বেশী পরস্পরের সাথে এক সূতোয় গ্রথিত হয়ে চলেছে ... কার্যকারণ সম্পর্কের জালে।

কমিশন তার বক্তব্যের সমর্থনে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে বলেছে "উন্নয়নশীল এবং শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উৎপাদন উৎসগত যে-পার্থক্য রয়েছে তার ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলি আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন করছে এবং ব্যবহার করছে পৃথিবীর বাস্তু সংক্রান্ত পুঁজি (ecological capital)"। এই অসাম্যই হল বিশ্বের প্রধান সমস্যা, যা উন্নয়নের প্রধান সমস্যাও বটে (This inequality is the plantes main problem;

it is also its main development problem)।

WCED-র মতে অনুমোদন যোগ্য উন্নয়ন ভবিষ্যতের সাথে কোনও ধরনের সমঝোতা না ক'রে শুধু বর্তমান প্রয়োজনীয়তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে পূরণের চেষ্টা করে।

আশঙ্কাজনকভাবে প্রযুক্তিবিদ্যা যেভাবে শ্রমশক্তির স্থান অধিকৃত করছে, তার অনিবার্য ফল হবে বিশুদ্ধ উৎপাদন—যা সুসংগঠিত রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়নের ধারণা এবং অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ধারণার ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক অর্থে কার্য সম্পাদন করতে চালিত করেছে। UNDP কর্তৃক ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মানব বিকাশের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করার ফলে, উন্নয়নের ধারণার বিকল্প সমীকরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে। 1990 সালে UNDP তার বার্ষিক পত্রিকা 'Human Development Report'-এ এই প্রসঙ্গটি প্রকাশের মাধ্যমে এবিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের HDI (Human Development Index) মূল্যায়িত হয়েছে মানববিকাশের তিনটে প্রাথমিক সূচকের ওপর ভিত্তি করে— গড় আয়ু, শিক্ষাপ্রাপ্তি এবং উপার্জন। HDI বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন মানের প্রতিনিধিত্ব করছে। এভাবে ১৯৯০ সালে UNDP 'Human Development Report'-এর প্রথম প্রতিবেদনে বলেছে মাত্রাতিরিক্ত দারিদ্র্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান এবং আন্তরিকতা দ্বারা মানব কল্যাণ সাধনই হবে উন্নয়নের অভিলক্ষ্য। ১৯৯৫ সালের প্রতিবেদন থেকে মানব উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কল্যাণ ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রস্তাবনার ওপর আলোকপাত করে। আগেরকার ক্ষেত্রকে মাথায় রেখে এই প্রতিবেদনে অতি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে মানববিকাশের স্থান সর্বাগ্রে। সমাজের সবরকম সমস্যাকে জনগণের পক্ষ থেকে এবং মানুষের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে এটি বিশ্লেষিত করা হয়েছিল এই প্রতিবেদনে ... যা উন্নয়নশীল এবং শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। (সারণী নং ১ দ্রষ্টব্য)

সারণী নং ১

মানব উন্নয়নের অবস্থা

(The State of Human Development)

- **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিরূপ** (Economic Growth Model): এটি মানবজীবনের গুণগতমান বা উৎকর্ষ সমৃদ্ধ করা অপেক্ষা GNP-র প্রসারতা নিয়েই কাজ করে থাকে।
- **মানব সম্পদ বিকাশ** (Human Resource Development): এক্ষেত্রে মানুষ প্রাথমিকভাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- **কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি** (Welfare Approaches): কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব সমাজকে উন্নয়নে পরিবর্তনকারী হিসেবে না ধরে উপভোগকারী হিসেবেই ধরা হয়।
- **ন্যূনতম চাহিদার সম্ভাবনা** (The Basic Needs of Apprach): সকলক্ষেত্রে মানুষের পছন্দের থেকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপকরণ এবং পরিষেবা যোগানোর বিষয়টির ওপর।
- **মানব উন্নয়ন** (The Human Development): এক্ষেত্রে আলোকপাত করা হয়েছে মানব পছন্দের প্রতি। যদিও মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে সমস্তরকম সমস্যাগুলিকে পূর্বেকার ধ্যান-ধারণাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে এবং তাদের প্রাধান্য দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়।

সৌজন্যে: Human Development Report, 1995 of UNDP.

শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন বৃহত্তর ধারণায় মানববিকাশ প্রসঙ্গে জোরালো ভাষায় তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছে যে একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাকেই মানব উন্নয়নের ভিত হিসেবে পরিগণিত করতে। শিক্ষার একটি মূল কাজ হল মানবিকতাকে নিজস্ব উন্নতিসাধনে প্রয়োগ করানো। উন্নয়নের ক্ষেত্রে কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছে অর্থনৈতিক

সমৃদ্ধি থেকে মানববিকাশের। একবিংশ শতকের সমস্যাসকল অতিক্রমের উপায়গুলির ওপর কমিশন আলোকপাত করে। সমস্যাগুলি রয়েছে—

- বিশ্ব এবং আঞ্চলিকতার মধ্যে
- সমষ্টি এবং ব্যক্তির মধ্যে
- ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে
- স্বল্পমেয়াদ এবং দীর্ঘমেয়াদের বিবেচনার মধ্যে
- প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সমসুযোগ লাভের ক্ষেত্রে
- জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং তা মানুষের আত্তীকরণের মধ্যে, এবং
- আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতার মধ্যে।

১৯৯৮ সালে HRD মানব উন্নয়নের পরিমাণ সম্পর্কে বুঝতে পারে যে, "মানব বিকাশ সম্পর্কিত ধারণা HDI অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। একটি সার্বিকভাবে বোধগম্য মাপকাঠি পাওয়া অথবা এমনকি সার্বিক ভাবে বোধগম্য সূচক বা নির্দেশক সমূহ নির্ধারণ করা অসম্ভব— কারণ মানববিকাশের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক অপরিমেয়।"

১.৩.২ উন্নয়নের ভারতীয় ধারণা (Indian Concept of Development)

ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নয়নের মূলনীতির ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে ভারতের প্রাচীন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের দ্বারা। এর সর্বোচ্চ অভিষ্ট লক্ষ্য পাওয়া যায় 'সত্যম' (Satyam) থেকে— সত্য যা অস্তিত্বের শাশ্বত নীতি; এর সূত্রগুলো এসেছে 'ঋতম' (Ritam) থেকে, যা সচেষ্টতার সূত্র অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এবং বৈষয়িক প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে; শক্তিমত্তার উৎস হল 'তপ' (Tapa)— যোগশক্তির (Yogashakti) অপরিসীম ক্ষমতা-যা চিত্তশক্তি বা যোগশক্তি (Yoga or Chitshakti) তা নিহিত আত্মশক্তির মধ্যে।

গীতার কর্মযোগের ব্যুৎপত্তি ঘটেছে উপরিউক্ত নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে। 'Yogah Karmasu Kaushalam'— কর্মদক্ষতা হচ্ছে Yoga (সারণী নং ২ দ্রষ্টব্য)।

সারণী নং-২

যোগ্যতা: মূল্যবোধ ও মনোভাব
(Competence: Values and attitudes)

গীতায় কর্মীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—

- যারা স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্ম করেন পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, কোনরকম মিথ্যে অহমসত্তা ছাড়া একনিষ্ঠতা এবং মনপ্রাণ সমর্পণ করেন, সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে অযথা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে— তাদের বলা হয় ধার্মিক গুণধর্মালম্বী বা সাত্ত্বিক।
- যারা কাজের সাথে যুক্ত এবং নিজেদের লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম করে (ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য), সাফল্যে উদ্বেলিত ও ব্যর্থতায় হতাশ, স্বার্থপর, ঈর্ষান্বিত ও সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন তাদের বলা হয় আবেগধর্মী বা রাজসিক।
- যারা ধর্মীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে, বাস্তববাদী, অনমনীয় এবং ধূর্ত, কর্তব্য অবহেলাকারী, নিজেদের সহজাত আবেগগুলি তুষ্ট করার জন্য নিম্নস্তরগামী, ভীষণভাবে কর্মবিমুখ ও বিষণ্ণ বা খিটখিটে মেজাজ সম্পন্ন— তাদের বলা হয় অজ্ঞতাপন্থী বা তামসিক।

গীতার কর্মযোগ (Karmayoga of the Geeta) ভারতীয় জীবনধারাকে বহুযুগ ধরে প্রভাবিত করে আসছে। যা সত্য এবং বিশ্বকল্যাণার্থে কাজ করার মূল ভিত্তি প্রস্তুত করে। বহুযুগ ধরে ভারতের সভ্যতার প্রবহমানতার মূলমন্ত্র ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (Vasudhaiva Kutum-bakam) অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবারের মত। Sarvabhutahite rata— বিশ্বকল্যাণ, nirbairah sarvabhutesu সমগ্র জীবজগতের প্রতি সদভাবাপন্ন, samata সমতা এবং ekata— ঐক্য। এগুলো ছিল প্রকৃতি এবং এর বিভিন্ন উপাদান যেমন— বায়ু, জল, মাটি, ভেষজ, অরণ্য ও জীবজন্তু, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ তারা— সবার মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য।

ভারতের প্রাচীন জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা মানব বিকাশের মৌলিক নীতিগুলি ছিল মানবমনকে মুক্ত/প্রসারিত করা এবং পরিপূর্ণতার পথে চালিত করার জন্য প্রস্তুত করা। সেই সঙ্গে ছিল সত্য ও বিশ্ব কল্যাণার্থে স্বাধীনভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত।

প্রাচীনকালে ভারতীয় জীবনধারায় সাধুসন্ন্যাসী এবং ভবিষ্যত-দ্রষ্টাদের স্থান ছিল অনেক সম্মানের এবং উঁচুতে। এঁদের পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জীবন ছিল বাহুল্যবর্জিত কিন্তু তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম।

ভারতীয় জীবনধারার মধ্যেই ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানবসম্পদ বিকাশের রীতিনীতি যার দ্বারা আমাদের কৃষক, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, স্বর্ণকার, রৌপ্যকার, রাজমিস্ত্রী, মুচি, পশম শিল্পী, বাউল, গ্রামীণ চিত্র ও মঞ্চশিল্পী, পটুয়া, রন্ধনশিল্পী (রাঁধুনি), ওঝা, কবিরাজি চিকিৎসক এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্তরা যারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতাকে আয়ত্ত করেছিল তাদের কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে।

The AICTE Committee on HUman Development by Coupling Education, Vocation and Society (1996)— পূর্বে উল্লিখিত দিকগুলোকে বুঝতে পেরেছে এবং জোরালোভাবে বলেছে যে এই ব্যবস্থার ফলে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আদর্শই বিকশিত হয়নি, সেইসঙ্গে বিকাশ ঘটেছে সমাজের মূল্যবোধ, আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিটি মানুষই অনুভব করে এর উপস্থিতিকে এবং উপলব্ধি করতে পারে এই রীতি-নীতির প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকারিতা। তবুও এসবকে অবহেলা করা এবং এসব থেকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতাই রয়েছে আমাদের মধ্যে ... এভাবে এই রীতিনীতিগুলি থেকে ক্রমাগত দূরত্ব বজায় রাখার পরিণাম হয় হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক, বিশেষত যখন আমরা এখন আরো সদর্থক কোনো ব্যবস্থাকে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত হিসেবে প্রস্তুত করতে পারিনি। প্রকৃত ভারতে বিধিবদ্ধ প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থা সংজ্ঞায়িত হতে পারে বস্তুতঃপক্ষে তথাকথিত সেই অবিধিবদ্ধ ব্যবস্থার পর্যাপ্তসংখ্যক মাপকাঠির বিচারে। অর্থাৎ প্রাচীন ধ্যানধারণাগুলোকে আমরা যতই অবহেলা করি না কেন, কিন্তু আজকের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাপার জন্য পুরনো পদ্ধতির এরূপ ক্ষমতা আছে যার মাধ্যমে এমন পর্যাপ্ত পরিমাণ মাপকাঠি প্রস্তুত করা যায় যা বিধিবদ্ধ প্রযুক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ করার উপযুক্ত। ... বহুসংখ্যক মানুষ সেই প্রকৃত ভারতে (real India) বসবাস করেন— সেই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অবহেলা প্রান্তিকীকরণের প্রবণতা রয়েছে .... কিন্তু তারা ভুলে যান এ দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পেছনে এই তথাকথিত অবহেলিতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা।

বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গন্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণণ, জাকির হুসেন— প্রমুখ আধুনিক যুগের জাতীয় চিন্তাবিদরা এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন যে মানুষের মনের মুক্তি, জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং সমাজের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষাই হচ্ছে প্রাথমিক উপকরণ।

"The International Commission on Education for the Twenty-first Century" শীর্ষক প্রতিবেদনে UNESCO-র উদ্দেশে বলেছে, 'Learning: The Treasure Within'— অর্থাৎ "শিক্ষা: অন্তরের সম্পদ"।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নতুন বিশ্বজনীন ধারণার উত্থান ঘটেছে তা প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের কাল থেকে চলে আসা মানব বিকাশের যে ভারতীয় মুখ্য ভাবনা তাকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে।

১.৪ বিশ্বপ্রবণতা এবং উন্নয়নের ওপর তার প্রভাব (Global Trends and their Impact over development)

১.৪.১ শিল্পকরণের প্রক্রিয়া, প্রযুক্তির নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক মেরুকরণ (The Industrialization Process, the Technological Choices and Economic Polarisation)

বিগত দুশ বছর ধরে শিল্পকরণের প্রক্রিয়া এবং বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত কৌশল সমগ্র বিশ্বকে অর্থনৈতিক মেরুকরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে— বিত্তবান বাহুল্য যুক্ত এবং বিত্তহীন সর্বহারা এই দুভাগে বিভক্ত করেছে। ১৯৮০-৮২ সালের গণনা অনুযায়ী এই বিত্তশালী শ্রেণী বিশ্বের ৪১% ভূ-স্বত্ব দখল করে রেখেছে। এদের সংখ্যা বিশ্বজনসংখ্যার মাত্র ২৬ শতাংশ হলেও এরা বিশ্বের বাণিজ্যিক শক্তির ৮০%, ৮৫% কাগজ, ৭৯% স্টীল এবং ৮৬% অন্যান্য ধাতব সম্পদের অংশীদার।

শিল্পোন্নত দেশগুলির সমৃদ্ধশীল বাহুল্য ব্যবস্থার মাদকতাময় নেশায় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির মুষ্টিমেয় উচ্চবর্গের সম্প্রাপ্ত সম্প্রদায় (elite) সমৃদ্ধির ফাঁদে পা দিচ্ছে; সেই সঙ্গে নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেরুকরণের প্রক্রিয়াকে ক্রমাগত প্রয়োগ করছে।

বিশ্বের উৎপাদন সামগ্রীর ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্তির পরিমাণের নজিরবিহীন ভাবে বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। পূর্বে ১৯৫০ সালে $4 trillion এবং ১৯০০ সালে $ 1·5 Trillion ছিল যা ১৯৯৮ সালে গিয়ে দাঁড়ায় $ 24 trillion-এ। কিন্তু ব্যবহারের পরিকাঠামোয় ব্যাপক বৈষম্য বর্তমান। সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার ২০% যারা সর্বোচ্চ আয়বহুল রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্ত তারা সমগ্র ব্যক্তিগত ব্যবহারিক খরচের ৮৬ শতাংশের জন্য দায়ী. সবথেকে গরীব ২০% a minuscule 1·35 ! সর্বোচ্চ ধনী পাঁচজন সমগ্র মাছ মাংসের ৪৫%, সমগ্র শক্তির ৫৮%, সমগ্র কাগজের ৮৪% ব্যবহার করে সেখানে সবথেকে গরীব পাঁচজন ৫%, ৪%-এর কম এবং 1·1% ব্যবহার করে থাকে এসব ক্ষেত্রে।

বিশ্বের ২২৫ জন সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তির একত্রিত সম্পদ প্রায় $ 1 trillion-এর বেশী। এবং এটা বিশ্বের জনসংখ্যার সবথেকে গরীব ৪৭%-এর বার্ষিক আয়ের সমান। ৩২ জন সবথেকে ধনী মানুষের সম্পদ দক্ষিণ এশিয়ার সমগ্র GDP-র থেকেও বেশী। ৮৪ জন সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তির ধনসম্পদ (assets) চীনের GDP-কে অতিক্রম করে ২২৫ জন ধনী ব্যক্তির একত্রিত সম্পদের ৪% এর কম ($ 40 billion per year) থেকে সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিশ্রুত পানীয় জল এবং শৌচালয়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

দেশভেদে ধনী দরিদ্র পুরুষ নারী এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে অসাম্য বর্তমান। ক্রম প্রসারিত ব্যবহার জনিত ক্ষয় পরিবেশের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে। যেখানে বিশ্বের প্রসারিত ব্যবহার বা ভোগ্যতা প্রধানত বিত্তশালীদেরই উপকারে আসছে সেখানে এই ব্যবহার জনিত ক্ষয়ের পরিণামে যে ক্ষতি তা দরিদ্র মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে।

১.৪.১ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব (IT Revolution) এবং Mechatronics যুগের আবির্ভাব এবং উন্নয়নমূলক পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতা (The Emergence of the age of IT Revolution and Mechatronics and changes in Development Process)

তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব যুগের উত্থানের উত্থানের ফলে দূরত্ব ঘুচে গিয়ে বিশ্বায়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং এই উত্থান "the Quaternary Sector of Economy"-র পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে এবং এই কাজ হচ্ছে জমির ব্যবহার থেকে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা থেকে নিপুণভাবে তথ্য পরিচালনা করার মূল অর্থনৈতিক কাজকর্মের ঐতিহাসিক পদ্ধতির একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। উন্নত দেশগুলিতে যেখানে 'সম্ভাবনাময় শিল্পের' (Sunrise Industries) ব্যাপক উন্মেষ এবং "অস্তমিত শিল্প সমূহর" (Sunset Industries) পর্যায়ক্রমিক সমাধানের অবস্থা রয়েছে সেখানে তথ্যপ্রযুক্তি, micro-electronics এবং বায়ো টেকনোলজির প্রভাব জাজ্বল্যরূপে বর্তমান। সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কথা হল এই যে শ্রমিকের বহুল পরিবর্ত বা বিকল্প হিসেবে প্রযুক্তির উপস্থিতি।

১.৪.৩ জনসংখ্যা বৃদ্ধি: পরিবেশগত উৎস এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে ক্রমাগত বৈষম্য (Population growth: Increasing incompatibility between Enviromnetal Resources and Growing Number of People)

১৬৫০ সালে ৫০০ million থেকে ১৯৭৬ সালে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা পৌঁছায় ৪০০০ million-এ। প্রথম দশায় এই সংখ্যার দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছিল ২০০ বছর (১৬৫০-১৮৫০), দ্বিতীয় দশায় ৮০ বছর (১৮৫০-১৯৩০) এবং অন্তিম দশায় ৪৬ বছর (১৯৩২-১৯৭৬)।

UN মিডিয়ার প্রতিফলনে আনুমানিক গণনা অনুযায়ী ২০০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ billion ছাড়িয়ে যাবে। ২০২৫ সালে ছাড়িয়ে যাবে ৮ billion এবং একবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১০ billion জনসংখ্যায় উপনীত হবে। ভারতে ২০০০ সালে জনসংখ্যা পৌঁছবে ১ billion-এ, ২০২৫ 1·22 billion ছাড়িয়ে যাবে এবং পরবর্তী সহস্রাব্দের শেষ দিকে ১·৫ billion-এ স্থিতিশীল হবে। কিন্তু UN-এর উচ্চ জনসংখ্যার গণনা অনুযায়ী (High Population Projection, 1992) প্রতিফলন হল— ২১০০ সালে উপরিলিখিত সংখ্যাগুলো কোনরকম স্থিতিশীলতার নিদর্শন ছাড়াই দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

সাম্প্রতিক ১৯৯৬-এর UN গণনা অনুযায়ী বিশ্বে ভারত ও চীনের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৫·৬৩, ০·৯২৯ এবং ১·২২ বিলিয়ন হয়েছে ১৯৯৫ সালে।

১৯৯৫ সালের তথ্যানুযায়ী বিশ্বসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হবে ২০৪৬ সালে। ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে ২০৩৮ সালে এবং চীনে হবে ২০৭৬ সালে।

১.৪.৪ পেট্রোলিয়াম যুগের ক্রমাপসরণ এবং একবিংশ শতাব্দীতে পট পরিবর্তন (The Phassing out of the Petroleum Era and the Twenty-first Century)

আসন্ন শতকের দুদশক পরে পেট্রোলিয়াম যুগের পর্যায়ক্রমে সমাপ্তি ঘটবে বলেই ভাবা হচ্ছে। নতুন নতুন তেল ক্ষেত্রের আবিষ্কার এই সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দিলেও আগে অথবা পরে পরবর্তী শতকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। ভাল অথবা খারাপ যাই হোক ভারত হচ্ছে পেট্রোলিয়াম ঘাটতি যুক্ত দেশ।

এমতাবস্থায় তেল ছাড়া অন্য দীর্ঘস্থায়ী শক্তি উৎসের কথা বিশ্বকে ভাবতে হবে। (Economic activity) অর্থনৈতিক কাজকর্ম, শক্তি উৎসগুলির পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হবে। এধরনের ক্ষেত্রগুলো জলবিদ্যুৎ

শক্তি ক্ষেত্র, জ্বালানীশস্য ক্ষেত্র, শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্র সমৃদ্ধ সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর মত অঞ্চল, ঘন বনভূমি, Wind filed, ভূগর্ভস্থিত তাপক্ষেত্র প্রভৃতি। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিবর্তনের ফলে নতুন শ্রেণীর দক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজনীয়তার উন্মেষ ঘটবে এবং এর চাহিদা বাড়বে।

পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির ক্রমশ প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। শক্তির হিসেব রক্ষক, সৌর স্থপতি, আবহাওয়াবিদ, বায়োগ্যাস কলাকুশলী এবং রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বিত গ্রহণযোগ্য কৃষিক্ষেত্রে বনসম্পদ, ভূমি ও শক্তি প্রযুক্তের ক্ষেত্রে যুক্ত কর্মীর প্রভূত চাহিদা হবে। এরফলে পরবর্তী আসন্ন দশক থেকে দক্ষ শ্রমশক্তি বিকাশের গতির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরী হবে। নতুন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে জনগোষ্ঠীর অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বাড়বে এবং এর ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমবে ও বিকেন্দ্রীভূত হবে। কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠবে গ্রামগুলি। পেট্রোলিয়াম যুগের ধ্বংস হবে এবং তার ফলে বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্র হবে কৃষি। খাদ্যশস্যের সঙ্গে জ্বালানীশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটবে এবং স্থানীয় মানুষের মাধ্যমে স্থানীয় কাঁচামাল এবং উৎস পরিচালিত হবে সবার ভালো এবং গ্রহণীয় জীবনযাপনের জন্য। পূর্বে, বিশ্বে শক্তির রূপান্তর ছিল স্বল্পগতিসম্পন্ন কিন্তু তেল থেকে (sustainable) গ্রহণযোগ্য শক্তির রূপান্তরের সংক্ষেপসাধ্যতা ঘটবে সামান্য কয়েক দশকের মধ্যেই।

১.৪.৫ বিশ্বায়ন ও বৈষম্য (Globalisation and Inequality)

বিশ্বায়নের উন্মেষের ঘটনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত ২৫ বছর ধরে ঘটেছে। অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক খোলাবাজার এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করেছে মূল্য নির্ধারণকারী বিনিয়োগ অর্থনৈতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এটি সমগ্র বিশ্বের ক্রেতা বিপনন কেন্দ্রের সঙ্গে প্রাপ্ত অবাধ সুযোগ সুবিধের অবিরাম গতির সঙ্গে অখণ্ড সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

বিশ্বায়ন— বিশ্বধর্নী, বিশ্বজনীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশ্বজনীন কিশোর কিশোরীদের চিহ্নিত করার জন্য বাজার কেন্দ্রিক গবেষণাকে উদ্দীপ্ত করছে।

৪০টি দেশে ১৫-১৮ বছর বয়সী বিশ্বজনীন কিশোর কিশোরী ২৭০ million-এর বেশী যারা— "একই বিশ্বে বাস করে, এক Pop সংস্কৃতির জগতে বিচরণ করে একই রকম Video দেখে এবং একই ধরনের গান শুনে রসাস্বাদন করে এবং এর ফলে সুযোগ করে দিচ্ছে একই ধরনের বাজার চলতি নামী T-shirts, Jeans-এর ব্যাপক ব্যবসার।"

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী ক্রেতার কাছে প্রভূত পরিমাণ তথ্যের তাৎক্ষণিক উপস্থাপন করে চলেছে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যার মূল্য বর্তমানে $ ৩৫ billion এর সমান। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতের GNP-এর ১$\frac{১}{৪}$-এর সমান।

ক্রেতা অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতা এবং বৈষম্যও সৃষ্টি হয়ে চলেছে এর ফলে। বিশ্বায়নের R & D সম্পর্কযুক্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণী এই ঘটনা থেকে বহির্ভূক্ত। তাদের উপকরণের অভাবই এর জন্য দায়ী এবং এইভাবে বিশ্বায়ন থেকে উপকার লাভে অক্ষম।

১.৫ একবিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়ন কাঠামোর ক্রমোত্থান (Emerging Sustainable Development Model for the twenty-first Century)

১.৫.১ গ্রামস্বরাজ (Gram Swaraj) সম্পর্কে গান্ধীজির মতবাদ [Gandhian Concept of Village Republics (Gram Swaraj)]

প্রযুক্তিযুগের বিভিন্ন দ্বন্দ্বমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধীজির "গ্রাম স্বরাজ"-এর ধারণা একমাত্র সম্ভাব্য ধর্মীয় ও গ্রহণীয় উন্নয়ন প্রতিরূপ হিসেবে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ একবিংশ শতাব্দীতে উন্মেষিত হচ্ছে। কেবলমাত্র মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তাই নয়— এটি এমন একটি পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে যেখানে মানুষ তার পাশের মানুষ বা প্রতিবেশী এবং তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলে বসবাস করতে পারে। এটি গ্রামের আদর্শ বলা যায় গ্রামের লক্ষ্য অথবা প্রয়োজন এবং জাতি বা রাষ্ট্রের লক্ষ্য অথবা প্রয়োজনের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটায় না। এটি কখনই দূষণ সৃষ্টি করে না। বিগত দু শতকের উন্নতির ইতিহাসে উদাহরণ থেকে দেখা যায় "পুঁজিবাদ সামাজিক মঙ্গলের কথা ভুলে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে সেখানে সমাজবাদ সবার মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ত্যাগ করার কথা বলে। গান্ধীজির গ্রামবাদ (Gandhian Villagism) এই মতবাদজনিত সমস্যা সমাধান করে এবং দুটো মতাদর্শের একটি সংশ্লেষ ঘটায় যার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা শুধুমাত্র সবার মঙ্গলের মধ্য দিয়েই তার কল্যাণ খুঁজে পায়। বিশ্বের প্রতি ভারত তার সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যের তরফ থেকে এই সমাধান উপস্থাপিত করতে পারে। এটা এমন একটা জায়গা হবে যেখানে সমগ্র জনগোষ্ঠী প্রাথমিক মানবিক প্রয়োজন যা একটি সন্তোষজনক বিশ্বজনীন মানব অস্তিত্বের কথা বলে— সেই স্থান ছুঁয়ে যাবে। খাদ্য, স্বাস্থ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের মত শারীরিক প্রয়োজনীয়ত্ব এবং শিক্ষা, সৃজনধর্মী কর্মসংস্থান, ব্যক্তি স্বাধীনতার মত সামাজিক প্রয়োজন এবং নিয়ন্ত্রক সমাজ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা— এই প্রয়োজনীয়তাগুলির কোন একটি অস্বীকার করার অর্থ একটি পরিপূর্ণ জীবনকে অস্বীকার করা।

১.৫.২ সৌরযুগ সভ্যতার বৃহৎ শিল্পোত্তর (Meta-industrialic) গ্রাম (Meta-Industrial Village of Solerage Culture)

ভারতীয় গ্রামের বিশেষীয় গুণ এই যে সৌরযুগ সভ্যতায় এটি একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে তোলার প্রস্তুতি ক্ষেত্র। এই সৌরযুগ সভ্যতার ভিত্তি রয়েছে অর্থনৈতিক সংস্থার ওপর যা জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্যের এবং অদ্ভুত প্রতিভার ওপর নির্মিত:

(a) সৌর ও বায়োমাস (bio-mass) শক্তির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

(b) বাস্তুতন্ত্রগত শৌখিন জৈব উদ্যান এবং কৃষি

(c) বাস্তুতন্ত্রর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রযুক্তির ক্ষুদ্রায়ন এবং

(d) বৃদ্ধি এবং শিক্ষার আত্তীকরণের সচেতনাতেক (cybernetic consciouness) সংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে অঙ্গীভূত করার গোষ্ঠী। এটি পুঁজিকেন্দ্রিক অর্থনীতি যা শক্তিরও মুদ্রাস্ফীতি ঘটাচ্ছে তা থেকে মুক্ত হবে এবং একটি স্বগৃহীত শ্রমকেন্দ্রিক অর্থনীতি হবে। ছোট জৈব গোষ্ঠীগুলি মানুষের পক্ষে বড় অজৈব ব্যক্তি মানুষের যৌথ স্তরের থেকে অনেক ভালো অর্থাৎ উন্নততর পালনকেন্দ্র। এবং গণতান্ত্রিক জীবনের প্রকৃত ভিত্তি শুধুমাত্র একটি ছোট প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

১.৫.৩ ধারাবাহিক উন্নয়নের ব্যবহারিক আদর্শ রূপ (Operational Model of Sustainable Development)

গান্ধীজির নির্দেশিত ধারাবাহিক উন্নয়ন আদর্শত বিকাশের প্রতিরূপ। (পরিচ্ছেদ ২.৬ India of Gandhiji's Dream দেখুন)। এটি বিশ্বকল্যাণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ভারতীয় ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে নির্মিত।

ব্যবহারিক উন্নতির প্রতিরূপটি হচ্ছে আধুনিক বিশ্বে উৎপাদনমুখী উন্নতির (Production-Driven Development) পরিবর্তে চিন্তন এবং উন্নতির উন্নয়ন (Development Driven)। এর উদ্দেশ্য—

- বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন প্রেক্ষিতে কম করতে হবে।
- প্রতিটি গ্রাম অথবা গ্রাম গুচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্বনির্ভর করতে হবে।
- সৃজনমূলক কর্মসংস্থানের স্বাধীন মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তিকে পুরো বছর ধরে কর্মে নিয়োজিত করতে হবে।
- স্থানীয় অঞ্চলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এমনভাবে প্রযুক্তির মনোনয়ন করতে হবে যাতে শ্রমিকের পরিবর্তে প্রযুক্তি প্রাধান্য না পায় এবং শ্রমিককে কর্মহীন হতে না হয়।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যানবাহনের সুবিধার মাধ্যমে গ্রামকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
- সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক মানবিক প্রয়োজন সমূহ মেটাতে হবে।
- মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংহতিকে কাজে লাগিয়ে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যকে উপলব্ধি করতে হবে।

১.৬ প্রতিবন্ধকতা এবং অনুজ্ঞা সমূহ (Hurdles and imperatives)

গান্ধীজি 'সাতটি সামাজিক পাপ' (Seven Social Sins) চিহ্নিত করেছিলেন যা মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

সারণী-৩

সাতটি সামাজিক পাপ
নীতিহীন রাজনীতি
শ্রমহীন সম্পদ
নৈতিকতাহীন বাণিজ্য
চরিত্র ব্যতীত শিক্ষা
মানবিকতা রহিত বিজ্ঞান
বিবেকহীন আনন্দ
ত্যাগ ব্যতীত পূজা
Gandhiji

HRD (বিশেষত দক্ষ মানবশক্তির বিকাশ)— তৃণমূলস্তরে এই খারাপ দিকগুলো খেয়াল রাখবে এবং মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে শোধিত করার ব্যবস্থা নেবে। এই অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে WCED-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের স্থানীয় জেলা, বিভাগ, রাজ্য, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রয়োজন—

আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা	:	সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা।
আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	:	উদ্বৃত্ত বস্তুসামগ্রী এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে ধারাবাহিক ভিত্তিতে সঞ্চালন করা।
আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা	:	অসঙ্গতির পূর্ণ বিকাশজনিত উত্তেজনার প্রশমনের ব্যবস্থা করা।
আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা	:	উন্নয়নের জন্য বাস্তুবিদ্যার ভিত্তিকে সংরক্ষণের বাধ্যতাকে সম্মান জানানো
আমাদের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা	:	নতুন নতুন সমাধানের জন্য নিরন্তর গবেষণা করা
আমাদের জাতীয় বৈদেশিক নীতি	:	বাণিজ্য এবং অর্থনীতির কাঠামোকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে পালন করার জন্য বৈদেশিক সমঝোতার জন্য চেষ্টা করা

তৃণমূলস্তরে উপরে লিখিত ব্যবস্থার দৃঢ়ভিত্তি, যতটা প্রাসঙ্গিক সম্ভব, Block Level Vocational Institute (BLVI)-এর মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। BLVI একটি R&D সংগঠন হবে যা উন্নয়নের ক্ষমতা এবং Profile কাজের দীর্ঘমেয়াদী (20 yrs) এবং স্বল্পমেয়াদী (5 yrs ও বার্ষিক) উন্নয়ন পরিকল্পনার শিক্ষা এবংং মানব সম্পদের শিক্ষণের বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ কর্মসূচী যা নির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে চালিত, পঞ্চায়েত এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা নির্দিষ্ট ভাগে যারা কাজ করছে ব্লকের অনুমোদন যোগ্য উন্নয়নের জন্য। এটি R&D সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে কারণ উত্থিত সমস্যার সমাধান এবং এই অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তার জোগান দেবে।

১.৭ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- নতুন সহস্রাব্দের উন্নয়নের মূল্য লক্ষ্য হল মানুষ এবং পরিবেশের স্থায়িত্ব যা অর্জন করা যায় মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিকতার সঙ্গে এবং মানবিকতা ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় বর্ধন দ্বারা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উপভোগের ধরন এবং প্রযুক্তিগত বাছাইয়ের বিশ্লায়নের ধরন গত শতাব্দীতে পৃথিবীর বস্তুগত চাপ (Planet's ecological stress) এবং মানবঞ্চনার জন্য প্রভূত পরিমাণে দায়ী।
- তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব "The quatenary sector of economy"-কে পথ প্রদর্শন করছে এবং এই কাজ হচ্ছে জমির ব্যবহার থেকে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা থেকে নিপুণভাবে তথ্য পরিচালনা করার মূল অর্থনৈতিক কাজকর্মের ঐতিহাসিক পদ্ধতির একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

- অর্থনৈতিক শব্দ দ্বারা উন্নয়নকে পরিমাপ করা যায় না। UNDP-এর মত সংশ্লিষ্ট UN সংগঠন এক প্রসারিত অর্থ আরোপ করেছে উন্নয়নের ধারণাতে যা অর্থনীতিকে অতিক্রম করে এক নাগরিক, সাংস্কৃতিক ও বাস্তুসংস্থাগত মাত্রাকেও পরিবেষ্টিত করে।
- ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতি সাধুসন্ন্যাসী এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের স্থান দিয়েছিল সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে যাদের সামাজিক জীবন ছিল বস্তুল্যবর্জিত কিন্তু তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। বহুযুগ ধরে ভারতের সভ্যতার প্রবাহমানতার মূলমন্ত্র ছিল যে সমগ্র বিশ্ব হল আমাদের পরিবার এবং যা সত্য ও বিশ্বকল্যাণার্থে কাজ করার মূল ভিত্তি প্রস্তুত করে।
- প্রতি পালনীয় উন্নয়ন (Sustainable Development) ধারিত হয় বর্তমানের চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণের ক্ষমতার সঙ্গে আপোষ করে।
- গান্ধীজির 'গ্রাম স্বরাজের' (Village Republic) ধারণা উন্মেষিত হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্রতিপালনীয় উন্নয়ন প্রতিরূপ হিসাবে— এক পদক্ষেপ সৌরযুগ সভ্যতার বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক গ্রাম-এর দিকে
- ভারতীয় গ্রামের বিশেষ গুণ এই যে সৌরযুগ সভ্যতায় এটি একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে তোলার প্রস্তুত ক্ষেত্র।
- প্রতিপালনীয় উন্নয়নকে কার্যকরী করা যেতে পারে শান্তি ও সংস্কৃতিপূর্ণ পরিবেশে (Peace is a positive condition of mind with a sense of settled and harmonious rest and deliverance. It can be a habit of mind and can be inculcated through living example to the class and mass)।
- প্রতিপালনীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা প্রযুক্তিগত ও উৎপাদনের পদ্ধতি অবশ্যই সংবেদনশীল হবে সংশোধনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য।

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(i) আপনার নিকট এক অভূতপূর্ব সুযোগ আছে বারবার প্রত্যাশা জাগিয়ে অগ্রবর্তীর ভূমিকা নেবার এবং প্রতিপালনীয় উন্নয়ন বোধের বীজ যুবসম্প্রদায়ের মনের উর্বর জমিতে বপন করার। এই কার্যে আপনি কোন্ কোন্ বিচার্য বিষয় এবং সমস্যার সম্মুখীন হবেন? এর প্রতিকার কী? উক্ত ঘটনাগুলির সমাধান আপনি কোন্ প্রকারে করবেন?

(ii) উন্নয়নের সংজ্ঞা দিন। আপনার প্রদত্ত সংজ্ঞার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

(iii) প্রতিপালনীয় উন্নয়নের সংজ্ঞা দিন। আপনি কি এরূপ চিন্তা করেন যে প্রথম বিশ্বের উন্নয়নের প্রতিরূপ যা বারংবার প্রচেষ্টার দ্বারা ভারী পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল তা বিশ্বের প্রতিপালনীয় উন্নয়নের নেতৃত্ব দেবে? যদি আপনার উত্তর না হয় তবে তার কারণ বর্ণনা করুন।

(iv) শিক্ষা এক অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার যার সাহায্যে যে কোন গুরুতর সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তারা যদি উদ্যোগী হতে পারেন "চরিত্র শিক্ষা"— এই কলঙ্ককে দূরীভূত করতে, যা গান্ধীজির মতাদর্শে সপ্ত সামাজিক পাপের একটি বলে পরিগণিত, তা হলে অন্যান্য কলঙ্কগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দূরীভূত হয়।— এই বিবৃতির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে আপনার মতামত

যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

(v) বিশ্বের প্রবণতা বা গতিপ্রকৃতিগুলি তালিকাভুক্ত করুন। এগুলি আপনার এবং আপনার সমাজের মানুষের জীবনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে?

১.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

UNDP-এর "মানব বিকাশের প্রতিবেদন ১৯৯৮"— মানব উন্নয়নের নিম্নলিখিত অবস্থার কথা উল্লেখ করেছে:

- অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রতিরূপ: মানব জীবনের গুণমানের উন্নতির পরিবর্তে GNP বর্দ্ধিত করার প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন: মানুষকে প্রধানত উৎপাদন প্রক্রিয়ার জোগান (input) হিসাবে পরিগণিত করে-- a means rather than an edd;
- হিতসাধন দৃষ্টিভঙ্গি: মানুষ দর্শিত হয়েছে 'উপকৃত' হিসেবে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে নয়।
- ন্যূনতম চাহিদার প্রস্তাবনা: সকলক্ষেত্রে মানুষের পছন্দের বর্ধিতকরণের পরিবর্তে উন্নত মনুষ্য সমাজকে জাগতিক বস্তু ও সেবামূলক কর্ম সরবরাহ করার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে বা আলোকপাত করে।
- মানব উন্নয়ন: মানুষের পছন্দের বর্ধিতকরণের কেন্দ্রীকরণ পরিবেষ্টিত করে পূর্বতন বোধকে এবং তাদের অতিক্রম করে এবং মানব পরিপ্রেক্ষিত থেকে সকল বিচার্য বিষয় বিশ্লেষণ করে। এই প্রসঙ্গে ভারত কিরূপে বর্তমান মানব উন্নয়নের সকল কর্মসূচীকে শনাক্ত করবে?

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification)

এই এককটি পাঠ করার পর আপনার ইচ্ছে হতে পারে কিছু কিছু বিষয়ের ওপর আরও আলোচনা ও বিশ্লেষণ। নিচে সেই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করুন:

.....

.....

.....

.....

১.১০.১ আলোচনার সূত্রাবলি (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

১.১০.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলি (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

১.১১ উৎস (References)

1. AICTE (1996): *Technical Education for Real India*, Report of the AICTE Committe on Human Development by Coupling Education, Vocation and Society (Yashpal Committtee). All India Council for Technical Education, New Delhi : (Personal document of Prof. A. K. Mishra, One of the Members of the Committee).
2. *GITA*, XVIII: 26-28.
3. G. GURU (1999): *Perspective for Sustainable Development of India in the Next Millenium, Vocationalisation of Education: Perspectives for the New Millenium, The Challenge;* PSSCIVE, Bhopal, India.
4. G. Guru (1985): *Environmental Problems and their Solutions, Environmental Education: Module for In-service Training of Teachers and Supervisors for Primary Schools*. Division of Science, Technical and Environmental Education, UNESCO, Pari.
5. G. GURU & D.P. SINGH (Ed. 1998): *Environment and development*, PSCIVE (NCERT), New Delhi.
6. KUMARAPPA BHARATAN (1946): *Capitalism Socialism or Villagism* (From Maanthan Special 1980 on Rural Reconstruction, Vol. 3, No. 2, Deendayal Research Institute, New Delhi (P. 42).
7. SRI AUROBINDO (1936): *Bases of Yoga*, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry (1971).
8. ... (1909-1910), *The Ideals of Karmayagin*, Sri Aurobindo Ashram, Pondichery, 1966.

9. ... ( ) *Ideals and Progress*, Sri Aurobindo Ashram, Pondicerry, 1966.

10. SHASTRI, T.V. KAPALI (1950): *Lights on the Fundamentals* (Tattwa Prabha), the gist of Sri Aurobindo's Philosophy), Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry.

11. *Taittariya Upanishad*, Chapter I, Section 9.

12. THOMSON, W.I. (1977): *Clues to a viable Future*, Manthan Special 1980. Journal of Deendayal Research Institute, New Delhi, Vol. 2, No. 2, (p. 45-52).

13. UNDP (1998): *Human Development Report 1998*, Oxforx University Press, Delhi.

14. UNEP (1997): *Major Environmental Problems in Contemporary Society*, UNEP/ ENVED 8; para 13, UNESCO.

15. UNESCO (1996): *Learning: The Treasure Within*, Report of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO, Paris.

16. UNESCO-APEID (1992): *New Directions in Technical and Vocational Education*. UNESCO Principal Regional Office for Asia and Pacific, Bangkok. (P. 1-5,7).

17. WCED: *Our Common Future*, The Report of the World Commission on Environment a ' Development.

একক ২ ❑ একবিংশ শতাব্দী: ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Twenty-first Century: Indian Vision)

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ বিশ্বে ভারতের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য (Mission)

২.৪ বিশ্বে ভারতের উন্নয়নের অবস্থা

২.৫ উন্নয়ন ক্ষমতা এবং বহন যোগ্যতা

২.৬ গান্ধীজির স্বপ্নের ভারত

২.৭ ভারতের প্রযুক্তিগত দৃষ্টি

২.৮ ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়নের (HRD) বিভিন্ন দিক

২.৯ প্রতিপালনীয় বা অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

২.১০ প্রতিপালনীয় বা অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

২.১১ এককের সারাংশ

২.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.১২ বাড়ীর কাজ

২.১৩ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১৪ উৎস

২.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

একবিংশ শতাব্দীর ভারতের লক্ষ্য (Twenty First Century India Vision) ২০২০ সালের মধ্যে অর্থাৎ নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দুটি দশকে, ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিষ্ট লক্ষ্য নেওয়া হয়। উন্নয়নের ওপর যে জোর দেওয়া হবে তার ভিত্তি নির্ভর করবে বিশ্বে ভারতে বর্তমান উন্নয়নশীলতার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ওপর, তার সঙ্গে এর ওপর ক্ষমতা এবং বহনযোগ্যতা: HRD প্রয়োজনের বিভিন্ন দিক এবং অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের প্রয়োজনীতা হবে এর ভিত্তি স্বরূপ। ভারতের প্রযুক্তিগত দৃষ্টির আবেদনের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। ভারত একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। এটি "গান্ধীজির স্বপ্নের ভারতকে" মানুষ একে অপরের মধ্যে এবং মানুষ এবং পরিবেশ সম্পর্কে সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে পূর্ণ

করবে। এর ফলে ভারত শান্তি এবং নতুন বিশ্বক্রমের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এটাই বিশ্বে ভারতের কাজের উদ্দেশ্য। বিশ্বের ভারতের পক্ষে বর্তমান সময়ই সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল অবস্থাগুলোর অন্যতম।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ে আপনি যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন তা হল

- বিশ্বে ভারতের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য
- বিশ্বে ভারতের উন্নয়নের অবস্থা, উন্নয়ন ক্ষমতা এবং বহনযোগ্যতা
- গান্ধীজির স্বপ্নের ভারত এবং প্রযুক্তিগত দৃষ্টি
- ভারতের HRD প্রয়োজনের বিভিন্ন দিক এবং
- অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের প্রয়োজনের মাত্রা

২.৩ বিশ্বে ভারতের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য (Indias' mission in the world)

"The Foundation of Indian Culture" বইতে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, "ভারতের জনগণের জীবন, সংস্কৃতি এবং সামাজিক আদর্শগুলিকে যে মূল ভাবনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে তা হ'ল মানবের প্রকৃত আত্মা ও জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য মানুষের অন্বেষণ। যেটা তার নিম্ন শারীরিক এবং মূলত মানসিক প্রকৃতির প্রয়োজনীয় উদ্ভবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটি কাঠামো এবং সেই আবিষ্কারের মাধ্যম বা পথ হিসেবে এবং মানুষের অবহেলিত প্রকৃতি থেকে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের উত্তরণ হিসাবে— এই কাজ সম্পাদিত হয়। এই প্রধানাশালী চিন্তা ভারত তার প্রবল পরিমাণ চাপ এবং বস্তুগত বাহুল্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্মাণের বাহ্যিকতার মধ্যেও পুরোপুরি ভুলে যায়নি।"

পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা বলেছেন,— বর্তমানে ভারতের সর্বপ্রথম সমস্যা হল তার অতীতচারণ এবং তার আত্মার রূপান্তরিতকরণ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, "India must be saved for the good of the world since India alone can lead the world to peace and a new world order"— তিনি এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে— ভারতের ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট। ভারত হচ্ছে বিশ্বের গুরু (Guru), ভারতের ওপরই নির্ভর করছে বিশ্বের ভবিষ্যৎ কাঠামো। ভারত হল জাগ্রত আত্মা। ভারতই সমগ্র বিশ্বে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে রূপ প্রদান করছে। ভারতীয় সরকারের অবশ্যই এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে তাদের পরিকল্পনা এবং কার্যকলাপ ঠিক করতে হবে।

শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, "By the law of struggle which is the first law of existance in the material universe, varying cultures are bound to come into conflict."

"যুদ্ধের মাঝখানে অস্ত্রসম্বরণ করে নেওয়া যেমন ক্ষতিকারক তেমনি যে সংস্কৃতি তার বিচ্ছিন্নতাবাদের কাছে হেরে যায়, যে সভ্যতা সক্রিয় আত্মসমর্পণকে অবহেলা করে তা অন্যের দখলীকৃত হবে এবং যে রাষ্ট্র এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা এর আত্মাকে হারিয়ে ফেলবে এবং ধ্বংস হবে।"

But, "India is the Bharat Shakti, the living energy of a great spiritual conception and fidelity to it is the very principle of her existance. For by its virtue along she has been one of the immortal nations, this alone has been the secret of her amazing persistence and perpetual force of survival and revival."

আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক— এই দুটিকে মন এবং শরীরের মাধ্যমে আত্মার কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে সংহতিপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী অথবা প্রবল বৈষয়িক সংস্কৃতি যা ইউরোপ (পশ্চিম) বর্তমানে পছন্দ করছে তা তার হৃদয় গভীরে মৃত্যুর বীজ বহন করে চলেছে।

"India must defend herself by reshaping her cultural forms to express more powerfully intimately and perfectly her ancient ideal. Her aggression must lead the waves of the light thus liberated in the triumphant, self-expanding rounds all over the world which it once possessed or at least enlightened in far off ages."

এই উদ্দেশ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে একাই এগিয়ে যেতে হবে এবং সম্ভবত সেই এগিয়ে যাবার পথে বাকী পৃথিবী বিরুদ্ধচারণ করবে। অধ্যাপক Lowes-এর বক্তব্যের মধ্যেও সততা রয়েছে— "the opposition is not so much between Asia and Europe, as between India and the rest of the world."

বিশ্বের বুকে এই উদ্দেশ্যে পূরণের লক্ষ্যে ভারতের সাফল্য মানব জগতের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপক Arnold Toynbee বলেছেন, "It is already becoming clear that a chapter (of world history) which had a Western begining will have to have an Indian ending if it is not to end in the self-destruction of the human race."

২.৪ বিশ্বে ভারতের উন্নয়নের অবস্থা (Development States of India in the world)

পৃথিবীর ভূভাগের পরিমাণ ১৩,০৭৫ মিলিয়ন হেক্টর (mha)। ভূভাগের ১১ শতাংশ শস্যক্ষেত্র, ২৪% তৃণভূমি, ৩১% বনভূমি এবং অন্যান্য ভূমির পরিমাণ ৩৪ শতাংশ। ভারতের সম্পূর্ণ ভৌগোলিক আয়তন ৩২৮ mha এবং ভূ-ভাগ হচ্ছে ৩০৪ mha। ভারতের তৃণভূমি বেশী নেই; বনভূমি ৬৭ mha অথবা ২২%; শস্যক্ষেত্রে ১৪২ mha (৪৭%) এবং অন্যান্য ভূমি ৯৫ mha (৩১%)।

বিশ্বের প্রেক্ষিতে সমগ্র বনভূমির ১·৬৫%, ০·৩৮% তৃণভূমি, ১১·৬৪% শস্যক্ষেত্র এবং ১·১% অন্যান্য ভূমি রয়েছে ভারতের দখলে। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যার ১৬ শতাংশের, গরু ছাগলের ১৫% এবং মোষের ৫০%-এর সামর্থে রয়েছে। (সারণী নং ১ দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতা পরবর্তী যে উন্নতি পাঁচ দশক ধরে ঘটেছে, তাতে ভারতের বহুমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে; বর্তমানে এটি বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির দশমস্থানে আছে এবং মহাকাশ অভিযানে ভারত ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। এবং ভারত হল ষষ্ঠতম পারমাণবিক অস্ত্রশক্তি সমৃদ্ধ দেশ যার ক্ষেপণাস্ত্র (Missile) প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশীয়ভাবে উন্নতি সাধনের ক্ষমতা রয়েছে।

Computer Software প্রযুক্তিতেও একটি উন্নত জায়গায় রয়েছে এই দেশ। এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসার পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিশ্ব রপ্তানির ২ থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু

চীন সেখানে ২ থেকে ৭৩ billion ডলার বৃদ্ধি করেছে। কৃষিক্ষেত্র শ্রমশক্তির ৬৪% আত্তীকৃত করে কিন্তু GDP-এর ক্ষেত্রে এর অবদান ২৯%। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমশক্তির ১৬% কাজে লাগিয়ে ২৯% GDP পাওয়া যায়। চাকরিক্ষেত্র ২০ শতাংশ শ্রমিক কাজে লাগায় এবং এর অবদান ৪১% GDP।

ভারত উন্নত পরিবেশ এবং মানব সম্পদশালী (এক মিলিয়নেরও বেশী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ) একটি দেশও বটে। দারিদ্র্যসীমার নীচে ৩০ শতাংশেরও বেশী মানুষ বসবাস করে। UNDP-র ১৯৯৮ সালে Human Development Report অনুযায়ী ভারত Committee of Nations-এ HDI র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী ১৩৯ তম স্থানাধিকারী। এর ১৯% মানুষ পরিস্রুত পানীয় জলপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত; ৭১% মানুষ শৌচালয়ের সুযোগ সুবিধে ভোগ করেন না; ১৫% মানুষ স্বাস্থ্য পরিসেবার কোন সুযোগ পায় না; ৫ বছরের নীচে ৫৩% শিশুর ওজন যথার্থ ওজনের থেকে অনেক কম এবং ৩৮% শিশু পঞ্চম শ্রেণী অবধি পৌঁছাতে পারে না। ১৫+ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৪৮% নিরক্ষর, ৫২% মানুষ যাদের মাথা পিছু আয় US$ ১-এর কম তাদের অবস্থান দারিদ্রসীমার নীচে। সারণী নং ২ দ্রষ্টব্য।

২.৫ উন্নয়ন ক্ষমতা ও বহন যোগ্যতা: ভারতের চিত্র (Development Potential and Carrying Capacity: the Indian Scenario)

বহনযোগ্য ক্ষমতার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল যত সংখ্যক মানুষকে বহন করতে পারে অথবা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে দিতে পারে। বহনযোগ্য ক্ষমতা হল পরিমাণগত শব্দ যা কতকগুলি গণনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। সেগুলি হল—

(i) ভূমিক্ষেত্র, (ii) ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা, জীবনধারণের জন্য বস্তুগত প্রয়োজনের দিক থেকে ক্ষমতাপূর্ণ বা জমির প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা এবং (iii) মানুষের প্রয়োজনীয় প্রতিটি বস্তুগত চাহিদার পরিমাণ।

সারণী-২

Land Utilization in India: Existing Situation and Future Needs

Category of land	Existing situation (1981)			Ultimate Situation (2100)		
	Area in mha	Area in%	per capita in h	Area in mha	Area in%	Per Capita in h*
1. Cropland (net area shown)	142	47	0·20	155	51	0·10-0·050
2. Forest	67	22	0·10	101	33	0·07-0·035
3. Others	95	31	0·14	48	16	0·03-0·015
(a) Not available for Cultivation	40	13				
(b) Fallow land	23	8				
(c) Other uncultivated land	32	10				
Reporting area	304	100	0·44	304	100	0·203-0·1015
Geographical area	329·74	—	0·48	329·74	—	0·219-0·0.1095

সারণী-২

Profile of Human Development

S. No.	Item	Unit	Ref. year	World	All Developing Countries	All Industrial Countries	India	China	USA
1.	Land area	mha	1995	12,848	7,494	5,354	297	929	915
	Agricultural land*	%	1980	11	.	--	56·8	10·66	20·8
	Forest Land	%	1995	26·8	26·0	27·9	21·9	14·4	23·2
2.	Population	million	1995	5627	4394	1223	929	1220	267
			2015	7186	5892	1294	1211	1409	310
3.	Population doubling date	at current growth rate	1995	2046	2037	2223	2038	2072	
4.	Total Fertility Rate		1995	2·9	32	1·7	3·2	1·9	2·0
5.	Labour Force pop	% of Total	1995	48	48	49	43	60	51
6.	Women Labour Force	% of Labour	1995	41	41	44	31	45	45
7.	Percentage of Labourers in								
	Agriculture		1990	49	61	10	64	72	3
	-Industry		1990.	20	16	33	16	15	26
	Services		1990	31	23	57	20	13	71
8.	GDP Share of	US $ billion	1995	27846	4801	227788	324	698	6952
	Agriculture	%	1995	5	14	3	29	21	2
	-Industry	%	1995	33	36	31	29	48	26
	Services	%	1995	63	49	66	41	31	72
9.	Export-Import ratio	Export as % import	1995		91	102	75	100	90
10.	Total external debt	as % of GNP	1995	—	41	—	28	17	—
11.	Debt Service ratio	as % of export of goods and services	1995		19	—	28	10	—
12.	Current account balance before oficial transfer	US $ billion	1995	--	-88	0·47	5·8	1·6	-148
13.	Real GDP per capita								
	Poorest 20%	ppp$	1980-1994	1759	768	4481	527	722	5800
	reichest 20%	ppp$	1980-1994	12581	6159	32272	2641	5114	51705

S. No.	Item	Unit	Ref. year	World	All Developing Countries	All Industrial Countries	India	China	USA
14.	Population without access to								
	-safe water	%	1990-1996	—	29	-	19	33	—
	-Health services	%	1990-1995	—	20	---	15	12	—
	-Sanitation	%	1990-1996	—	58	-	71	76	—
15.	Urbanisation	%	1995	45	37	74	27	30	76
			2015	55	49	79	36	46	81
16.	HDI Rank		1998	—	—	—	139	106	4

Source: UNDP, *Human Development Report 1998* (Data from Tables 16, 21, 22, 24, 27, 40, 41, 43, 45)
* *FAO Production Year Book 1981*

নির্ধারিত বহনযোগ্য ক্ষমতার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে যা আমরা ধরতে পারি তা হল— খাদ্য, জল, পশুখাদ্য, জ্বালানী।

একটি গ্রামের বহনযোগ্য ক্ষমতা বিভিন্ন দিকের ওপর নির্ভরশীল: মাটি বা জমির গুণগতমান, সেচব্যবস্থা, সার, বনভূমি এবং ব্যবসার পরিচালনীতি।

ভারতে কর্ষিত জমির ৩০% ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানেই (ভারতেই) ঘটেছে সবুজ বিপ্লব। শস্যের নতুন নতুন প্রকারভেদ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা গেছে। কৃষী ৭০% আবাদী জমি সেচের সুবিধা লাভ করে না— ফলে এর উৎপাদন ক্ষমতাও কম। জলচাষের (water harvesting) মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার বৃদ্ধি ছড়িয়ে উৎপাদন ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব।

রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) সম্ভব হয়েছে। এগুলো প্রস্তুত হয় পেট্রোলিয়াম থেকে যা বহুমূল্যে আমদানী করা হয়। যাই হোক, পেট্রোলিয়াম যুগ কিছুদিন পরে অথবা আগে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। পরিবর্ত হিসেবে গৃহপালিত পশু, বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রস্তুত সারের কথা ভাবতে হবে। আমাদের গবাদিপশু বনভূমিতে চারণ করে। বনভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এরফলে কমে যায় কিন্তু পশুখাদ্য বন থেকে জোগাড় করে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি পাওয়া যাবে না ততদিন অবধি গোবর, ঘুঁটে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ঘুঁটে থেকে যে গোবর গ্যাস পাওয়া যাবে তাতে চতুর্গুণ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। গৃহাদি রান্নার ক্ষেত্রে এই গ্যাস জ্বালানী হিসেবে কাজ করবে। গোবর (বা Slurry) থেকে ভাল সার তৈরী হবে এবং এ থেকে বনভূমির ক্ষয়ও কিছুটা রোধ করা যাবে। এইরূপ বনভূমি (saved forest) বর্ষার সময় জল ধারণ করতে পারবে এবং গৃহাদি ও কৃষিজ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সারা বছর ধরে সেই জল কাজে লাগানো যাবে।

কৃষিকে ব্যবহার করার জন্য ভূভাগের এক তৃতীয়াংশ অবশ্যই বনভূমি থাকতে হবে। বর্তমানে ভারতের ভূপৃষ্ঠের ২২% বনভূমি। (দ্রষ্টব্য সারণী ১)। ভারতের বনভূমি সংক্রান্ত নীতিতে ৩৩% জমি বনভূমির আওতায় আনার লক্ষ্যে স্থিরীকৃত হয়েছে। বর্তমানে শোষণের বা ধ্বংসের বাহুল্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভূভাগের ১৩% বনভূমি পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের "The State of Forest Report 1991"-এর তথ্যানুযায়ী বনভূমির নবীকরণ (reforestation)-এর পরে নথিভুক্ত বনভূমির পরিমাণ ৭৭ mha এবং প্রকৃত বনভূমি ৬২·৯২ mha, বনভূমির

আওতায় ৩৩% জমি আনতে গেলে বনভূমির ১০১ mha বনজ উদ্ভিদ দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। অন্যান্য ভূ-ভাগ থেকে প্রাপ্ত জমিতে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ এবং বনভূমির পুনর্নবীকরণের মধ্য দিয়েই এই কাজ সম্ভব। আর যত তাড়াতাড়ি এই কাজ করা যাবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল হবে। গ্রামের বাস্তুগত ব্যবস্থা (Village ecosystem) ব্যবসার মাধ্যমে এর যন্ত্রপাতি ও পরিসেবার প্রয়োজনীয়তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য কিছু বস্তুর উদ্বৃত্ত হওয়া প্রয়োজন যা বিক্রি করে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং পরিসেবা কেনা সম্ভব হবে। (সারণী নং ১ দেখুন)

প্রকৃত ভারতের প্রতিপালনীয় বা অনুমোদনযোগ্য উন্নয়ন (Sustainable Development of Real India)

পরিচয় পাওয়া যায় গ্রামে। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি হল গ্রামীণ বাস্তুবাবিদ্যা বা বাস্তুসংস্থান। (দ্রষ্টব্য সারণী নং ১)। উন্নয়নের যে নকশা তুলে ধরা হবে তা অবশ্যই গ্রামীণ অর্থনীতির বাস্তুব্যবিদ্যার শিকড়কে রক্ষা ও সযত্নে লালন পালন করবে। ধারবাহিক উন্নয়নের জন্য এটা অবশ্যই সমাজের প্রতিটি সভ্যের ও এককভাবে সম্পূর্ণ সমাজের দক্ষতা, শক্তি, পরিবেশ, মূলধন এবং পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীতাকে সংশোধিত বা সম্পাদিত করবে। দেশে এইসকল মাথাপিছু প্রাপ্তি প্রভাবিত হয় বৃদ্ধিজনিত কারণবশত যথা জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মূলধন ও দক্ষতা অর্জনের উপায়, অনুসন্ধান ও উন্নতিজনিত কার্যাবলী এবং উক্ত কারণগুলির শ্রেণীগত বন্টনের ওপর। বৃদ্ধির উপায়গুলির মাথাপিছু প্রাপ্তি যখন শহরাঞ্চলে অনেক বেশী তখন তা গ্রামাঞ্চলে অতি নগন্য।

এছাড়া সমাজের আয়তন ও গঠন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং ধারবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া নবনব প্রযুক্তির পছন্দ-অপছন্দ প্রয়োগের বাসনা এবং সঙ্গে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের আকৃতি ও গঠনের বিনিয়োগ সম্বন্ধে যত্নবান হবে।

চিত্র নং ১

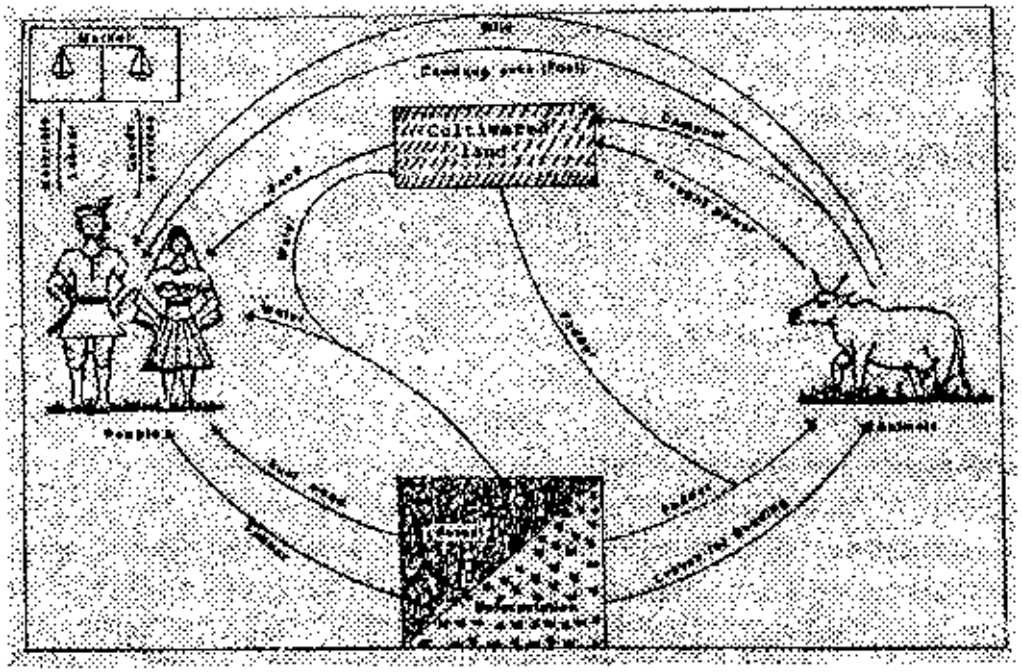

Village Ecosystem

অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের সমাজে স্বতন্ত্র সভ্যের সম্পদের চাহিদা হওয়া উচিত সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুমোদনযোগ্য

সীমারেখার ভিতর। কোন একক ব্যক্তি যদি কোন একটি বা অনেকগুলি সম্পদের ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য সীমারেখা অতিক্রম করে তাহলে সে অপর ব্যক্তিদের সম্পদের অভাব তৈরী করে। অর্থোপার্জিত সম্পদের অপ্রতুলতা বৃদ্ধিজনিত হেতুবশত স্বতন্ত্র ব্যক্তির দক্ষতা নগন্য হয়ে থাকে।

লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান উৎপাদন চালিত উন্নয়ন প্রতিরূপ বা নক্শা (Production driven development model) গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বিচ্যুত জনিককে কাজে লাগাচ্ছে। প্রকৃতভারতের সনির্বন্ধ সমস্যা হল— "How to find work and wages for the millions of villages who are becoming increasingly pauperised." ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার বহু পূর্বেই গান্ধীজি এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে কেন ভারতবর্ষ শিল্পায়ন্বিত হবে পশ্চিমী ধ্যানধারণা বা ধাঁচে? তিনি বলেছিলেন, "The Western civilization is urban, small countries like England or Italy may afford to urbanise their system. A big country like America with a very scarce population, perhaps, can not do otherwise. But one would think that a big country with a teeming population with an ancient rural tradition which has hitherto answered its purpose need not, must no copy the Western model."

আধুনিক দিনের প্রযুক্তিচালিত সভ্যতা যেখানে এক শিক্ষারত মানবসমাজ তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সেখানে কোন রাষ্ট্রই যুগের হাওয়ার (Time Spirit) বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে সাহস করবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের মত এক বৃহৎ ঐতিহাসিক সার্বজনীন রাষ্ট্র তার আত্মিক বৈশিষ্ট্য অঙ্গীভূত করতে পারে এবং এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়ন ও সমদর্শিতায়। মানুষের ক্রমবর্ধমান ন্যূনতম চাহিদা মেটানর জন্য এবং বঞ্চনা দূরীকরণের জন্য আমাদের প্রয়োজন গুণগতমান ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির। কিন্তু প্রাযুক্তিক নির্বাচন হবে আমাদের, যা হবে যথোপযুক্ত এবং নবপ্রবর্তিত কিন্তু অনুকৃত নয়। এটা গ্রামীণ বাস্তুব্যবিদ্যার মূলের পুষ্টিসাধন করবে, পুনরায় মানব সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা বলবৎ করবে ও প্রথাগত প্রযুক্তি ও দক্ষতাকে উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করবে এবং কাজ ও পারিশ্রমিক জোগাবে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সমতা ক্ষুণ্ণ না করেই।

বর্তমান শিল্পায়িত বিশ্ব অর্থনীতি হচ্ছে শোষণমূলক যা ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছে। এটা অন্যদেশের অর্থনৈতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল। এটি স্বয়ংচালিত নয়, এর ফলে সমতা আসতে পারে না কারণ এটি ভেতর থেকেই শোষণমূলক (inherently explitive)। প্রকৃত ভারতে সমৃদ্ধ সম্পদের উৎস মানব সম্পদ এবং গ্রামীণ বাস্তুব্য ব্যবস্থা। সুতরাং এই সম্পদের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের উন্নয়নও ঘটবে। আঞ্চলিক এবং জাতীয় এবং বিশ্বজনীনভাবে মানুষ ও প্রকৃতি এবং মানব সমাজের সংহতি বৃদ্ধি, সমতা অনয়ন, বঞ্চনা দূরীকরণ করতে গেলে উন্নয়নের এই রূপরেখার কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু এই উন্নয়নের রূপরেখাকে কাজে লাগাতে গেলে যান্ত্রিকতাকে একটি নিয়ন্ত্রক যান্ত্রিকতার উদ্ভব করা প্রয়োজন যা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ স্তরে একই সঙ্গে বৃদ্ধির কারণগুলি, গ্রামীণ উন্নয়নের একটি সামগ্রিক পদ্ধতিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থাকে মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে যার ফলে নতুন সহস্রাব্দের প্রারম্ভে এই অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নকে বরণ করা যায়।

আলোচনা

'ধ্বংসাত্মক' কথাটি রূপান্তরের সঙ্গে সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত। Delor-এর প্রতিবেদনে এই ধ্বংসাত্মক রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য।

এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অতীতের আলোকে এবং বর্তমান সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে ব্যবস্থা গ্রহণের। Block Level Vocational Institutions (BLVI)-এর ধারণা ভীষণভাবে কাম্য গ্রহণীয় উন্নয়নের জন্য।

সদর এ (Block) BLVI-এর সাহায্যে গান্ধীজির গ্রামীণ উন্নয়নের ধারণা উপলব্ধি করা যেতে পারে। জেলাস্তরে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় স্তরে PASSCIVE নির্দেশিকা ও সহায়তা করতে পারে।

উন্নয়নের বর্তমান চাহিদা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া মেটানো সম্ভব নয়। এই অনুমোদনযোগ্য উন্নয়ন প্রাপ্তির জন্য উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের সংহতি প্রয়োজন যেমন সবুজ বিপ্লব, প্রজনন বিদ্যা (genetics), তথ্যপ্রযুক্তি, Biotechnology, সৌর এবং Biomass শক্তি প্রযুক্তি, মৎস্যচাষ, জল সংস্কৃতি প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকটিও অবহেলা করা উচিত নয়। শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তিবিদরা অন্যদেরও কাজে লাগান যারা পরিসেবাও যোগান। দেশের বৃত্তিমূলক শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

গান্ধীজির মতে শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে সামগ্রিক মুক্তি প্রদান করে এবং তাকে কার্যকরভাবে সামাজিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণের উপযুক্ত করে তোলে।

ভারতের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ [স্কুলছুট (Dropouts), প্রতিবন্ধী বা অক্ষম দুর্বল শ্রেণী, মহিলা] - তাদের চাহিদার কথা ভেবে বিভিন্ন ধরনের উপযোগী শিক্ষাক্রম গ্রহণ করা উচিত যা এই পরিকল্পনাকে নমনীয়তা প্রদান করবে।

শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষা (V.E)-র উন্নতি করাই একমাত্র কাম্য নয়। উৎপাদিত বস্তু বা পণ্যের গুণগতমান বা উৎকর্ষমানও বাড়াতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার যেকোন প্রতিরূপই উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা অনুযোগকর্তা (Education Commission) (Kothari Commission, 1964-66) উন্নতির সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করেছেন। এখানে গান্ধীজির কর্মশিক্ষার ধারণাকে ব্যক্ত করা হয়েছে কাজের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক করার মধ্য দিয়ে। আমাদের শিক্ষার দর্শন এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার কেন্দ্রে গান্ধীজির কাজকে ঘিরে শিক্ষার ধারণার ওপর জোর দেওয়া উচিত। শিক্ষা অবশ্যই প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষিত এবং পরিচালিত করার ক্ষেত্রটি গ্রহণ করবে এবং এভাবে প্রথম থেকেই শিশু মননে এই ভাবনাগুলোর বিকাশ ঘটবে। অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিচালন এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের উপযোগিতা উপলব্ধি করার খুবই প্রয়োজন। এগুলি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিক্ষা হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী শিক্ষাপদ্ধতি. এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "We learn as long as we live. An Individual or a Society which has nothing to learn is dead."

ভবিষ্যতে শিক্ষানীতিকে তিনটি পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির কথা মাথায় রাখতে হবে। সেগুলি হল— শিক্ষার পরিবেশ, কাজের পরিবেশ এবং তথ্যের পরিবেশ। এইভাবে নাগরিকবৃন্দকে শিক্ষার জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার দিকে উৎসাহিত ও চালিত করা যাবে।

২.৬ গান্ধীজির স্বপ্নের ভারত (India of Gandhiji's Dream)

বর্তমানের প্রয়োজন হল ভারতীয় গ্রামগুলিকে তাদের সহজাত সৃজনশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থ সামাজিক অবস্থাকে ফিরে পেতে হবে এবং এটি সম্ভব করতে হবে আধুনিক জীবনযাত্রার শর্তাবলী এবং প্রযুক্তিকে মানবিকভাবে

আত্তীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করার মাধ্যমে।

মহান গান্ধীবাদী জয়প্রকাশ নারায়রণের মতে— ভারতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভবের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অস্থির ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রামগুলিতে ভারতীয় সমাজে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যা দেশে সবরকম ওঠাপড়ার মধ্যেও স্থিতীশীল ছিল। ভারতীয় স্বশাসিত গ্রামীণ সমাজগুলি ছিল ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ: ... গ্রামের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে এবং তাদের বৈষয়িক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক উন্নতির ক্ষেত্রে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসাসূচক ভূমিকা পালন করত ... শহরজীবন এবং গ্রাম্যজীবন ... উভয়েই বর্তমান ভারসাম্যহীন এবং অসন্তুষ্ট একটি যথোপযুক্ত সমতা ভারসাম্যের জন্য কৃষি ও শিল্পকে একসঙ্গে একটি পরস্পর নির্ভরশীল এবং অসন্তুষ্ট। একটি যথোপযুক্ত সমতা ভারসাম্যের জন্য কৃষি ও শিল্পকে একসঙ্গে একটি পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক সম্পর্কের মাধ্যমে চালিত করতে হবে। ... ভারতীয় গ্রামের মহৎ গুণ হল এই যে ভবিষ্যতের কৃষি শিল্প সমাজের গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি পূর্ব প্রস্তুত ভিত্তি: ... এই সমাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ব্যবহারের কোনো সীমারেখার প্রয়োজন নেই তবে সেই সীমারেখা অবশ্যই মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হবে না। যদি গ্রামকে আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তুত করতে হয় তবে তাকে একটি বৈপ্লবিক বা আমূল রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে। ভারত গ্রামের মধ্যেই বেঁচে আছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে— আমার স্বপ্নের গ্রাম, আমার আদর্শ গ্রাম বুদ্ধিমান মানুষ সম্বলিত হবে। তারা পশুর মত নোংরা এবং অন্ধকারে বাস করবে না। নারী এবং পুরুষ স্বাধীন হবে এবং বিশ্বের যে কোনো মানুষের বিরুদ্ধে নিজেদের তুলে ধরতে সক্ষম হবে। সেখানে প্লেগ অথবা কলেরা, জলবসন্ত হবে না। কেউ বিলাসিতায় গা ভাসাবে না, প্রত্যেককেই তার নির্দিষ্ট কায়িক শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে অবদান রাখতে হবে। আমি একটি খুব বিশদ ও বড় মাপের ছবি আঁকতে চাই না— রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডাক ও তার কার্যালয় প্রভৃতি বিবেচনা করা বা মনশ্চক্ষে দেখা সম্ভব। আমার পক্ষে বাস্তব বস্তুর প্রাপ্তিই হচ্ছে প্রাথমিক এবং সেই ছবিতে বাকী সমস্ত কিছু পরবর্তীকালে স্থান গ্রহণ করবে। যদি আমি প্রকৃত বস্তুকে প্রাধান্য না দিই (চলে যেতে দিই) তাহলে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে।

বিশদে বলা যায়— প্রতিটি গ্রাম আধুনিক যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে। তথ্য বিপ্লব যুগের ক্ষেত্রে একে সংহতিপূর্ণ হতে হবে। এর জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক চাহিদাগুলিকে একটি সন্তুষ্টজনক মানবিক অস্তিত্বের লক্ষ্যে পূরণ করার অবস্থায় একে থাকতে হবে।

২.৭ ভারতের প্রযুক্তিগত দৃষ্টি (India's Technological Vision)

এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগে ভারতের অবস্থান কোথায়? আমাদের নিজেদের ব্যবস্থাকে চালিত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে কি? কতদিন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও শিল্পবিভাগগুলি আমদানিকৃত প্রযুক্তি এবং পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুমতির ওপর নির্ভরশীল থাকবে? আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আর্থ সামাজিক এবং সৈন্যবিভাগের মানুষ নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির জন্য বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে থাকবে?

বিশ্বায়ন, WTO বুদ্ধিগত সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার (Intellectual Property Rights) প্রভৃতির মাধ্যমে প্রদত্ত বাধাগুলোর সম্মুখীন হওয়া এবং সংঘর্ষ করার জন্য আমাদের আর কতদিন লাগবে?

আমরা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে আমাদের Software প্রযুক্তির উন্নতির জন্য গর্বিত কিন্তু Hardware প্রযুক্তির ক্ষেত্রে? Software নির্ভরশীল Hardware-এর ওপরে। চীন ইতিমধ্যেই এক শক্তিশালী সুবিন্যস্ত এবং সুসংহত কাঠামোভিত্তি উন্নত করেছে। এটি বিশ্ববাজারে এর hardware বিক্রি করে বহু বিলিয়ন ডলার উপার্জন করছে

শীঘ্রই এটি ভারতের Software প্রযুক্তিকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান জানাবে। এখন ভারতের যা প্রয়োজন তা হল hardware প্রযুক্তির ভিত্তিটি আরও উন্নত করা।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভিত্তি প্রস্তুত করতে ভারতের আরো কতদিন লাগবে? শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভারত উত্তীর্ণ হতে পারেনি কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ক্ষেত্রে অবশ্যই তা হওয়া উচিত নয়। ভারত কবে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে? এগুলি কিছু অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি যা প্রতিটি ভারতবাসীর মনে উদয় হয়। আমাদের দেশে কি এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান আছে যার মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলোর বিশ্বাসযোগ্য এবং সঠিক উত্তর পাওয়া যেতে পারে?

হ্যাঁ, এরকমই একটি অনবদ্য প্রতিষ্ঠানের নাম— Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC)— যা ১৯৯৮ সালে সূচিত হয়; এর উদ্দেশ্য হল—

- বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত উদ্ভবের দিকে নজর রাখা
- যা ভারতে ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সেগুলো নির্বাচন করা
- সরকার/কলকারখানা, ব্যবহারকারী, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং বুদ্ধিজীবী এবং অর্থপ্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বন্ধনের কাজ করা।
- প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এবং সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় দূরদর্শিতার ভাবনাগুলো পর্যালোচনা করা।
- গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা এবং নেতৃত্ব পেতে গেলে ভারতের যা যা করা দরকার তার সম্পর্কিত উপদেশাবলী সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

TIFAC তাদের প্রতিবেদনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখ্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দূরদর্শিতা ২০২০ হিসাবে কিছু উপদেশ পেশ করেছে। সেগুলি হল:

- খাদ্য এবং কৃষি
- কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (দুধ, খাদ্যশস্য, ফল, শাকসব্জি)
- জীবনবিজ্ঞান এবং জৈবপ্রযুক্তি
- রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শিল্পসমূহ
- বৈদ্যুতিক শক্তি
- কারিগরি শিল্পসমূহ
- বস্ত্র এবং প্রক্রিয়াকরণ
- বৈদ্যুতিন এবং যোগাযোগ
- দূরসঞ্চার ব্যবস্থা
- পরিবহন ব্যবস্থা
- জলপথ
- বিমান পরিবহন (Civil Aviation)

- পরিসেবা
- কৌশলগত শিল্প বা উদ্যোগ (Strategic Industries)
- Advanced Sensor
- আসন্ন শক্তি সমূহের চালনা

একমাত্র প্রযুক্তিই পারে স্বল্পসময়ে সর্বাপেক্ষা সম্পদ উৎপন্ন করতে এবং এইভাবে সবথেকে সংক্ষিপ্ত সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে।

ভারতের আজ যা প্রয়োজন তা হল প্রতিটি ভারতীয় যথা আইনজ্ঞ, বিচারক, পেশাদার প্রযুক্তিবিদ, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, ছাত্র, শিল্পপতি, কৃষিজীবী, দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কর্মী, কৃষক, রাজমিস্ত্রী, সাধারণ মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতার আহ্বান (challenge) গ্রহণ করবে এবং এই কারণের প্রতি দৃঢ় মনোভাবাপন্ন হবে এবং "প্রযুক্তি দূরদর্শিতা-২০২০"-কে দক্ষতা ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রস্তুতি নেবে।

২.৮ ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক (Dimension of India's HRD Needs)

ভারতে HRD-র বিভিন্ন দিকগুলির প্রয়োজনীয়তা তীব্র এবং ব্যাপ্ত;

- স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ
- কর্মসংস্থান কেন্দ্রের (Employment Exchange) Live Registers-এ উল্লিখিত শিক্ষিত বেকারের ৮৫ শতাংশই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (10 and 10 + 2) পাশ এবং ফেল তরুণ-তরুণী।
- কোনরকম উৎপাদন মূলক কাজ ছাড়া:
  - নিরক্ষর
  - নবা বা সদ্য শিক্ষিত
  - গৃহবধূ
  - অক্ষম
- গ্রামীণ কৃষক কৃষকের ৮০% সময়ের চতুর্থাংশ অলসভাবে কাটায়
- গ্রামীণ কারিগর এবং শিল্পী যাদের দক্ষতার উন্নতি এবং সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে
- কলকারখানার শ্রমিক যাদের প্রয়োজন রয়েছে পুনর্শিক্ষণ, পুনস্থাপন এবং দক্ষতার উন্নতি সাধনের।

২.৯ দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা (Needs for Sustainable Development)

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দুই দশকের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রয়োজন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির—

- জলাভূমির প্রায় ৪০ million হেক্টর এবং অন্যান্য ভূমিকে বনভূমির আওতাধীন করা (বনভূমির ৬০ mha-রও বেশী) যাতে সমগ্র ভূভাগের এক তৃতীয়াংশ বনভূমিকে জাতীয় বননীতির (National Forest Policy) এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে সেই সাথে এর ফলে কৃষিকাজের সঙ্গে অন্যান্য গৃহাদি ও শিল্পজাত প্রয়োজনীয়তাও মেটানো যাবে;
- শস্যক্ষেত্রের প্রায় ১০০ mha (সমগ্র শস্যক্ষেত্রের ৭০%) জমির ক্ষেত্রে সেচব্যবস্থা প্রদানের জন্য প্রয়োজন জল আবাদ করা;
- ভেষজ গাছগাছড়া বা ঔষধি বাস্তুব্য-বিদ্যাগত নিরাপত্তা পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে ওই সমস্ত ঔষধি শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা;
- Genetic Pools এবং Bio-diversity এবং দেশের জৈব সম্পদকে পরিচালনা করা;
- গ্রামীণ শক্তি প্রযুক্তির উন্নতি এবং গ্রামীণ শক্তি (biogas and solar) পরিচালনা;
- কৃষিক্ষেত্রে বিপদের মোকাবিলা করা;
- সকলের জন্য খাদ্য, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য শৌচালয় ব্যবস্থা এবং সবার জন্য বাসস্থানের পরিচালনা;
- উন্নতি এবং সুবিন্যস্ত গঠন ব্যবস্থা বিশেষত সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার পরিচালনা;
- প্রয়োজনভিত্তিক কৃষিজ শিল্পের সঙ্গে নমনীয় প্রযুক্তি যা শ্রমিকের অধিকার দখল করে না;
- গ্রামীণ কারিগর এবং শিল্পীদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য গ্রহণীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা এবং বিশ্বের প্রতিযোগিতার বাজারে মোকাবিলা করার জন্য গুণগত মান বাড়ানো;

গ্রামীণ তথ্য সমূহের পরিচালন ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য উপরি উল্লিখিত সূত্রগুলি নীতি, পরিকল্পনা এবং কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলির প্রয়োজন—

- শক্তিশালী বা জোরদার R&D-র সমর্থন
- দেশীয় উন্নতি কৌশলগতক্ষেত্রে গভীর দক্ষতার আত্মনির্ভরতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রাপ্তি।

২.১০ এককের সারসংক্ষেপ (Unit Summary)

- সম্পূর্ণ বুদ্ধিজীবী অথবা তীব্র বৈষয়িক সংস্কৃতি যা পশ্চিমী পছন্দ তা মৃত্যুবীজ বহন করে। প্রয়োজন তাৎক্ষণিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার যথার্থ সংহতি বা মেলবন্ধন। বিশ্বের প্রতি ভারতের মূল উদ্দেশ্য বা কাজ এটাই।

- পৃথিবীর ভূ-ভাগের ২·৪% ভারতের অধীনে কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যা ১৬% এবং বিশ্বের গবাদিপশুর ১৫% রয়েছে এখানে। এটি কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে প্রভাবিত করেছে। এটি দশম শিল্পায়িত দেশ এবং ষষ্ঠতম দেশ যে বহির্বিশ্বে গেছে। এটি Computer Software প্রযুক্তিতে উচ্চস্থান অধিকার করেছে কিন্তু জনগোষ্ঠীর ৪০% দরিদ্রসীমার নিচে এবং ৭১% শৌচালয়ের কোনরকম সুযোগ সুবিধে রহিত এবং জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী নিরক্ষর।
- ভারতের জনসংখ্যাকে ভবিষ্যতের সহনীয়ভাবে সমর্থনের বহনযোগ্য ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু কৃষিকে দীর্ঘমেয়াদি করতে গেলে ভূমির এক তৃতীয়াংশ বনভূমির আওতাধীন করতে হবে। প্রকৃত ভারতের সমৃদ্ধশীল সম্পদ হল মানব সম্পদ এবং গ্রামীণ বাস্তুব্যবিদ্যা। ভারতের অনুমোদনযোগ্য বা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ভিত্তি অবশ্যই হবে এই দুই সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি ও বিচক্ষণ ব্যবহার যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। গান্ধীজির স্বপ্নের ভারত তাঁর গ্রাম স্বরাজের ভাবনার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পেতে পারে। আধুনিক যুগের ক্ষেত্রে সেটি হবে সৌরযুগ সংস্কৃতির বৃহৎ শিল্পোন্নত গ্রাম।
- গ্রাম স্বরাজ এবং প্রযুক্তিগত দূরদর্শিতা ২০২০ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এটি দুদশকের মধ্যে ভারতের HRD প্রয়োজনের প্রবলদিকগুলি সামলাতে পারে এবং ভারতকে উন্নতরাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে।

২.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১. উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে ভারতের অবস্থান কী?

২. দেশের কর্মীজনসংখ্যা সামগ্রিক জনসংখ্যার ৩৬% সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মশক্তির মাত্র ৭৮% কাজে লাগায়। অবশিষ্ট শক্তি সম্পর্কে কি জানেন?

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টিত ভারতের কর্মশক্তি এবং তাদের GDP অবদানের শতাংশ নিম্নলিখিত—

Sector	Working Force	GDP Contribution
Agriculture	64	29
Industry	16	29
Service	20	42
	100	100

আমাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ অভাবে বেকার। অন্যদিকে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের প্রবল প্রয়োজন রয়েছে। কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আগামী দুদশকের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়?

৩. ২০ বছরের মধ্যে আপনার গ্রামকে একটি উন্নত গ্রামে পরিণত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা করবেন? একটি বছরভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

৪. একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হতে গেলে দেশের কোন্ কোন্ চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

২.১২ বাড়ীর কাজ (Assignments)

১. আপনার গ্রামের বাস্তুতন্ত্র (Village Ecosystem) পর্যবেক্ষণ করুন এবং এর বহনযোগ্য ক্ষমতাকে নির্দেশ করুন।

২. একক ১-এর চিত্র ১ দেখুন। এই নক্শা বা প্রতিরূপটি (model) আপনার নিজের গ্রাম/প্রতিবেশী গ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন, সমস্ত ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ করুন। (চিত্রে বর্ণনা উল্লেখ করা আছে)। এবং গ্রামের বাস্তু ব্যবস্থার অবস্থান এবং ক্ষমতা নির্দেশ করুন।

২.১৩ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

এই এককটি পাঠের পর আপনার কিছু/কয়েকটি বিষয়ের ওপর আরও বিশদ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করার ইচ্ছে হতে পারে। সেই দিকগুলি নিচে লিখুন:

২.১৩.১ আলোচনার সূত্রাবলি (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২.১৩.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলি (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২.১৪ উৎস (References)

1. ABDUL KALAM, APJ with RAJAN, YS: *INDIA 2020, A Vision for the Millennium*, Viking Penguin Book (P) Ltd., 11, Community Centre, Panchasheel Park, New Delhi-110 017.

2. AICTE (1996): *Technical Education for Real India*, Report of the AICTE Committe on Human Development by Coupling Education, Vocation and Society (Yashpal Committe). All India Council for Technical Education, New Dehli. (Personal document of Prof. Arun K. Mishra, one of the Members).

3. FAO (1981): *FAO Production Year Book 1981*, (From: Ref 4).

4. GURU G. (1985): *Environmental Problmems & Their Solutions, Environmental Education Series 6*, Division of Science, Technical and Environmental Education, UNESCO, Paris. -(i) P. 80-82.

5. GURU G (1996): *Human Resource Development Perspective for India during Twenty-First Century. Indian Journal of Vocational Education*, Vol. 1, No. 1., July-Dec. 1996, PSSCIVE, Bhopal.

6. IAMR (1995): *Manpower Profile India Year Book 1995*, Indian Applied Manpower Research, Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Marg, New Delhi, (P 73).

7. MAHATMA GANDHI (1946): Extract from *Mahatma Gandhi's letter dated October 5, 1946 to Jawaharlal Nehru* (Original in Hindi).

   .... (ii) *Khadi Gramodyog*, Vol. XXXX No. 1 Oct 1993.

8. MOTHER ( ): *The Mother on India*, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1963.

9. NARAYAN, J.P. (1950): *Building up from the Village, Manthan*, Rural Reconstruction Special, (1980, Vol. 2, No. 2).

10. PSSCIVE (1996): (i) *Environment and Development*, A Text Book of Environmental Education and Rural Development for +2 Vocational Students, PSSCIVE, NCERT, New Delhi, (1980, Vol. 2, No. 2).

    (1998): (ii) *Generic Vocational Course*, Theory Class XII, PSSCIVE, Bhopal.

11. REGISTRAR GENERAL & CENCUS COMMISSION (1992): *Census of India 1991*, Table 2, *Population of India 1901-1991*, Series 1, Paper 2 of 1992, New

Delhi, (P 86).

12. SRI AUROBINDO (1918-21): *Foundation of Indian Culture,* Sri Aurobindo Ashram, Pondichery, 1959.

13. SWAMI RANGATHANANDA, *External Values for a Changing Society*, Vol. III, Bharatiya Vidya Bhawan, Mumbai, P. 57.

14. UNDP (1998): *Human Development 1998*, Oxford University Press, Dehli.

— (i) (p. 14)

— (ii) *Profile of People in Work*, HDI Table 16, P 165.

— (iii) HDI Tables 1 to 26.

— (iv) P. 1-3.

— (v) P. 30 (Box 1-3).

— (vi) Table 22, Population Trend (P. 176-177).

— (vii) P. 6-7.

15. UNEP (1997): *Major Environmental Problems in Contemporary Society*, UNEP/ ENVED 8; Para 13, UNESCO.

16. UNESCO (996): *Learning : The Treasure Within*, Report of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO, Paris.

17. UNESCO-APPIED (1992): *New Directions in Technical and Vocational Education,* UNESCO Principal Regional Office for Asia and Pacific, Bangkok, (P 1-5, 7).

18. WCED: *Our Common Future*, The Report of the World Commision on Environment and Development, WCED.

19. WRI-IIED-UNEP (1989): *World Resources 1988-89*, Basic Books, Inc. New York (Table 15-1, Size and Growth of Population and Labour force ... 1960-2025. Original Source : UNDP and ILO).

একক ৩ ❑ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা (Educational imperatives for Sustainable Development)

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ সাংবিধানিক লক্ষ্য এবং সুযোগ সুবিধা

৩.৪ সকলের জন্য শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা

৩.৫ সকলের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা

- ৩.৫.১ জাতীয় প্রেক্ষাপট
- ৩.৫.২ ইউনেসকোর (UNESCO)-র TVE কার্যক্রম: একবিংশ শতকের ওপর আলোকপাত

৩.৬ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ

৩.৭ মূল্যায়ন, শংসাপত্র প্রাপ্তি এবং কৃতিত্বের স্বীকৃতি

- ৩.৭.১ মূলনীতি
- ৩.৭.২ উদ্দেশ্য
- ৩.৭.৩ পূর্ণ গুণমান নিয়ন্ত্রণ (TQC)
- ৩.৭.৪ কর্মসূচী মূল্যায়ন
- ৩.৭.৫ সম্পাদিত কার্যের মূল্যায়ন
- ৩.৭.৬ শংসাপত্রপ্রাপ্তি/প্রদান
- ৩.৭.৭ কৃতিত্বের স্বীকৃতি

৩.৮ কৌশলগত ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের জন্য গবেষণা ও উন্নতি (R&D)

৩.৯ ভারতের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সামর্থ্য

৩.১০ এককের সারাংশ/স্মরণীয় বিষয়সমূহ

৩.১১ অগ্রগতির পরীক্ষা

৩.১২ বাড়ীর কাজ

৩.১৩ বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.১৪ উৎস

৩.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষাই হল সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম (instrument) যার দ্বারা মানবজাতি তার সম্মুখস্থ যেকোনো সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে এবং যেকোনো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে; নতুন সহস্রাব্দে উন্নয়নের মুখ্য লক্ষ্য যদি মানুষ ও পরিবেশের স্থায়িত্ব হয় তাহলে মনুষ্যত্ব এমন শিক্ষা দাবী করে যা চাপা উত্তেজনা দূর করে ও মানুষ ও মানুষের মধ্যে এবং মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে স্কুল স্তরে যেমন পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় তথা সমগ্র বিশ্বে সমন্বয় বৃদ্ধি করে।

একবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগের সভাপতি Jacques Delors, Commission-এর প্রতিবেদনে UNESCO-কে দেওয়া তাঁর বিবরণের উপক্রমণিকায় বলেছেন, "In confronting the many challenges that the future holds in store, mankind sees in education an indispensable assets in its attempt to attain the ideals of peace, freedom and social justice ... the Commission affirms its belief that education has a fundamental role to play in personal and social development. The Commission does not see education as a miracle cure or a magic formula opening the door to a world in which all ideals will be attained, but as one of the principal means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, oppression and war." কমিশন চিহ্নিত করে যে শিক্ষার এক অন্যতম কাজ হল মনুষ্যত্বকে তার নিজস্ব উন্নতির জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে শেখানো। এটা অবশ্যই সকল মানুষকে কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত নিজ হাতে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দেবে যাতে তারা তাদের যে সমাজে বাস করে তার অগ্রগতির শরিক হতে পারে। এই উন্নতি তাদের ব্যক্তিগত সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে হবে। ... এই প্রসঙ্গে Commission দৃষ্টিগোচর করায় যে আজীবন শিক্ষালাভই হবে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার এক চাবিকাঠি। এটি উপস্থাপন করে সেই ইমারত যাতে রয়েছে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ-শেখার জন্য শিক্ষা, কিছু করার জন্য শিক্ষা, একত্রিতভাবে বাঁচার জন্য শিক্ষা, এবং বর্তমান থাকার জন্য শিক্ষা— যার ওপর ভর করে গঠিত সকল সমাজ এক স্বপ্নরাষ্ট্র তৈরীর লক্ষ্যে অগ্রসর হয় যেখানো কোনে প্রতিভা মাটির নীচে পুঁতে ফেলা সম্পদের মতো অপ্রকাশিত না থকে।

একবিংশ শতকের শিক্ষাকে পূরণ করতে হবে মানুষের উন্মেষিত চাহিদাগুলোকে যা চালিত হয় "স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে বিশ্বসম্প্রদায়", "সামাজিক আসঞ্জন থেকে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ", "অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে মানবিক উন্নতি" এবং "অরক্ষণীয় থেকে রক্ষণাবেক্ষণ সমন্বিত উন্নয়ন"-এ।

শ্রী অরবিন্দ বলেছেন 'A perfect human world cannot be created by men or composed of men who are themselves imperfect'. অর্থাৎ যে মনুষ্যসকল নিজেরাই অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ তাদের দ্বারা কখনই একটি নিখুঁত মানববিশ্ব গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নৈতিক দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট বা নিখুঁত মানুষ তৈরী করা।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পড়ার পর আপনারা যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন তা হল—

- রক্ষণীয় উন্নয়নের নিমিত্ত শিক্ষাগত উপাদেশাবলি;

- শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক লক্ষ্য এবং সুযোগ সুবিধা
- প্রাথমিক শিক্ষা, সকলের জন্য শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সর্বজনগ্রাহ্যতার প্রয়োজনীয়তা; কৌশলগত ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের জন্য গবেষণা ও উন্নতি (R&D)
- রক্ষণীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ মানবশক্তি উদ্ভাবনের জন্য— সকলের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
- শিক্ষা ও বৃত্তিমূলকশিক্ষার ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রয়োজনীয়তা;
- গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও কৃতিত্বের স্বীকৃতির জন্য মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা
- অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশু ও নারীর শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের জন্য

৩.৩ সাংবিধানিক লক্ষ্য এবং সুযোগ সুবিধা (Constituional Goal and Provision)

ভারতের জনগণ সাংবিধানিক ভারতবর্ষ গঠন করেছিল ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারি। এক সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করেছিল। যা সকল নাগরিককে সুবিচার, মুক্তি এবং সমতা দান করে ও সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ করে, সুনিশ্চিত করে প্রতিটি ভারতবাসীর মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের একতা। ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক এই দুটি শব্দ ১৯৫০ সালে সংবিধানে স্থানে পায়নি। ১৯৭৬ সালের ৪২তম পরিবর্ধিত সংবিধানে শব্দদুটি স্থান পায়। ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধানরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সংবিধানের প্রবর্তকগণ (founding-fathers of constitution) গান্ধীজির মানবধর্ম অনুসরণ করে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর ওপর প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছেন—

- আইনের চোখে সকল সম্প্রদায় সমান (ধারা ১৪)
- ধর্ম, জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ওপর ভিত্তি করে ভেদাভেদ নিষিদ্ধকরণ (ধারা ১৫)
- সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে সমান সুযোগ (ধারা ১৬)
- বিবেকবুদ্ধি বা নৈতিকচেতনা, মুক্ত জীবিকা, ধর্মের অভ্যাস ও প্রচারের স্বাধীনতা (ধারা ২৫)
- ধর্মসংক্রান্ত কার্যাবলী স্বাধীনভাবে পালন করা (ধারা ২৬)
- কোনো বিশেষ ধর্মের প্রসারের জন্য রাজস্ব জমা দেওয়ার স্বাধীনতা (ধারা ২৭)
- কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় নির্দেশাবলী দেওয়া যাবে না (ধারা ২৮-১)
- সরকার অনুমোদিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মাচরণে যোগদান বাধ্যতামূলক নয় (ধারা ২৮-৩)
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ও পরিচালনা করার অধিকার প্রদান (ধারা ৩০)
- সকল নাগরিকের জন্য একটি সম ন্যায় সংহিতা (Uniform civl code) সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার (ধারা ৪৪)

- ধর্মীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিকতা এবং শ্রেণীগত বিভিন্নতাকে অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যের স্বীকৃতির সমন্বয়সাধন করা এবং সকল ভারতবাসীর মধ্যে সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের স্পৃহা জাগ্রত করা (ধারা ৫১-A.c)
- বৈজ্ঞানিক মনোভাব, মানবিকতা, ঐক্যস্পৃহা ও সংস্কারের উন্নতিসাধন।

ক্ষমতার বণ্টন (Distribution of Powers)

আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধান সরকারের ক্ষমতাকে কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। যখন কেন্দ্র কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় যথা— প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক কার্যকলাপ, রেল ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তেমনই অন্য অনেক বিষয়ের দায়িত্ব রাজ্যের। শিক্ষা হচ্ছে অনুষঙ্গী তালিকাভুক্ত যা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থপূর্ণ অংশীদারীর অনুমতি দেয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (NDC— The National Development Council) এক সর্বভারতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে সমগ্র পরিকল্পনা পদ্ধতির। শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা [(CABE)— The Central Advisory Board of Education] এক গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য ভূমিকা পালন করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর নিরীক্ষণ ও বিবর্তনের।

প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনগ্রাহ্যতা (UEE) [Universalisation of Elementary Education]

আমাদের সংবিধানের নির্দেশক নীতিগুলি বিবেচনার ক্ষেত্রে রেখেছে চৌদ্দবছরের কম বয়সী সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। এই হিসেবে ১৯৫০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা (UEE) জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা (Education as a fundamental right)

সর্বোচ্চ আদালত (The Supreme Court) শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা জীবনের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে প্রবহমান। এইজন্য চৌদ্দবছরের কম বয়সী শিশুদের শিক্ষা প্রদান আইনানুগভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে রাষ্ট্র এবং অভিভাবকদের জন্য।

ভূমিকার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Role)

সংবিধানের সংশোধিত ৭৩তম ও ৭৪তম ধারা অধিক বিকেন্দ্রীকরণের শর্ত আরোপ করেছে এবং UEE-র প্রতি স্থানীয় সরকার, সাম্প্রদায়িক সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবীসংস্থাগুলোর বৃহত্তর প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

UEE-র জন্য NPE-র প্রসারিত পরিকাঠামো [NPE with a Broader Framework for UEE]।

শিক্ষার জাতীয় কর্মপন্থা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার (UEE) (Universal Elementary Education) আরও প্রসারিত সংজ্ঞা দিয়েছে। এতে জোর দেওয়া হয়েছে নাম অন্তর্ভুক্তকরণের পরিবর্তে অংশগ্রহণ ও তা চালিয়ে যাওয়াতে। UEE লক্ষ্যটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছিল সকল শিশুদের জন্য মুক্ত, আবশ্যিক ও সন্তোষজনক গুণগত শিক্ষার অন্তর্ভুক্তর জন্য— এটা আলোকপাত করে "শিক্ষার ন্যূনতম উচ্চতায় পৌঁছানোর ওপর" (MLL— Minimum Level of Learning)।

UEE-র লক্ষ্য পূরণের সংশ্লিষ্ট বিষয় (Concerns for achieving UEE Goal)

আগামী দশকে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনগ্রাহ্যতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

- চোদ্দবছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুকে মুক্ত এবং সন্তোষজনক মানগত আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা— যেরূপ উল্লিখিত আছে শিক্ষার জাতীয় নীতিতে (NPE— The National Policy of Education)।
- প্রারম্ভিক শিক্ষাকে (EE— Elimentary Education) মৌলিক অধিকারে রূপান্তরিত করার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং তা বলবৎ করা প্রয়োজনভিত্তিক সংবিধিবদ্ধ উপায়ে।
- স্থানীয় সংগঠন, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ।
- শিক্ষাখাতে বরাদ্দ আর্থিক সম্পদকে সহজলভ্য বা সচল করার জাতীয় প্রচেষ্টা দ্বারা উন্নীত করতে হবে GDP-এর ৬%-এ যা বর্তমানে ৪%-এরও কম।

অক্ষমতা ও শিক্ষাসংক্রান্ত এবং অন্যান্য আইনসমূহ (The Disabled and Educational and other Laws)

অক্ষমব্যক্তিসহ সকল নাগরিকের প্রাপ্য শিক্ষার অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ নং ধারা বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেয় অসমর্থ শিশুসহ সকল শিশুকে মুক্ত ও আবশ্যিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবার যতদিন না তারা চোদ্দবছর বয়সী হয়।

বিভিন্ন আইন তৈরী করা হয়েছে অক্ষমদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য: এগুলি যথাক্রমে *The Mental Health Act 1987, **The Rehabilitation Council of India Act 1992, ***The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Rights to full participation) Act 1995, ****The National Trust for Welfare of Persons with Audtims, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999.

* মানসিক স্বাস্থ্য আইন ১৯৮৭,

** ভারতের পুনর্বাসন পর্ষদ আইন ১৯৯২,

*** অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিসকল (সমান সুযোগ, রক্ষা ও পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার) আইন ১৯৯৫

**** জাতীয় অছিব্যবস্থা অটিসম মানুষদের জন্য আইন ১৯৯৯।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থাগুলি হল: মানসিকভাবে অসমর্থদের অধিকার সম্পর্কিত UN-এর ঘোষণা, এবং অক্ষম বা প্রতিবন্ধীদের (Disabled Persons) অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা। UN-এর এই ঘোষণাগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায় এই সকল অধিকার সুরক্ষিত করবার জন্য।

৩.৪ সকলের জন্য শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা (Education for all Life Long Education)

সকলের জন্য শিক্ষা একটি বিশ্বব্যাপী বিষয়। মানবাধিকারের ১৯৪৮ (Human Rights 1948) সর্বজনীন ঘোষণা বলে, প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে শিক্ষার অধিকার "Everyone has the right to education"। পাঁচ দশক পরেও এই ঘোষণা শূন্যই (empty) থেকে গেছে লক্ষ লক্ষ শিশু ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষদের বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের কাছে।

থাইল্যান্ডের Jultien-এ মার্চ ১৯৯০-এ অনুষ্ঠিত সকলের জন্য শিক্ষার ওপর বিশ্ব সম্মেলন (EFA– The World Conference on Education for All) বাধ্য করেছিল সকল সদস্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে যাতে ২০০ সাল নাগাদ অর্জন করা যায় EFA। EFA-এর ওপর এই বিশ্বঘোষণার লক্ষ্য হল সকল শিশু, কিশোর ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষদের মৌলিক শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করা।

ডিসেম্বর 1993-তে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নয়টি দেশের একটি শিখর সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন যার আহ্বায়ক ছিল UNESCO এবং এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল EPA বা "সকলের জন্য শিক্ষার" ওপর। অংশগ্রহণকারী দেশ নয়টি ছিল— বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজিরিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষ। এই দেশগুলি মোট জনসংখ্যার ৫০% এবং নিরক্ষর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি সংখ্যার ৭০% বহন করে।

EFA সম্পর্কে দিল্লীর ঘোষণাগুলি স্বীকার করে যে:

- অভিলাষ এবং উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে সব মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়;
- শিক্ষাই হল সর্বোৎকৃষ্ট উপায় যা সর্বজনগ্রাহ্য মানবিক মূল্যবোধ, মানবসম্পদের গুণগত মান এবং সংস্কৃতিগত বৈচিত্রের পরিবর্ধন পারে;
- শিক্ষা পরিচর্যা করে মানুষের মৌলশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলোর এবং সমাজকে ক্ষমতাশীল করে তোলে তার সবচেয়ে সঙ্কটজনক সমস্যাগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করতে;
- প্রচলিত প্রথাগত বা প্রথাবহির্ভূত উভয় ধারাতেই সৃজনশীল মানসিকতার উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা,
- শিক্ষা হল এক সামাজিক দায়িত্ব।

দিল্লী ঘোষণায় অঙ্গীকার করেছিল যে ২০০০ সালের মধ্যেই

- প্রতিটি শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্ট স্থান রক্ষার,
- কিশোর, তরুণ এবং পূর্ণবয়স্কদের ন্যূনতম শিক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার;
- প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য বা ভেদাভেদ দূরীকরণের;
- মৌলিক শিক্ষার গুণগত মান ও প্রাসঙ্গিকতার উন্নতিসাধনের;
- মানবিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্পর্কে একমত হওয়ার;
- আমাদের সমাজের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমাবেশ করার।

এছাড়াও দিল্লী ঘোষণা আন্তর্জাতিক স্তরে একযোগে বা সহযোগীরূপে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছিল অর্থিক

সংস্থাগুলিকে ও সকল সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রগুলিকে যাতে 'সকলের জন্য শিক্ষার' লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়।

সকলের জন্য শিক্ষার কর্মসূচী ভারত সরকার ঘোষিত নীতি অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করে,

- শৈশবের প্রথমাবস্থায় যত্নের পরিবর্ধন এবং উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ
- প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনগ্রাহ্যতা
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিশেষত ১৫-৩৫ বছর বয়সীদের
- প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত পথে শিক্ষা ও দক্ষতার পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুযোগের শর্ত আরোপন বা পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা গ্রহণ
- মহিলাদের আরও ক্ষমতাশীল ও সমমর্যাদা প্রাপ্তির জন্য সুযোগের সৃষ্টি করা
- শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির সাথে পরিবেশ, সংস্কৃতি, জীবন ও মানুষের কর্মের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনের উন্নতিসাধন।

একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক শিক্ষা আয়োগ (International Commission of Education) চিহ্নিত করেছে যে শিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল, "... fitting humanity to take control of its own development. It must allow all people without exception to take their destiny into their own hands so that they can contribute to the progress of the society in which they live, founding development upon responsible participation of individuals and communities." শিক্ষা অবশ্যই বৃহদায়তনে কার্যকরীভাবে হস্তান্তর করবে এক জ্ঞান চালিত (knowledge driven) সভ্যতা যা প্রতিনিয়ত বর্ধিত হবে কারণ এটাই ভবিষ্যতের দক্ষতার ভিত্তি স্থাপন করে। প্রতিটি ব্যক্তি প্রয়োজনীয় সজ্জায় অবশ্যই সুসজ্জিত হবে আজীবন কিছু শেখবার সুযোগ করায়ত্ত করতে— যেটা তার নিজের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের প্রসার এবং নিজেকে পরিবর্তিত জটিল ও পরস্পর নির্ভরশীল পৃথিবীর উপযোগী করে তোলা— উভয় দিকের জন্য।

কমিশনের সভাপতি Delors তাঁর উপস্থাপক পরিচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট করেছেন,— "The concept of learning throughout life thus emerges as one of the keys to the twenty-first century"— অর্থাৎ একবিংশ শতকে জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা এইরূপে এক অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে উত্থিত হয়। এটা প্রারম্ভিক এবং চলতি শিক্ষার প্রথাগত বন্ধনের উর্ধ্বে আরোহণ করে। এটা অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে ...। জীবনের প্রথাগত নক্শার সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের দাবী করে অন্যদের আরও ভালভাবে বোঝার এবং বিশ্বকে বিশদভাবে জানার। পরিবর্তনগুলি দাবী করে পারস্পরিক বোঝাপড়া, শান্তিপূর্ণ বিনিময় এবং অবশ্যই 'সমন্বয়'— এমন একটি মহার্ঘ্য বস্তু যা আজকের দিনে আমাদের জগতে বিরল। আয়োগটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছে সর্বদিকে নিখুঁত পূর্ণতাপ্রাপ্ত এক স্বপ্নরাজ্যের— সেটা হল "এক শিক্ষার্থী সমাজ" যার ভিত্তি হল অধিগ্রহণ, পুনর্নবীকরণ ও জ্ঞানের ব্যবহার। এই তিনটি ধারণা সম্পর্কে বলেছেন— "These three aspects ought to be emphasized in the education process.

EFA-র প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন (International Support for EFA)

বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, The Asian Development Bank (ADB) বর্তমান EFA কর্মসূচীকে সমর্থন করেছে। অনেক দাতার যথা ইউরোপীয় কমিশন, DFID, SIDA, NORAD, HIVOS

নেদারল্যান্ড ও জাপান— এদের কাছে থেকেও দ্বিপার্শ্বিক অনুদান আসছে। DPEP-এর ন্যায় বৃহৎ কর্মসূচী যুগ্মভাবে সমর্থিত ও অনুদানিত হচ্ছে উল্লিখিত অনেক সংস্থা দ্বারা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যুগ্ম প্রচেষ্টায় সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচটি UN সংস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যদিও UN সংস্থাগুলির ও দ্বিপার্শিক দাতাদের সাহায্য অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত হয় তবুও বিশ্বব্যাঙ্ক IDA-এর মাধ্যমে কমসুদে টাকা পেতে সাহায্য করে। এই সকল কর্মপরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই তদ্রূপ অনুদান দিয়ে থাকে। Action Aid, Aga Khan Foundation, CARE, Save the Children Fund এবং Plan International-এর মত NGO সংস্থাগুলি উন্নতি বিধান করছে এই field based কর্মসূচীর।

অক্ষম শিশুদের সর্বজনীন তালিকাভুক্ত করার নিমিত্ত পদক্ষেপ [Steps for Universal Enrolment of Disabled Children]

NPE ১৯৮৬-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে Programme of Action, POA-১৯৯২ অক্ষম শিশুদের সর্বজনীন তালিকাভুক্ত করবার লক্ষ্য অর্জনের কথা ভেবেছে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ দ্বারা;

- সাধারণ বিদ্যালয়,
- বিশেষ বিদ্যালয়,
- সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ বিভাগ সেই সকল শিশুদের জন্য যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

এটি অক্ষম শিশুদের ভিতর 'বিদ্যালয়-ছুট' শিশুদের আনুপাতিক হার হ্রাস করে তাদের সাধারণ বিদ্যালয়-ছুট' শিশুদের আনুপাতিকহারের সঙ্গে সমতায় আনার কথাও বিবেচনা করেছে নিম্নলিখিত উপায়ে—

- পাঠ্যক্রম ও সম্পাদিত কর্মের বিন্যাস এবং উপযোগিতা শিশুদের বিশেষ প্রয়োজন কথা মাথায় রেখে করা, এবং
- এই পরিসেবা গুরুর আগের ও চলাকালীন শিক্ষাদান কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাস করা।

B.Ed বিশেষ শিক্ষা ও দূর-শিক্ষা কর্মসূচী [B.Ed Special Education and Distance Education Programme]

B.Ed বিশেষ শিক্ষা ও দূর-শিক্ষা কর্মসূচী (B.Ed. SE-DE Programme) NSOU এবং RCI দ্বারা যৌথভাবে প্রদান করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য বিশেষ শিক্ষার জন্য। পেশাদার শিক্ষক তৈরী করা যাদের একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার ধরন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকবে। এটা সকলের কাছে পৌঁছাবে এবং পেশাদারীদের শিক্ষা দেবে ও শিক্ষিত করে তুলবে এবং উপযুক্ত করে তুলবে জ্ঞান, বোঝাপড়া, দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাদান করার ক্ষমতা আত্মভুত করতে ও অক্ষম শিশুদের কার্যকরীভাবে বা ফলপ্রসুভাবে শিক্ষিত করে তুলতে।

৩.৫ সকলের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education for all)

৩.৫.১ জাতীয় প্রেক্ষাপট (National Scenario)

ত্রিশ দশকের শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে নব্বই দশকের আচার্য রামমূর্তি পর্যন্ত সকল জাতীয় চিন্তাবিদগণ এবং শিক্ষা কমিশনগুলি কর্মশিক্ষাকে বিদ্যালয় শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অনাতম অংশ স্বরূপ পরিগণিত করার ওপর জোর দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষাকে [Bundiyadi Shisha, Late thirties] জাতীয় চেতনার উন্নতি ও সমাজের পুনর্গঠনের এক প্রারম্ভিক অস্ত্র হিসাবে দৃষ্টিগোচর করান। গান্ধীজির জীবন, কর্ম ও পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার কল্পনা শিক্ষার জগতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এটা শিক্ষার দর্শনে এক নতুন সংযোজন ছিল যা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ভারতবর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে এই পরীক্ষা সেইকালে সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন ১৯৬৪-৬৬) মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিগুলি ও দর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। কমিশন জাতীয় উন্নতিকে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত করে। এর বিবৃতি "শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন" একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, "The destiny of India is being shaped in her class-room." এটা শিক্ষাগত পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল Work Experience Programme (WEP)-কে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং Vocationalisation of Education Programme (VEP) কে মাধ্যমিক মানের বিদ্যালয়ে। এইগুলি National Policy of Education-১৯৬৮-র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্বরূপ বা অংশস্বরূপ হিসেবে বিবেচিত হয়। WEP এবং VEP শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নীরব পরিবর্তন আনবে— এরূপ বিবেচিত হয়েছিল।

NPE ১৯৬৮-এর ওপর ভিত্তি NCERT ১৯৭৫ সালে আমাদের দেশকে উপহার দিয়েছে,

(i) "The Curriculum for the Ten Year School: A Framework" তথাচিত্রের সাহায্যে কর্মের অভিজ্ঞতার ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী, এবং

(ii) "Higher Secondary Education and its Vocationalisation" নামক তথ্যচিত্রের সাহায্যে VE-এর ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী।

পুনরীক্ষণ কমিটি ১৯৭৭ (The Reveiw Committee) সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বা কার্যকর উৎপাদনশীল কাজ (SUPW— Socially Useful Productive Work)-এর ধারণা নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে এসেছিল। কাজের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হিসাবে SUPW-এর ধারণাকে অন্যতম উপাদান হিসেবে ভেবিছল। শিক্ষা কমিশনের WE ধারণা এবং রিভিউ কমিটির SUPW ধারণার ভেতর কিছু নিশ্চিত পার্থক্য রয়েছে। WE একটি পাঠক্রম যেখানে উৎপাদনের পদ্ধতিতে প্রগাঢ় অংশগ্রহণকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধের থেকে। তুলনামূলকভাবে বৈসাদৃশ্যে বিদ্যালয়ে পাঠক্রমে যেখানে SUPW-র রয়েছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা সেখানে অন্যান্য বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে যুক্ত করা হয়েছে SUPW কার্যকলাপের সঙ্গে যাতে সম্পূর্ণ শিক্ষকমণ্ডলীকে SUPW কার্যকলাপে বিজড়িত করা যায়। NPE 1986 WE এবং SUPW কর্মসূচীর এক কৃত্রিম অবলোকন করেছিল এবং সুপারিশে করেছিল এক কর্মের অভিজ্ঞতা যা SUPW-র প্রসারিত ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

NPE ১৯৮৬ এক নতুন প্রেরণা দিয়েছিল শিক্ষা কর্মসূচীর বৃত্তিগতকরণকে তার বিধিমত কেন্দ্রীয় অনুদান গ্রহণকৃত পরিকল্পনাভুক্তির দ্বারা।

NPE ১৯৮৬-র পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে গঠিত রিভিউ কমিটি বা পুনরীক্ষণ কমিটি (১৯৯০) আচার্য রামমূর্তির সভাপতিত্বে সকলের জন্য বৃত্তিয়করণের সুপারিশ করেছিল। পুনর্বিচারপূর্বক সংশোধিত NPE ১৯৯২ অন্তর্ভুক্ত করেছিল Generic Vocational Course (GVC) বা বর্ণীয় বৃত্তিমূলক পাঠক্রম দ্বাদশবর্ষীয় (+2) শিক্ষাস্তরে। বিবেচিত হয়েছিল যে GVC নব উদ্ভূত বিজ্ঞকারিগরী সম্প্রদায়ের জন্য কেবলমাত্র ভূমিকা প্রত্যক্ষকরণই করবে না, তারসঙ্গে থাকবে মৌলিক দক্ষতা, অপরিহার্য যোগ্যতা, হস্তান্তরযোগ্য দক্ষতা যা পরিবর্তনশীল বৃত্তীয় জগতের জন্য যথাযথ। অর্থাৎ GVC-র লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান ভিত্তিক দক্ষতার বিকাশসাধন যা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির থেকে শিক্ষার্থী তৈরী করাকে প্রাধান্য দেবে।

WE-কে সাধারণ শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করবার উদ্দেশ্যে হল যে এটা শিক্ষার পরিমার্জনা পূর্বক দেশের উন্নতিসাধন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতা বা উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে।

এর সম্যক উপলব্ধি হয় বিদ্যালয় পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থপূর্ণ হাতের কাজ যা কোন জিনিস তৈরী করতে অথবা সামাজিক সেবাধর্মী কাজ শেখানোর দ্বারা। কোন কর্ম তখনই অর্থবহ হয় যখন তা মৌলিক প্রয়োজনের (basic needs) সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এটা উদ্দেশ্যসাধক রূপে পরিগণিত হয়ে ওঠে যখন এর একটা প্রভাব থাকে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডের পদ্ধতির ওপর। যথোপযুক্ত WE কার্যক্রম তৈরী করা যেতে পারে বিদ্যালয়ে, বাড়িতে উপলব্ধ কর্ম পরিবেশ থেকে। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য, বাসস্থান পরিধেয়, কৃষ্টি ও বিনোদন, সাম্প্রদায়িক কাজও সমাজসেবামূলক কাজ থেকেও WE র কার্যক্রম গড়ে তুলবে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা, চাহিদা ও ক্ষমতার সঙ্গে সমঞ্জসাপূর্ণ প্রয়োজনীয় বোধপত্তা, আচরণ ও দক্ষতা এবং সাহায্য করবে তাদের কাজের জগতে প্রবেশ করতে।

WE কার্যক্রমের দ্বারা শিক্ষার্থী সমাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পরিবেশ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে গভীরতর অনুভূতি প্রাপ্ত হয়। সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সঠিক প্রযুক্তির প্রয়োগের সাহায্যে বর্তমানের চাহিদা অনুসারে প্রথাগত দক্ষতার ক্রমোন্নতি সাধন করে, সহানুভূতি সহযোগিতা, আত্মবিশ্বাস, দলগত একতা (team spirit), শ্রমের মর্যাদা, সহনশীলতা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা, প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিকাশ ঘটায় এবং হয়ে ওঠে সমাজের এক যোগ্য ব্যক্তি যার কাছে জীবনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়।

WE উত্তমরূপে সমাদৃত হয়েছে এক অন্যতম শক্তিশালী শিক্ষাসংক্রান্ত যন্ত্র বা উপায় হিসাবে যা কোন শিক্ষার্থীকে এক সৃজন উৎপাদনক্ষম এমন ব্যক্তি হিসেবে উন্নত করতে সাহায্য করবে যে সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে ও ব্যক্তিগত পূর্ণতা এবং বৃহদাকারে শান্তিপূর্ণ সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে পারবে।

আক্ষরিক ও অন্তর্নিহিত অর্থে (in letter and spirit) গৃহীত হলে কর্মশিক্ষা (Work Education— WE) কর্মসূচী—

- শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারবে,
- বিদ্যালয়কে জনগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে পরিগণিত করতে পারবে;
- শিক্ষাকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে এবং শিশুকে দেশের সুতীব্র উন্নয়নের পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে;
- সমাজের অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে পারবে।

সকল WE কার্যকলাপ ক্রমানুসারে তিনটি পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করবে: পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, গবেষণা এবং কর্মের অনুশীলন। যাহোক, প্রাথমিক স্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষার ওপর, উচ্চতর প্রাথমিক স্তরে গবেষণার ওপর এবং মাধ্যমিক স্তরে কর্ম অনুশীলনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৃত্তিমূলক WE কর্মসূচীর পূর্ববর্তী পর্যায়ের নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (IX-X) শিক্ষার সুযোগ নানাবিধ বৃত্ত শিক্ষার মধ্যে পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাছতে সাহায্য করবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (XI-XII)।

VE-এর লক্ষ্য ও তার যথাযথ চিত্রণ [VE Goal and Perspective]

বৃত্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য হল জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়তা মেটানো। শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত উপযুক্ত মানবশক্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে অর্থনীতি সকল স্তরে। এটা সক্ষম সম্পদ তৈরী করতে,

সুনিশ্চিত করতে পারে আর্থ-সামাজিক স্থায়িত্বকে এবং দেশকে দিতে পারে সমৃদ্ধি এনে। মানবশক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে এই চাহিদার অনুধাবন যথোপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করে।

VE শিক্ষার উদ্দেশ্য হল:

- উন্নয়নের লক্ষ্য পূর্ণ করা, বেকারত্ব ও চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ
- উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষাদান
- জাতীয় উন্নতর জন্য দক্ষ মানবশক্তি বিকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার্থীদের একটি বৃহৎ অংশকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের দিকে চালিত করা যাতে সাধারণ শিক্ষার জন্য অনভিপ্রেত অস্বাভাবিক ভিড় হ্রাস করা সম্ভব
- আত্মনির্ভরতা ও লাভজনক চাকরীর জন্য ছাত্রগণকে (students) প্রস্তুত করা

বিগত শতকে VEP-র অর্থপূর্ণ প্রয়োগ দুই দশকের মধ্যে দেশের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক ক্রিয়া চালিত করেছে ভারতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারিত প্রত্যক্ষকরণ উন্মেষের দিকে যাতে পূর্ণ করতে পারে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবশক্তির চাহিদা এবং চাকরীক্ষেত্রে সামাজিক চাহিদা। এই প্রত্যক্ষকরণ যে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের দিকেই আলোকপাত করে তা নয়, এটা তাদের জ্ঞানর্জন, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য যা কোন এক বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়াতেও আলোকপাত করে। এতদ্ব্যতীত তাদের এরূপ প্রণালীতে শিক্ষিত করে যা নেতৃত্ব দেয়—

- পরিবেশ অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নকে ভালভাবে বুঝতে
- চলতে থাকা এবং উদ্ভূত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশ নিহিতার্থে দ্রুত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ও বিশ্বায়নের উপলব্ধিকরণে
- বন্ধুত্ব উৎপাদন নিশ্চিত করবার জন্য এবং বিশ্বমানের পরিসেবার জন্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, মুক্তি, স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণের উত্থিত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সতর্কীকরণে
- শিক্ষা, কর্মজীবন এবং সমাজের মধ্যে সামগ্রিকভাবে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপনে
- বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে জীবনব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থার এক অংশ হিসেবে সপ্রশংস উপলব্ধিকরণে যা তার নিজের, তার পরিবার, তার সম্প্রদায় ও তার দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে অভিযোজিত।

গ্রামীণ ভারতে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত দক্ষ মানবশক্তি (Prospective Skilled Manpower for Sustainable Development in Rural India)

দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সক্রিয়করণের জন্য প্রয়োজন বৃহদায়তন নানা শ্রেণীর দক্ষ মানবশক্তির গঠন। দক্ষ মানবশক্তির প্রয়োজন হবে গ্রামীণ শক্তি প্রযুক্তি [জৈবগ্যাস, গ্রামীণ শক্তির স্থাপন, জ্বালানী শস্য উৎপাদন, সৌরশক্তি প্রযুক্তি], বৃক্ষরোপণ, কৃষিজ ও সামাজিক বনাঞ্চল এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধারণ, (হর্টি কালচার) উদ্যানপালন, ভেষজ উদ্ভিদ, জলআবাদ, ভূমি সংরক্ষণ, জৈব সার (organic manure), bio fertiliser, নিমযুক্ত কীটনাশক, গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রযুক্তি, গ্রামীণ পরিকাঠামো বিন্যাস, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পশুপালন, দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় সংক্রান্ত প্রযুক্তি (diary technology), কৃষিজ যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, পশুশক্তি চালিত যন্ত্র, সেচব্যবস্থা পরিবহন সেবা, গ্রামীণশিল্প, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি, গ্রামীণ সংবাদ প্রেরণ

ব্যবস্থা এবং অন্যান্য উত্থিত ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রযুক্তির জন্য।

বিদ্যালয় ব্যবস্থার সকলের জন্য বৃত্তিমূলকশিক্ষা WEP-কে প্রারম্ভিক স্তরে, WEP-র পূর্ববর্তী বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিন্যাসকে মাধ্যমিক স্তরে এবং VEP-কে বৃত্তিমূলক বিভাগে এবং GVC-কে সাধারণ বিভাগে +2 (উচ্চ মাধ্যমিক) স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিধিমুক্ত বৃত্তিমূলকশিক্ষা [Non-Formal Vocational Education]

NPE প্রথাবহির্ভূত বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে বলেছে যে, "Non-formal, flexible and need-based Vocational Programmes will also be made available to illiterates, youths who have completed primary education, school drop-outs, persons engaged in work and unemployed or partly employed persons. Special attention in this regard will be given to women." এই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্ষেত্রটির জনসংখ্যা প্রয়োজনবোধ করে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের এবং NGO-র পারস্পরিক সহযোগিতার কামনা করে এবং গুণের স্বীকৃতি আশা করে।

TVET প্রথার একত্রীকরণ [Unification of TVE System]

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও শ্রমমন্ত্রক হল দুই মুখ্য মন্ত্রণালয় যা বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং বিবিধ কারিগরী ও বৃত্তিমূলক কর্মসূচী প্রদান করে— প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের জন্য। স্বাস্থ্য পরিসেবাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকার্যের সহায়ক ও পরিপূরক পাঠক্রম পড়ানোর ব্যবস্থা প্রদান করে। এছাড়াও শিল্পমন্ত্রক, কৃষি ব্যবস্থা, বস্ত্র, ভ্রমণ, ভারতীয় রেল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভাগ তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে নানাবিধ পাঠক্রম শিক্ষা প্রদান করে যা চাকরী পেতে সাহায্য করে। এইক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ দ্বৈত প্রচেষ্টা বিদ্যমান আছে। সকল TVET কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও একীকরণের প্রয়োজন রয়েছে।

৩.৫.২ UNESCO-র TVET কর্মসূচী: একবিংশ শতকের এক দৃষ্টিরূপ (A Vision for the Twenty First Century)

এপ্রিল ১৯৯৯-এ সিওলে (Seoul) অনুষ্ঠিত কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস, যার মূল বিষয়বস্তু ছিল "জীবনব্যাপী শিক্ষা ও শিক্ষণ: একটি ভবিষ্যতের সেতু"— অংশ নিয়েছিল এবং বিশ্ব দৃষ্টিপথের এবং কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকের জন্যে।

UNESCO-র TVET (Technical & Vocational Eduction & Training)-এর যে কর্মসূচীগুলি নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকের জন্য কংগ্রেসের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল তার সুকৌশলী উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

1. TVET-কে শক্তিশালী করে তোলা জীবনব্যাপী শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে

- সাধারণ শিক্ষায় বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ
- TVET ও শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রন্থিলতা
- প্রথাগত শিক্ষা ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধন
- বিশেষত বেসরকারি ক্ষেত্রে মালিকানাস্বত্ব যাদের কাছে গচ্ছিত তাদের অন্তর্ভুক্তির লালন পালন

2. TVET-কে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা

- TVET-কে প্রতিটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের একটা অংশরূপে পরিগণিত করা
- সকল TVET পাঠক্রমে পারিপার্শ্বিক সমস্যাগুলি তুলে ধরা
- সকল TVET পাঠক্রম পারিপার্শ্বিক সমস্যাগুলি তুলে ধরা
- নতুন ITC প্রযুক্তি TVET শিক্ষণ ও শিক্ষায় (প্রথাগত পদ্ধতিকে না হারিয়ে) প্রয়োগ
- সামাজিক আসঞ্জন ও একীকরণের এক অস্ত্ররূপে পরিগণিত হওয়া
- বালিকা ও মহিলাদের নিশ্চিতরূপে সম ক্ষমতা প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া ও তার কার্যকারিতার উন্নতি বর্ধন করা

3. সকলের জন্য TVET জোগান

- প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত TVET সুযোগ দেওয়া দরকার
  - — বেকার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে
  - — প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়-ছুটদের জন্যে
  - —প্রতিসৃত ব্যক্তিগণ এবং
  - —বাস্তুহারা সৈন্যদলের ক্ষেত্রে
- সমাজের সকল স্তরে পৌঁছানোর জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে উপযুক্ত নেতৃত্ব ও পরামর্শ দেওয়া
- জীবনব্যাপী শিক্ষা ও শিক্ষণের নমনীয় প্রবেশাধিকার

কংগ্রেসের সুপারিশ [Recomendation of the Congress]

UNESCO-র ডাইরেক্টর জেনারেলকে দেওয়া কংগ্রেসের সুপারিশগুলো UNESCO-র ইচ্ছানুসারে বিশ্বায়নের যে নব কৌশলগত পন্থার সূচনা করতে চলেছে তার কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে— যা সূচিত হয়েছে একবিংশ শতকের TVE-এর জন্য। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হল কিছু প্রাসঙ্গিক সুপারিশ:

মূল বিষয়বস্তু: একবিংশ শতকের পরিবর্তনীয় চাহিদা: কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি চ্যালেঞ্জ (The Challenge Demands of the Twenty-First Century: Challengs to Technical and Vocaltional Education)

- একবিংশ শতাব্দী এক সম্পূর্ণ পৃথক অর্থনীতি ও সমাজ সূচনা করবে যাতে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষার প্রগাঢ় নিহিতার্থ থাকবে। TVE ব্যবস্থা নিশ্চয়ভাবে এই সকল মূল বিষয়গুলি অভিযোজিত করতে পারবে যার মধ্যে নিহিত বিশ্বায়ন, এক সদা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত দৃশ্যাবিবরণী, যার ফল দ্রুত ও স্থিরগতিতে সামাজিক পরিবর্তন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই সকল পরিবর্তন যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে আসছে তা শিক্ষাক্ষেত্রে ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর নতুন কার্যকরী ব্যবস্থার প্রচলন করছে। এই পরিবর্তনগুলির প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রম ও পুঁজির ক্রমবর্ধমান গতিশীলতা, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যগত সংঘর্ষ, বাজারী অর্থনীতির উদ্ভব এবং

গ্রামীণ ও শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি।

- এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবণতা এমন এক নতুন উন্নয়ন দৃষ্টান্তকে নির্দেশ করে যা এই মুখ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে একটি শান্তির সংস্কৃতি এবং পরিবেশগত ভাবে উন্নত গ্রহণীয় উন্নয়নকে ধারণ করে। এর সঙ্গে TVEএর মূল্যবোধ, মনোভাব, নীতি ও অভ্যাসের ভিত্তি অবশ্যই এই প্রতিরূপের মধ্যেই হওয়া উচিত যার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং প্রসারতাতে পরিবেষ্টন করবে মানবিক বিকাশের চাহিদার একটি পরিবর্তন এবং কর্মের জগতে কার্যকরী অংশগ্রহণের ক্ষমতায়ন। প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার এই নতুন দৃষ্টান্তে সবার জন্য দক্ষতা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং গরীব, শিক্ষার নাগালহীন ও বাধাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যাতে শিক্ষা সকলের কাছে মৌলিক মানবাধিকার রূপে বিরাজিত থাকে। বিশ্বায়ন এবং শিক্ষাগত দক্ষতার আওতায় পড়ে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ শিক্ষার সকল ক্ষেত্র। দেখা দেবে একবিংশ শতাব্দীর সেই শিক্ষার্থী যে একটি জীবনব্যাপী জ্ঞান, মূল্যবোধ, ও মনোভাব এবং দক্ষতা ও কর্মকুশলতা দ্বারা একটি শিক্ষণীয় সমাজব্যবস্থা গড়ার অন্তিম লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে:...
- অতএব TVE ব্যবস্থার অবশ্যই সংস্কার হওয়া উচিত আর এটি হওয়া উচিত নমনীয়তা, অবিষ্কার ও উৎপাদন ক্ষমতা, প্রয়োজনীয় দক্ষতায় পৌঁছান, শ্রমবাজারে প্রয়োগকে সঠিকভাবে চিনতে পারা, অন্তেবাসী (marginalized), কর্মহীন ও কর্মীদের শিক্ষণ ও পুনর্শিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাতে এই নতুন দৃষ্টান্তকে জীবনদান করা যায়। আর এর উদ্দেশ্য হবে অর্থনীতির ব্যবহারিক এবং অব্যবহারিক উভয়ক্ষেত্রেই সবার জন্য সুযোগ সুবিধা সমতপ্রাপ্তি।
- মানবিক মূল্যবোধ ও তার মাপকাঠির প্রয়োজনকে চিনতে পারা; শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্র এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা এবং বংশানুক্রমিক দক্ষতার বিকাশকে লালন পালন করা, কাজের মূল্যবোধ, প্রযুক্তিগত ও ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই একটি নব অংশদারিত্ব থাকা উচিত শিক্ষা এবং কর্মজগতের মধ্যে।
- অভিপ্রেত পরিবর্তনগুলো এমনভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন রয়েছে যা প্রতিটি দেশের পক্ষে উপযুক্ত যাতে TVE কে একটি সাধারণ চাবিকাঠি হিসাবে রেখে এই নতুন দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্ষমতায়ন ও নিযুক্তিকরণ হবে সংস্কারসাধন পদ্ধতির আলোকিত উৎসবিন্দু।
- নতুন দৃষ্টান্তের প্রতি প্রাক্ প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলির TVEর জবাব অন্তর্ভুক্ত করেছে সামাজিক মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন প্রযুক্তির গ্রহণ, নবনীতি ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকার প্রস্তুতিকরণ এবং স্থানীয়, প্রাদেশিক ও বিশ্বগত সুযোগসুবিধা এবং চিন্তাভাবনার প্রতি প্রাধান্য। একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রবণতা এমন একটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা এবং দৃঢ় নীতির দায়িত্বশীলতা দাবী করে যা একই সঙ্গে হবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক।

মূল বিষয়বস্তু : জীবনভর শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতির সাধন (Improving system Providing Education and traning throught life)

জীবনব্যাপী শিক্ষা একটি যাত্রাপথ যার বিভিন্ন রাস্তা রয়েছে এবং সেই যাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তীয় শিক্ষা। অতএব TVE ব্যবস্থা সংস্কৃতি ও পরিবেশগত দিকগুলো এবং অর্থনৈতিক দিকগুলির সাথে জীবনের অভিজ্ঞতাতে উন্নত করার কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত করা উচিত।

- জীবনব্যাপী শিক্ষার সর্বোচ্চ কার্যকারিতা পেতে গেলে— কর্মশিক্ষা ব্যবস্থা আরো উন্মুক্ত, নমনীয় এবং

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদান করা ছাড়াও অবশ্যই প্রতিটি ব্যক্তিকেই আরো সাধারণভাবে জীবন এবং কর্মের জগতের জন্য প্রস্তুত করা উচিত।—WE ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপকারের জন্য প্রয়োজনীয়।

- TVE এর প্রয়োজন শিক্ষা সংস্কৃতির (Learning Culture) ওপর ভিত্তিস্থাপন যার অংশীদার ব্যক্তি, শিল্প, বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিভাগ এবং সরকার যেখানে ব্যক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জ্ঞান পরিচালনা ব্যবস্থার এবং স্বশিক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা রয়েছে। ব্যক্তিগত এবং সরকারি ক্ষেত্রগুলি এমন কিছু কর্মসূচি প্রদান করে যা জীবনব্যাপী শিক্ষার পথগুলিতে পৌঁছানো মসৃণ করে।

- তথ্য ও জ্ঞান, বিভিন্ন কর্মকুশলতা ও দক্ষতা, ব্যবসায়িক ক্ষমতা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত অনিশ্চয়তার মধ্য থেকে উদ্বেগ কমানোর ক্ষেত্রে TVE এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- সকল রাষ্ট্রের প্রয়োজন এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষানীতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া সমৃদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা যার মধ্যে একটি মূল অংশ অবশ্যই TVE। শিক্ষার্থীদের মসৃণ পথ প্রদান করতে TVE অবশ্যই অন্যান্য সকল শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্কের উন্নতি সাধন করবে বিশেষত বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে। সুস্পষ্টতা, আস্থা অর্জন এবং পরিচিতির ওপর জোর দেওয়া উচিত প্রাকশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য। TVE এর আওতায় আরও একটি দায়িত্ব রয়েছে— তা হল একটি দৃঢ়, প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থার নিশ্চিত রূপের যা শেখার জন্য শিক্ষার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয় সেটা হল যুব সম্প্রদায় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সমাজের সকল নাগরিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অমূল্য দক্ষতা।

মূল বিষয়বস্তু : শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন (Innovating the Education and Traning Process)

- একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীকে যেসকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় তা নতুন আঙ্গিকে TVE কে দেখা দাবী করে। এটা নবরূপে পুনর্বিন্যস্ত পাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নতুন বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য। স্বাভাবিক ভাবেই উদাহরণ স্বরূপ প্রযুক্তি, পরিবেশ, বিদেশী ভাষাও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা, ব্যবসায়িক ক্ষমতা এবং দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান সেবাধর্মী শিল্পগুলি যেমন অবসর, পর্যটন ও আতিথেয়তা-কে অন্তর্ভুক্ত করে।

- পরিবর্তনের দ্রুতগতি সূচনা করে কার্যকর পাঠক্রমের সম্ভাবনা যেখানে শিক্ষার্থীরা অবশ্য উপযুক্ত ভাবে তৈরী হবে তাদের অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে এমন জ্ঞান ও দক্ষতার মোকাবিলা করতে এবং নতুন মৌলিক ভাবনা যা এখনও উদ্ভাবিত হয়নি তার সূচনা করতে। তারা অবশ্যই তৈরী হবে দ্রুত নব শ্রম বাজারের জন্য যেখানে প্রথাগত মজুরীর বিনিময়ে চাকরী স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা হতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকারে স্বনিযুক্তি ব্যবসার নবযুগে সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ দিতে পারে।

- নব তথ্যপ্রযুক্তি এক সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষণে সহজ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ অবশ্যই সম্ভব হওয়া উচিত এবং নতুন তথ্য ও সম্প্রচার প্রযুক্তি শিল্পোদ্যোগে শিক্ষণ ও শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির মূল্যকে বিনষ্ট না করে বিশেষত ব্যক্তিগত শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের নিজস্ব ধরন বা বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট না করে প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্ভব হবে। জীবনব্যাপী শিক্ষার সংস্কৃতিগত বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বহুবিধ নতুন পথের দিশারী হয়ে শিক্ষার্থীকে করে তুলবে এমনভাবে উপযুক্ত করে যাতে তারা তাদের শিক্ষা ও শিক্ষণ সংক্রান্ত চাহিদাসমূহ মেটাতে পারবে।

- নতুন প্রযুক্তি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে TVE এর সঙ্গে সুদূর প্রসারিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। তাদের দূরত্বকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলতে ব্যবহার করা হবে এবং পাঠক্রম ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করা হবে এবং কারিগরী বা বৃত্তির উপযুক্ত নেতৃত্বদান সংক্রান্ত তথ্য অনেক সহজে সকলের উপলব্ধ হবে। তাদের সময়ের মধ্যে ও TVE সরবরাহের স্থানে নমনীয়তা প্রদর্শনের ক্ষমতা রয়েছে এবং বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলে বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় নতুন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার জন্য TVE সাহায্য করবে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে।

- যেহেতু কর্মসংস্থান অত্যাধুনিক দক্ষতার আহ্বান করে, তাই TVE-র ভিত্তিক শর্তস্বরূপ প্রদান করতে হবে এক সুদৃঢ় প্রারম্ভিক শিক্ষা। এটা অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যালয়ে এক জটিলতর মেধা খুঁজে বার করতে যার মধ্যে থাকবে ক্রমবর্ধমান সাহিত্য ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অনুধাবন ও আদানপ্রদানের ক্ষমতা।

- যেহেতু প্রযুক্তি যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ, তাই অতি অবশ্যই পথ খুঁজে বের করতে হবে শিল্প, আর্থিক ও সাহায্যকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিতে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায়, এর উচ্চ ব্যয় সাপেক্ষতা বোঝাতে বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে। এছাড়া নতুন পথ অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে বুদ্ধিমত্তা আদানপ্রদানের জন্য, সকল দেশে শিক্ষার্থীদের মঙ্গলের জন্য এবং সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতির জন্য।

- প্রদত্ত আছে যে TVE তে উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তাতে শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বোচ্চ বা প্রধানতম এবং নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে শিক্ষকদের প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণের জন্য যা তাদের ক্ষমতার প্রতিনিয়ত উন্নতিবিধান এবং তদুপরি পেশাগত উন্নতিসাধন করবে। পুনর্বিবেচনা অবশ্য কর্তব্য একবিংশ শতাব্দীর TVE শিক্ষকের গুণগত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে; এটা অন্তর্ভুক্ত করবে সর্বাপেক্ষা অনুকূল ভারসাম্য শিক্ষালয়ের ভিতরে ও কার্যক্ষেত্রে। তাঁরা অবশ্যই সহায়তা পাবে তাদের মান নির্ধারণ, কৃতিত্ব বা গুণের অধিকারীরূপে স্বীকৃতি, গ্রন্থিলতা এবং শংসাপত্র প্রাপ্তির মান নির্ধারণের নতুন ও যথোপযুক্ত উপাদানের উন্নতি করে।

- কারিগর ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এক প্রারম্ভিক বিশ্বায়ন সতর্কতা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই সাথে প্রয়োজন অনুভব করে ভবিষ্যতের জন্য আরও আগাম পড়াশোনার যা তাকে প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে কর্মক্ষেত্র ও সমাজের পরিবর্তনের সাপেক্ষে। শিল্প অবশ্যই সরকার এবং গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে বিজড়িত হবে যাতে জ্ঞানের দক্ষতা এবং যোগ্যতা যা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় হবে সেটা TVE ব্যবস্থা তৈরী করতে পারে। সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি যা প্রযোজ্য হবে বিভিন্ন প্রদেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে তা সম্বোধিত হবে নতুন শতাব্দীর সম্পদের গতিময়তা বৃদ্ধির জবাব দিতে।

- প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এক অন্যতম বলিষ্ঠ যন্ত্র যা গোষ্ঠীভুক্ত সকল মানুষকে নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সাহায্য করে এবং সমাজের উৎপাদনশীল সভ্য হিসেবে তাদের ভূমিকা খুঁজতে সহায়তা করে। সামাজিক আসঞ্জন, অঙ্গীভূত করা এবং আত্মশ্রদ্ধা অর্জন করার এটা একটা কার্যকরী অস্ত্র।

- TVE কর্মসূচিগুলি সাজানো উচিত এমনভাবে যাতে তা হবে সহজবোধ্য এবং সকল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তাকে মানিয়ে নেবে। বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে পূর্বে কৃত অন্তেবাসীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। যেখানে বিশেষ কর্মসূচীর প্রয়োজন সেখানে তা তৈরী করা হবে মূলস্রোতে প্রবেশ সহজ করবার জন্য। এইরূপে নিশ্চিতিকরণ ঘটে অবিরাম জীবনব্যাপী শিক্ষাভিমুখী হওয়ার।

- অনুমোদিত অন্তেবাসীদের (recognized marginalized groups) তালিকা বর্ধিত হচ্ছে এবং

নিশ্চিতভাবে অন্যান্যরাও আছেন যারা এখনও অজ্ঞাত। TVE কর্মসূচী, প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয়ভাবেই— অবশ্যই উপলব্ধ করা হবে বিভিন্ন ধরণের গ্রহণযোগ্য বণ্টন, বেকার, প্রারম্ভিক বিদ্যালয়-ছুট, বিদ্যালয় বহির্ভূত যুবসমাজ, যারা অধিক দূরত্ব ও অবস্থানের শিকার, গ্রামীণ জনসংখ্যা, স্বদেশজাত ব্যক্তিসকল, যারা শহরাঞ্চলে হতাশার শিকার; রীতিবিরুদ্ধ শ্রম বাজার যা অত্যন্ত নিম্নমানের কাজের ও থাকার পরিবেশ, শিশু যারা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কর্মরত, উদ্বাস্তু, পরিযায়ী এবং যুদ্ধবিরতির পর ভেঙ্গে দেওয়া সৈন্যদলের সদস্য—সকলের কাছে।

- TVE তে নারীদের কমসংখ্যায় অংশগ্রহণ বিশেষ চিন্তার কারণ। পুরুষ ও নারীদের কর্মক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ভূমিকা প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গীতে অবশ্যই চ্যালেঞ্জের দাবী রাখে। TVE কে অবশ্যই লিঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করতে সাড়া দিতে হবে।

- WE পাঠক্রমে বালিকা ও মহিলাদের সমান সুযোগের উন্নতির জন্য অধিক কার্যকরী শিক্ষা সংক্রান্ত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান ও উপদেশের সঙ্গে অবশ্যই দিতে হবে লিঙ্গ সচেতন তত্ত্বাবধান ও অনুভবনশীল বিষয়বস্তু। সেই সঙ্গে শিক্ষার ও কাজের পরিবেশ অবশ্য বালিকা ও নারীদের যোগদানের উপযুক্ত হতে হবে। পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও পক্ষপাতমূলক পৃথকীকরণ অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে এবং এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও উপযুক্ত পুরস্কার দানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে নারীদের TVE তে অংশগ্রহণের জন্য।

- কর্মক্ষেত্রে বালিকা ও মহিলাদের যোগদানের সুযোগের অপ্রতুলতাকে জয় করতে হবে এবং একটি ভ্রান্ত ধারণা— যে মহিলারা কোন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কাজ করতে অপারগ— তা দূর করবার জন্য TVE কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যা তাদের কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বা সাংগঠনিক ক্ষমতার বিকাশ সাধন করবে।

- জীবনব্যাপী শিক্ষার যাত্রাপথ অক্ষমদের কাছে বোঝাস্বরূপ; পথ অত্যন্ত প্রস্তরময় এবং তা অতিক্রম করা কঠিন। এক্ষেত্রে অবশ্যকর্তব্য হল তাদের আশা ও অভীষ্ট অর্জনের পথ প্রসারিত করা। অনেকরকম কারণবশত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসকল প্রায়শই সমস্যার সম্মুখীন হন TVE কর্মসূচী গ্রহণ করতে— এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষিত সমাজ দ্বারা তাদের অবমূল্যায়ন, বৃত্তিমূলক নেতৃত্ব উপযোগী সক্ষম ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অক্ষমদের বেতনভুক্ত চাকরী অধিগ্রহণ করা। যারা TVE কর্মসূচীর মূলধারায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে তাদের তা করতে সাহায্য করা উচিত। আর যাদের প্রতিবন্ধকতা আরো বেশী তাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী ও সুকৌশলী শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যা তাদের সম্ভাবনা অনুধাবন করতে এবং সমাজে ও কর্মজগতে বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

- সকলের জন্য TVE প্রতিশ্রুতির আবশ্যক হয় সুচারুরূপে পরিকল্পিত কর্মপন্থা ও কৌশলের, বর্ধিত সম্পদের, নমনীয় ও যথোপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থার, প্রশিক্ষণের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের, সংবেদনশীল ও যত্নবান শিক্ষকমণ্ডলী ও নিয়োগকর্তার।

মূল বিষয়বস্তু : TVE তে সরকার ও অন্যান্য অধিকারীদের পরিবর্তনীয় ভূমিকা (Changing Roles of Govt. and other stake

- যদিও সরকার একটি প্রাথমিক দায়িত্ব বহন করে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য আধুনিক বাজারী অর্থনীতিতে;—TVE পরিকল্পনা ও নক্শা এবং বণ্টন অবশ্যই অর্জিত হবে শিল্প, সমাজ ও সরকারের সঙ্গে নতুন অংশীদারিতে। এই অংশীদারি অবশ্যই তৈরী করবে আসঞ্জনশীল সাংবিধানিক পরিকাঠামো যা পরিবর্তনের জাতীয় কৌশল অবলম্বন করতে সাহায্য করবে। এই কৌশলের মধ্যে থেকে সরকার WE

প্রদান করা ছাড়াও নেতৃত্বদানের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পারে। এছাড়াও সরকার সহজতর করতে পারে, সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং গুণগতমান সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে পারে ও নিশ্চিত করতে পারে যে WE সকলের জন্য চিহ্নিতকরণ এবং সম্প্রদায় সেবামূলক কার্যের দায়িত্বকে সন্তাষিত করে।

- নতুন অংশীদারিত্বর লক্ষ্য হওয়া উচিত সমগ্র সমাজে একশিক্ষার সংস্কৃতি স্থাপন করা— অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার সময় সামাজিক অসঞ্জন ও মানবিকতার বর্ধন। শিক্ষার সংস্কৃতি (Learning culture) সাহায্য করবে এক শিক্ষালয়ের পরিকাঠামো স্থাপন করাতে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে। প্রতিষ্ঠানটি জীবনব্যাপী শিক্ষা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রসারিত অংশগ্রহণে সাহায্য করবে এবং কর্মের মহিমা লালনপালন করবে সংগঠন পরিচালনার পুনরুজ্জীবিত স্পৃহা নিয়ে।
- WE-র অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি স্বীকৃত হওয়া উচিত সরকার, শিল্প ও অন্যান্য মালিকানার।
- স্বেচ্ছাসেবী ও NGO ক্ষেত্রের অবদান WEর প্রতি অবশ্যই স্বীকৃত ও সমর্থিত হতে হবে কারণ এটা এক অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু প্রায়শই উপেক্ষিত সম্পদ যার অবদান অস্বীকার করা যায় না।
- সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বীকৃতি দেবে যে WE এক বিনিয়োগ (investment), ব্যয় নয়, যার অবদান লক্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ এবং যা অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিকদের হিত সাধনা, বর্ধিতহারে উৎপাদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। সুতরাং WE এর আবিষ্কারগুলি যথাসম্ভব ভাগ করে নিতে হবে সরকার, জনগোষ্ঠী, শিল্প ও শিক্ষার্থীর মধ্যে। এক্ষেত্রে অর্থ জোগাড় করা এবং আয়ের উৎস তৈরী করার মত কার্যবলীর সুযোগ রয়েছে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা। প্রতিটি দেশের জন্য এই মিশ্রণের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে WEর উপযোগিতা সমাজের সকল অংশীদারের যাদের সৃ-জনশীলতাতে অংশীদার হবার এবং নিরন্তর জীবনশক্তি বজায় রাখার দায়িত্ব থাকা উচিত ব্যয়ভার ভাগ করে নেবার মাধ্যমে।

মূল বিষয়বস্তু : TVE তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বৃদ্ধি ঘটানো

UNESCO এবং তার আন্তর্জাতিক অংশীদার যথা ILO বিশ্বব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক OECD, Commonwealth, La Francophonie এবং European Training Foundation দের মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহ দেওয়া থাকে। UNESCO-র সাথে TVE দ্রুতলয়ে করবার জন্য তাকে নেতৃত্বদানে আশ্বস্ত করা হয় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধার দ্বারা।

৩.৬ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান (Open Entry and Exit option Between Education and Vocation)

দক্ষ মানবশক্তির দ্বারা তৈরী ভিত যা নতুন সহস্রাব্দে দেশের অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষ ও অর্ধদক্ষ মানবশক্তির চাহিদা অনেকাংশে মেটাচ্ছে। একই সময়ে এক বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিক দক্ষতা অর্জন করছে কর্মস্থানে কাজ করে অথবা অপ্রথাগত পদ্ধতিতে। সময় এসেছে অনুভব করার যে প্রকৃত ভারত (Real India) বেঁচে আছে গ্রামে। প্রথাগত ভারতীয় জীবনে এক সহজাত ব্যবস্থা আছে যা মানব সম্পদকে উন্নত

করতে সাহায্য করে। দ্রষ্টব্য বিষয় নং 1, 2, 3 উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় ধারণা। বর্তমান শিক্ষা এবং শিক্ষণ ব্যবস্থা অর্থনীতিতে অসংহত ক্ষেত্রগুলির চাহিদাকে উপেক্ষা করে আসছে যা দেশের কর্মশক্তির ৯০% এর বেশী লোকেদের চাকরী প্রদান করে। জনসংখ্যার এক লক্ষণীয় অংশ জীবন সমর্থিত কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে শেখে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষার পরিস্থিতিতে যা বৃহদাকারে ভারতে হয়ে থাকে। প্রথাগত ব্যবস্থা যোগ্য পরিচিতি দেয় না তাদের আহরিত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে। এতদ্ব্যতীত আর অন্য কোন ব্যবস্থা এই দেশে নেই যা তাদের পরিচিতি দেবে। এই অপ্রথাগত/প্রথাবহির্ভূত ব্যবস্থা যথেষ্ট সংখ্যক স্থিতিমাপ উৎপন্ন করতে পারে প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রথাগত পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করতে। এই দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহুল পরিমাণে বর্ধিত করা যায় যদি বৃত্তিকে শিক্ষার মধ্যে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান অর্থাৎ গতিবিধিকে উন্নত করা যায় এই বিশেষ শ্রমশ্রেণীর ক্ষেত্রের জন্য। নিজেদের কারিগরী যোগ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য যা তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং দেবে পরিচিতি ও কর্মজীবনে অগ্রগতি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার চলমানতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধিত হচ্ছে কর্মজীবীদের মধ্যে। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা যা বয়সভিত্তিক এবং যেখানে প্রতিটি মানদণ্ডের জন্য ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত আছে, তা সীমিত পরিকাঠামোর কাজ করে এবং খুব অল্প সুযোগ দেয় তাদের প্রত্যাশা ও অতিপ্রয়োজনীয়তাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে জরুরী চাহিদা রয়েছে।

(a) দক্ষতা

(b) শিক্ষার চলমানতার বা প্রবহমান শিক্ষার

(c) বৃত্তি ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে গতিময়তা আনয়ন— যে কোন স্তরে যা ব্যক্তিগত বৃদ্ধি বা পদোন্নতি এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থ গতিময়তা ও কর্মজীবনে উন্নতির সোপান হিসাবে পরিগণিত হবে।

৩.৭ মূল্যায়ন, শংসাপত্রপ্রাপ্তি এবং কৃতিত্বের (Evalution Certtfication and Accreditation)

৩.৭.১ মূলনীতি (Rational)

গুণমান হল দেশে তৈরী কোন বস্তু বা সেবামূলক কাজের মান নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় যা বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে সাহায্য করে। এটা একটি জাতীয় অনুজ্ঞা শুধুমাত্র শ্রমশক্তির সম্ভাবনাপূর্ণ উৎপাদনশীলতার দ্বারা— যাদের মধ্যে রয়েছে সামাজিক মর্যাদাপ্রাপ্ত নানা শ্রেণী ও বঞ্চিত, প্রতিবন্ধী বা অক্ষম, দরিদ্র সহ সাধারণ জনসমাজ—যাদের উপযুক্ত করে তোলা হবে বিশ্বমানের উৎপাদন সামগ্রী প্রস্তুত ও পরিসেবার জন্য— কোন দেশ পারে সম্পদ সৃষ্টি করতে, দারিদ্র্যসীমার বিলোপ করতে এবং উন্নত ও সমৃদ্ধশীল হতে। মূল্যায়নের জাতীয় লক্ষ্য, শংসাপত্র প্রদান ও প্রতিটি স্তরে ভারতের প্রত্যেক দক্ষ ব্যক্তিকে অধিকারীরূপে স্বীকৃতিদান হল তাদের উপযুক্ত করে তোলা যাতে বিশ্বগুণমানের সঙ্গে সমতা রেখে সমমানের গুণসম্পন্ন বস্তুসামগ্রী উৎপন্ন ও পরিসেবা করতে পারে স্থানীয়, প্রাদেশিক, জাতীয় ও বিশ্বপ্রতিযোগিতায় দুর্ধর্ষ ফলের জন্য।

৩.৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

মূল্যায়ন, শংসাপত্র প্রাপ্তি এবং কৃতিত্বের অধিকারীরূপে স্বীকৃতির জাতীয় উৎসগুলি যা নিশ্চিত করে তা

নিম্নলিখিত।

- প্রতিটি দক্ষ উপাদানের জাতীয় মান নির্ধারণ করা যা শংসাপত্রধারীর অধিগত যেকোন স্তরে।
- শ্রমশক্তির প্রতিটি স্তরে জাতীয়মান নির্ধারণ
- শ্রমিকের উচ্চাশাকে উপযুক্ত ও জাগরিত করতে সাহায্য করা যেকোন স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হবার জন্য।
- শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত সকলপ্রকার বস্তু ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে নিখুঁততা বোধের বিকাশ ঘটানো।

৩.৭.৩ সম্পূর্ণ গুণমান নিয়ন্ত্রণ (TQC) [Total Quality Control]

TQC-র দুটি উপাদান আছে :

- জাতীয় পরীক্ষা পরিসেবার (testing service) উন্নতিসাধন
- কর্মসূচী পরীক্ষা ও পরিসেবা পরীক্ষার জন্য মূল্যায়নের যন্ত্রাদির উন্নতিসাধন

TQC-র পরিচালন ব্যবস্থা :

TQC অর্জন করা যায় কেবলমাত্র তখনই যখন জাতীয় পরীক্ষা পরিসেবার এক কার্যকরী পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় গুণমান উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য, গুণমান বজায় রাখার জন্য এবং বিভিন্ন দলের গুণমান বর্ধিত করার প্রচেষ্টার জন্য— উঁচু থেকে নিচু সকলস্কলে যোগ্যতা ব্যবস্থার পরিকাঠামোতে।

এর অর্থ গুণমান উন্নতির জন্য ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করা, গুণমান বজায় রাখা এবং গুণমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা নিহিত আছে।

- জাতীয় মানদণ্ড তৈরীর নির্দেশিকা, পাঠ্য ও নির্দেশিকা প্যাকেজ R & D সংস্থা দ্বারা জাতীয়, রাজ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে :
- অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার মনোনয়নে
- প্রতিষ্ঠানসমূহ* সুবিন্যস্ত পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধে স্থাপনে (* যথা অর্থ, মানুষ, এবং বস্তুগত)
- উদ্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক দলকে প্রশিক্ষণের জন্য বাছাইকরণে
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পরিবহনে
- কর্মে নিযুক্তিকরণে
- জীবনব্যাপী শিক্ষণের ব্যবস্থাপনায়
- বৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে অবাধ গতিবিধির ক্ষেত্রে
- শ্রমিক শক্তির দ্বারা উৎপাদিত বস্তু ও পরিসেবার জন্য বিপণন শৃঙ্খল প্রতিস্থাপনে

মাননির্ধারক যন্ত্রের TQC

অধিযন্ত্রবাদ এবং Norms

অধিযন্ত্রবাদ এবং norms অবশ্যই উন্নত হবে সুযোগ্য R & D সংস্থাদ্বারা, মূল্যায়নযন্ত্রের সম্পূর্ণ গুণমান নিয়ন্ত্রকের জন্য এবং কর্মসূচী মূল্যায়ন এবং কার্যসম্পাদনকৃত মূল্যায়ন— উভয়ের জন্য। উভয়প্রকার মূল্যায়ন পরিচালিত করতে হবে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও অতি সতর্কতার সাথে, সততার সঙ্গে, কোন রকম ফাঁকফোকর না রেখে আন্তরিকতার সাথে। মূল্যায়নের অত্যাবশ্যক উপাদানগুলি হল :

- গোপনীয়তা
- স্বচ্ছতা
- কারণদর্শিতা
- বিশ্বাসযোগ্যতা
- গ্রহণযোগ্যতা
- শ্রদ্ধাশীলতা
- সম্মান বা মর্যাদা

৩.৭.৪ কর্মসূচী মূল্যায়ন (Programme Evaluation)

NVQ পদ্ধতির কর্মসূচী মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট গুণমান পরিমাপ করা পরিচালন পদ্ধতর একেবারে উচ্চপর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত এবং তাদের গুণমান রক্ষণাবেক্ষণ ও গুণমান বিকাশের প্রচেষ্টায় তাদের সকল কার্যকলাপ ও সকল মূল্যায়ন যন্ত্রের ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শংসাপ্রাপ্তির দ্বারা।

৩.৭.৫ সম্পাদিত কার্যের মূল্যায়ন (Performance Evaluation)

মূলনীতি (Rationale)— কোন বার্তিক বা বৃত্তি পেশায় নিযুক্ত মানুষের কাছে মানসিক শক্তির দ্বারা পেশীতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যার্জন তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কঠোর সমস্যাপূর্ণ ধারণাসংক্রান্ত ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু জ্ঞানের উপযুক্ততা প্রাপ্তি এবং বোধ্যতা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বাহুবলের দক্ষতা কারণ একজন বার্তিক তার মস্তিষ্ক এবং হস্ত— দুই-ই ব্যবহার করে তার সকল কাজে। এছাড়া একজন বার্তিক মানুষের পেশা বাধ্য করে সর্বদা তার খরিদ্দাররে সঙ্গে কাজ করতে যারা তার উৎপাদিত বস্তু ও পরিসেবা প্রার্থী। সুতরাং তার উপযুক্ততা প্রাপ্তি কার্যকর ক্ষেত্রে (ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ/সামাজিক দক্ষতা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পদ্ধতি মূল্যায়ন ও উৎপাদিত বস্তুর মূল্যায়ন (Process Evaluation and Product Evaluation) কাজের বাজারে বৃত্তিমূলক পেশার মানুষদের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে কর্তৃত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের উপযুক্ততার ওপর। তাদের উৎপাদিত সামগ্রী অবশ্যই লাভ করবে যথাসাধ্য চূড়ান্ত অবস্থা, উৎকর্ষতা ও বিপণন যোগ্যতা। কিন্তু মূল্যায়ন অত্যন্ত বড় ধরনের ভুল করতে পারে এক বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর কাজের যোগ্যতা বিচার করায় ক্ষেত্রে। তা তার উৎপাদন পদ্ধতির জটিলতার কথা না বিবেচনা করে উৎপাদিত বস্তুর সম্পূর্ণ অবস্থা মূল্যায়নকারীকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। উৎপাদিত বস্তুর নেট লাভ নির্ভর করে কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে তৈরী বস্তুর ওপর নয়— যে পদ্ধতিগত ঝুঁকি নিয়ে তা তৈরী হয়েছে তার ওপর। একজন দক্ষ শ্রমিক যে অতিরিক্ত সময় নেয় কোন বস্তুর

উৎপাদনে, বিনষ্ট করে অধিক কাঁচামাল, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে জানে না— এইভাবে হ্রাস করে ফেলে তাদের জীবনশক্তি এবং অন্যদের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে শ্রম ব্যয় করে বেশী— তারা খুব কমক্ষেত্রেই সফল শিল্পোদ্যাগী হতে পারে। সুতরাং একজন মূল্যায়নকারীকে নিম্নলিখিত স্থিতিমাপকগুলি বিবেচনা করতে হবে এক বৃত্তিগত শিক্ষার্থীর কর্মের উপযোগিতা বিচার করবার সময়—

(a) পদ্ধতির মূল্যায়ন
- সময়ের মিতব্যয়িতা
- Software (কাঁচামাল) ব্যবহারের মিতব্যয়িতা
- Hardware (যন্ত্র ও মেশিন) ব্যবহারের মিতব্যয়িতা
- শক্তিপ্রয়োগে মিতব্যয়িতা

(b) উৎপাদিত বস্তুর মূল্যায়ন
- সম্পূর্ণ তৈরী অবস্থা
- উৎকর্ষতা/গুণমান
- বিপণন যোগ্যতা (ব্যয়ের কার্যকারিতা)
- টেকসই বা স্থায়িত্ব

ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ মূল্যায়ন (Evaluation of Personality Traits)

বৃত্তিমূলক জগতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে হবে ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণে। মনোভাব বা আচরণ সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলি অবশ্যই হবে :

- "আমার উৎপাদিত বস্তু হচ্ছে একমেবদ্বিতীয়ম্— যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কারো কাছে নেই" (My product is second to none anywhere in the world)
- সর্বোৎকৃষ্ট (excellence)
- নিখুঁততা (Perfection)

  কিছু প্রলক্ষণ আছে যা বারংবার তিরস্কার বা আবৃতির সাহায্যে ধারণাদেবার জন্য ও মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
- নিখুঁত বা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার বোধ (Sense of Perfection)
- নিরাপত্তাবোধ (Sense of Sefety)
- সততা (Honesty)
- আন্তরিকতা (Sincerity)
- সমানুবর্তিতা (Sincerity)
- নির্ভরশীলতা (Confidence)
- প্রতিশ্রুতি (Commitment)
- তৎপরতা (Promptness)

- নতুনের প্রবর্তক (Innovative)
- উপায়াদি উদ্ভাবনে দক্ষতা (Resource of fulness)
- শ্রমের মর্যাদা (Dignity of Labour)

মূল্যায়নের যন্ত্রাদি/হাতিয়ার (Tools of evaluation)

মূল্যায়নের যন্ত্রাদি এমনভাবে রূপায়িত হবে যে তা মূল্যায়নকারীকে সামান্যতম সুযোগও দেবে না যাতে তিনি তা নিজের মতানুসারে করতে পারেন। হাতিয়ারগুলি হবে নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছ, সম্পর্কযুক্ত এবং যেখানে কোন অনিশ্চয়তার চিহ্নমাত্র থাকবে না।

নিজস্ব ইচ্ছানুসারে মূল্যায়নে যে সকল পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয় দক্ষতা-মূল্যায়নের জন্য— তা দূর করা যেতে পারে যথোপযুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করে।

পদ্ধতি	যন্ত্রাদি
পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ সারণী
সম্পাদিত কার্যের পরীক্ষা	যাচাই তালিকা/মাননির্ধারণের মাপকাঠি

এইসকল যন্ত্রাদি ব্যবহার করা যেতে পারে—

- আত্ম-সমীক্ষার জন্য
- শিক্ষকের মূল্যায়নের জন্য
- সম্প্রদায়ের মূল্যায়নের জন্য

৩.৭.৬ শংসাপত্র প্রদান (Certification)

শংসাপত্র প্রদান অবশ্যই যোগ্যতার মানদণ্ড মোহর বহন করবে ধারণাসংক্রান্ত Psychomotar এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং তা প্রতিফলিত হবে বস্তু ও সেবাতে যা শংসাপত্রাধিকারীর ভেতরে উৎপন্ন হয়েছে।

৩.৭.৭. কৃতিত্বের স্বীকৃতি (Accreditation)

এক বৃহৎ সংখ্যক NGO, বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট এবং বিভিন্ন সরকারি ও আধাসরকারি বিভাগগুলি নানাবিধ দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষণ প্রদান করছে বহু উদ্দিষ্ট দলের জন্য যাতে যুব সমাজের বেকারত্ব সমস্যার প্রয়োজনীয় দিকগুলো মেটানো যায়, তাদের সক্ষম করে তোলা যায় মজুরীভিত্তিক এবং স্বনিযুক্তি প্রকল্পে— সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় বিভাগে।

এইসকল কর্মসূচীতে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন দেখা যায় বিষয়বস্তুতে, পদ্ধতিতে, স্থায়িত্বে, সুবিন্যস্ত পরিকাঠামোতে, প্রশিক্ষণে ও উৎপাদিত বস্তুর গুণমানে। অবশ্য এইসব কর্মসূচীর বেশীর ভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয় উৎকর্ষতা, আশ্বাস, মান ও পরিচিতির অভাবে।

জাতীয় accreditation পদ্ধতির স্থাপনা খুবই আবশ্যক কৃতিত্ব বা গুণের অধিকারী রূপে স্বীকৃতি দিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিকে যাতে সংস্থাগুলি প্রশিক্ষণ ও বস্তুর গুণমান এবং দেশে উৎপাদিত বস্তু ও সেবার জাতীয় মান

বজায় রাখতে পারে।

৩.৮ কৌশলগত ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বর জন্য গবেষণা ও উন্নতি (R & D) R & D For Mastery and leadership in Strategic and Crucial Technological areas.

দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কার্যকলাপের সুদীর্ঘ ও পৃথক ঐতিহ্য আছে সুদূর অতীত এবং সিন্ধু সভ্যতার সময় (সর্বশেষ গবেষণা carbon-14 বিশ্লেষণ দ্বারা মাহেরগড় ও সিন্ধু উপত্যকার অন্যান্য এলাকায়) অর্থাৎ আনুমানিক ৭০০০ থেকে ৬০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে (7000 to 6000 BC) বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো আমাদের দেশে পাঁচটি ক্ষেত্রে অবস্থান করে— কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, উচ্চশিক্ষা, শিল্প ও অ-লাভজনক সংস্থা/সহযোগী সংস্থাগুলিতে: গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) জনিত সংস্থাগুলি হল কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক বিভাগ— এগুলি হল, The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), The Indian Council of Argicultural Reasearch (ICAR), The Indian Council of Medical Research (ICMR), The Department of Atomic Energy (DAE), The Department of Space (DOS), The Defence Research and Development Organisation (DRDO), The Department of Ocean Development (DOD), The Department of Environment (DOEn), The Departdment of Biotechnology (DOB).

আমাদের দেশে প্রায় ২০০ গবেষণাগার, ২১০০ R & D সংস্থা, ২০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৯০০০ মহাবিদ্যালয় (College) আছে। দশ লক্ষেরও বেশী বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার এই পেশায় এবং R&D-র কাজে নিমগ্ন আছেন।

আগামী দুই দশকে অগ্রগতির প্রধান চাপ হল ভারতকে এক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা— খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করণের মাধ্যমে। এটা সম্ভব হবে এই সব ক্ষেত্রগুলিতে স্বনির্ভরতা লাভ করে এবং চূড়ান্ত ও সুকৌশলী প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বর বিকাশ ঘটিয়ে CSIR-র The New Millennium Indian Technology Leadership, Initiative (NMITLI) হল এই পথের দিকে এক সুচিন্তিত সুস্থির ও সঠিক পদক্ষেপ।

৩.৯ ভারতের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনর সামর্থ্য (India can attain the Goal)

ভারতবর্ষ ২০২০ যেভাবে মনশ্চক্ষুর সামনে সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত, তাকে তৈরী করা যাবে বর্তমান উন্নয়নক্ষমতা, জনসংখ্যা এবং সভ্যতা বৃদ্ধির ধরনের ভিত্তিতে। বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষমতা নির্ভর করে তার প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ, আর্থিক এবং R&D-র সমর্থক পদ্ধতি, ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার পরিকাঠামো, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, শাসন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক শক্তি এবং জাতীয় ইচ্ছাশক্তির ওপর।

ভারতীয় সভ্যতা এক অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা যা অত্যন্ত সমৃদ্ধ সৃজনশীল সংস্কৃতির ঐতিহ্য সমন্বিত। Prof. Arnold Toynbee তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষকে এক "সর্বজনীন রাষ্ট্র" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অনুমোদনযোগ্য ক্ষমতা পোষণ করে যা মানুষের ভাবনার যেকোন উচ্চতায় উন্নীত হতে পারে সম্পূর্ণ স্বপ্রচেষ্টায়: বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে ভারতের প্রতুল মানব এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও

পরিকাঠামো আছে নিজস্ব স্বতন্ত্রতা, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য।

ভারত—আমাদের সকলের মাতা

ভারতবর্ষ ছিল আমাদের জাতির মাতৃভূমি এবং সংস্কৃত ছিল ইউরোপীয় সকল ভাষায় জননী। ভারতবর্ষ ছিল আমাদের দর্শনের মা, ছিল গণিতের আরবীয় সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে মাতৃস্বরূপা, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্মের আদর্শের জননী, ভারতবর্ষ মাতৃরূপী গ্রামীণ সম্প্রদায়ের স্বশাসিত সরকার ও গণতন্ত্রের। ভারতমাতা অনেক প্রকারেই আমাদের সকলের মা।

বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক

এবং ঐতিহাসিক

Will Durant (U.S.A)

এই যাত্রায় ভারতকে এককভাবেই এবং সম্ভবত বিশ্বের বাকী রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েই যাত্রা করতে হবে। Prof. Lowes-এর বাণীতে সত্যতা রয়েছে যে, "the opposition is not so much between Asia and Europe (West) as between India and the rest of the world". ভারতবর্ষের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সাফল্য মানবজাতির এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। ঐতিহাসিক Prof. Toynbee ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছেন, "it is already becoming clear that a chapter (of world history) which has a Western beginning will have to have an Indian-ending, if it is not to end in the self-destruction of the human race."

পরিপূর্ণতা

"India of the ages is not dead, nor has the spoken her last creative word; she lives and has still something to do for herself and the human race."

শুধুমাত্র শান্তি নয়, পরিপূর্ণতা—যা বিশ্বের হৃদয় সন্ধান করছে।

Sri Aurobindo

৩.১০ এককের সারাংশ (Unit Summary)

- শিক্ষা ব্যক্তিগত এবং সমাজ উন্নয়নের জন্য প্রারম্ভিক ভূমিকা পালন করে। এটি হল যেকোন সমস্যার মোকাবিলা করবার এক শক্তিশালী যন্ত্র/হাতিয়ার যা মানবজাতিকে সংগ্রাম বা বিরোধের মুখোমুখি হতে এবং যে-কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।
- ভারতবর্ষের মানুষ সাংবিধানিক ভারতবর্ষ গঠন করেছে ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০ সালে। তারা ভারতবর্ষকে এক সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতন্ত্রী, স্বতন্ত্ররূপে গড়েছে যাতে যাতে সকল নাগরিক ন্যায় বিচার, মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং সমতা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধ করতে পারে এবং আশ্বস্ত করে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং দেশের ঐক্য।

  [সার্বভৌম এবং সমাজতান্ত্রিক শব্দগুলি মূল সংবিধানের মুখবন্ধে ছিল না এবং ৪২তম পরিবর্ধিত সংস্করণে ১৯৭৬ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে]

- শিক্ষা এক মৌলিক অধিকার
- ভারতীয় সংবিধান মাসুলহীন এবং আবশ্যিক শিক্ষার সুযোগ দান করে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুদের।
- EFA-র লক্ষ্য হল সকল শিশু, যুবসমাজ ও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রারম্ভিক শিক্ষার চাহিদাকে পূরণ করা।
- জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা বা বোধ একবিংশ শতাব্দীর এক অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে উত্থিত হয়। এটা হবে এক শিক্ষণরত সমাজ যা অর্জন, পুনর্নবীকরণ এবং জ্ঞানের ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।
- অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রে সকলের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা উত্থিত হয়েছে এক অতি প্রয়োজনীয় আলোক উৎসবরূপে। সকল স্তরে শিক্ষার চারটি স্তম্ভের একটি হল— কর্মের জন্য শিক্ষা।
- বর্তমান কালের অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলি যা দেশের ৯০% এরও বেশী শ্রমশক্তিকে চাকরীর জোগান দেয় তাদের চাহিদাপূরণ করবার জন্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে পছন্দ অনুযায়ী অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের।
- বিশ্বায়নগত বাজার অর্থনীতিতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দেশে উৎপাদিত বস্তুর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিসেবার লালনপালন অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এর জন্য কে জাতীয় ব্যবস্থা থাকা উচিত মূল্যায়নের, শংসাপত্র প্রাপ্তির এবং কৃতিত্ব বা গুণের অধিকারীরূপে স্বীকৃতির। এটা পূর্ণাঙ্গরূপে এবং পরমোৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করে এবং সকল কাজে সর্বদা প্রথম হবার চেষ্টা করে -- কখনই দ্বিতীয় নয়।
- খাদ্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষার জন্য জাতীয় সুরক্ষা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে স্বনির্ভর হয়ে এবং কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব অর্জন করে সঙ্কটজনক ও সুকৌশলী প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে।
- অল্পসংখ্যক বিশ্বজনীন রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বের ইতিহাসে ভারত হল এই রকমই একটি সর্বজনীন রাষ্ট্র। এর রয়েছে ক্ষমতাপূর্ণ সম্ভাবনা এবং পর্যাপ্ত মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ঐতিহ্যের শক্তি যা তাকে আগামী ২০ বছরের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে।
- আগামী দুই দশকে অনুমোদনযোগ্য উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের সম্যক উলবদ্ধিকরণে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে।

৩.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১. আমাদের সাংবিধানিক লক্ষ্য কি?

২. ভারতে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য কেন শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান জরুরী?

৩. "বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই"— উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৪. গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত কেন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে?

৫. কিভাবে আমরা আমাদের স্বদেশে উৎপাদিত বস্তু ও পরিসেবার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?

৬. এক অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নগত বাজার অর্থনীতিতে আমরা কিভাবে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পারি?

৩.১২ বাড়ীর কাজ (Assignment)

ভূমির ব্যবহার বিশ্বে, ভারতবর্ষে, চীনে এবং আমেরিকায় (১৯৮০)

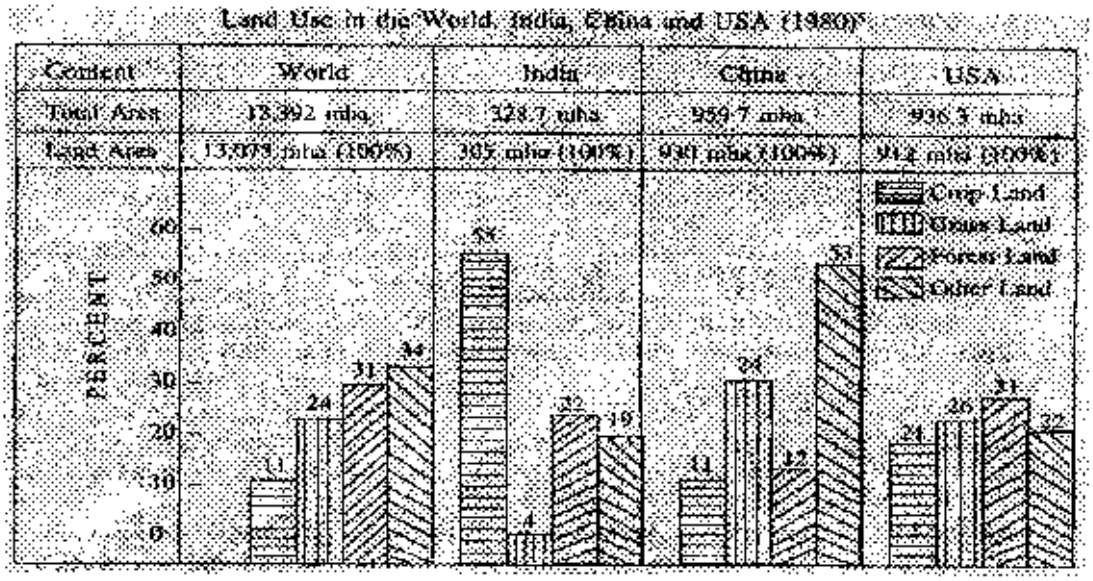

১. উপরোক্ত চিত্রটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবং ভারতবর্ষে ভূমির ব্যবহারের অবস্থার সঙ্গে চীন ও আমেরিকায় ভূমির ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা করুন। আগামী দুই দশকের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য ভারতবর্ষ কি পদক্ষেপ নিতে পারে।

২. একটি কার্যকরী নকশাচিত্র তৈরী করে দেখান যে ভারতবর্ষ কি প্রকারে 2020 সালের মধ্যে এক উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে।

৩. "ভারতে উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনুজ্ঞানসমূহ"— এক হাজার শব্দের মধ্যে লিখুন।

৩.১৩ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification)

এই এককটি পড়ার পরে আপনার ইচ্ছে হতে পারে কিছু কিছু বিষয়ের ওপর আরও আলোচনা এবং প্রাঞ্জল ভাবে বিশ্লেষণের। সেই বিষয়গুলি নথীভুক্ত করুন।

৩.১৩.১ আলোচনার বিষয়বস্তু (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

.....

৩.১৩.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলি (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

.....

৩.১৪ উৎস (References)

1. ABDUL KALAM; APJ with Rajan, YS: *India 2020, A Vision for the New Millennium*, Viking Penguin Books (P) Ltd., Communits Centre, Panchasheel Park, New Delhi 110017.
2. AICTE (1996): *Technical Education for Rural India*, Report of the AICTE Committe on Human Development by Coupling Education, Vocations and Society (Yash Pal Committee). All India Council for Technical Education, New Delhi, (Personal Document of Prof. Arun K. Mishra, one of the Members).
3. BANERJEE G. (2001): *Legal Rights of the Disabled in India*, Rehabilitation Council of India (A statutory body under the Ministry of Social Justice & Empowerment), 23-A, Shivaji Marg, New Delhi-110015.
4. GURU G (1985): *Environmental Problems and Their Solutions*, Environmental Education Series 6, Division of Science, Technical and Environmental Education, UNESCO, Paris. -(i) P 80-82.
5. GURU G (1996): *Human Resource Development Perspective for India during Twenty-first Century*, Indian Journal of Vocational Education, Vol I, No. I, July-Dec. 1996, PSSCIVE, Bhopal.
6. G. GURU (1999): *Prespective for Sustainable Development of India in the Nixt Millenium, Vocaeionalisation of Education: Perspectives for the New Millenium,*

The Challange; PSSCIVE, Bhopal, India.

7. GURU. G (2001): *Perspective of Value Inculcation through Education*, Paper presented in a Seminar on 'Value Education and Yoga' organised by Yoga Centre, Barkatulla University, Bhopal on March 1, 2001.

8. GURU G (1991): *Education and Productive Work in India*, Country Report presented in the UNESCO-APPIED Regional Workshop on Evaluation, Review and Improved Interaction between Education and Productive Work (organised in RCE, Mysore from April 21 to 28, 1991 by UNESCO-APIED and hosted by NCERT).

9. IAMR (1995): *Manpower Profile India Year Book 1995*, Indian Applied Manpower Research, Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Marg, New Delhi, (P-73).

10. MHRD, GOI. *Education for All: The Indian Scene.*

11. MHRD, GOI. *National Policy on Education 1986.*

12. MINISTRY OF LAW, GOI. *The Constitution of India.*

13. NARAYAN, J. P. (1950): *Building up from the Village*, Manthan, Rural Reconstruction Special, (1980, Vol. 2, No. 2)

14. NCERT (1998): *Vocational Education Programme: Issues and Imperatives for Future Planning,* NCERT, New Delhi 110016.

15. NCTE (1998): *Framework of Teacher Education for Early Childhood Stage.*

16. NIEPA AND GOI (2000): *Year 2000 Assesment Education for all (India).* NIEPA, NIE Campus, New Delhi 1100016.

17. PSSCIVE (1996): *Environment and Development*, A Text Book of Environmental Education and Rural Development for +2 Vocational Students, NCERT, New Delhi, (i) P. 153-173.

18. REHABILITATION COUNCIL OF INDIA (2000), *Legal Rights of The Disabled in India* (A Statutory Body Under Ministry of Social Justice & Empowerment) 23-A, Shivaji Marg, New Delhi-110015.

19. SHUKLA, P. D. (1996): *Education for All,* Sterling Publishers Private Limited, L-10, Greenpark Extension. New Delhi-110016.

20. SRI AUROBINDO (1918-21): *Foundation of Indian Culture*, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1959.

21. SWAMI RANGANATHANANDA, *External Values for a Chaning Society*, Vol. III, Bharatiya Vidya Bhawan, Mumbai, P 57.

22. UNESCO (1996): *Learning: The Treasure Within*, Report of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO, Paris.

23. UNESCO (1999), *UNESCO's TVE Programme for the First Decade of the New Millennium*, Paper presented by Colin N. Power, Deputy Director General (education), UNESCO on 29 April in the Second International Congress on TVE on April 29, 1999.

24. UNESCO (1999), *Draft Recomendations, Second International Congress on Technical and Vocational Education* (Seoul, 26-30 April 1999)

25. WCED: *Our Common Future,* The Report of the World Commission on Enviruoment and Development, WCED.

Abbreviation

N.P.E.—	National Policy of Education
N.C.E.R.T.—	National Council of Educational Research and Training.
N.C.T.E.-–	National Council of Teacher Education.
UNESCO—	United Nations Educational Scientfic and Cultural Organization.
CABE—	Central Advisory Board of Education.
OBB---	Operation Black Board.
DIET—	District Institute of Education And Training.
UEE—	Universal Elementary Education.
NFE—	Non Formal Education.
N.F.E.-	Non Formal Education
WHO–	World Health Organisation
C.B.R.–	Community Based Rehabilation
I.L.O–	International Labour Organisation.
CABE–	Central Advisory Board of Education
NCERT–	National Council of Education Research and Training
NIE–	National Institute of Education
CIET–	Central Institute of Educational Technology
PSSCIVE-	Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education
RIE–	Regional Institutes of Education
NIEPA–	National Institute of Education Planning and Administration
NCTE–	National Council of Teacher Education
HRD–	Human Resourse Development
AICTE–	All India Council of Technical Education
UNDP-	United Nation Development Programme
GNP–	Gross National Product
WE–	Work Experience

TQC–	Total Quality Control
CSIR–	Council of Scientific and Industrial Research.
ICAR–	Indian Council of Agricultrual Research
ICMR–	Indian Council of Medical Research
DAE–	Department of Atomic Energy
DRDO–	Defence Research and Development Organization
DOD–	Department of Ocean Development
DOE–	Department of Environment
DOB–	Development of Biotechnology
NGO–	Non Government Organisation